প্রথম প্রকাশ :

১ম খণ্ড (১ম—৫ম সর্গ) ২২ পৌষ ১২৬৭ [৪ জানুয়ারি ১৮৬১]

২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ—৯ম সর্গ) ১২৬৮

২য় সংস্করণ : ২৫ ভাদ্র ১২৬৯ (সম্পাদক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩য় সংস্করণ : ২১ আগস্ট ১৮৬৭

৪র্থ সংস্করণ : ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৭

৫ম সংস্করণ : ১৬ মার্চ ১৮৬৯

৬ষ্ঠ সংস্করণ : ২০ জুলাই ১৮৬৯ [কবির জীবৎকালের শেষ সংস্করণ]

শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত ও শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

ভূমিকা

সম্পাদকের নিবেদন

বিস্তৃত কাব্যসমালোচনা

মেঘনাদবধ কাব্য

সাধারণ সমালোচনা

ভূমিকা

মধুসূদন আধুনিক সাহিত্যের ক্রান্তিলগ্নের প্রতীকী-কবি। তাঁর কাব্যমূল্য মোটামুটি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হলেও তাঁর ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এখনও অপরিতৃপ্তই আছে। তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উৎস নিঃশেষিত না হয়ে চির-প্রবহমান। তাঁর এই ঐতিহাসিক ভূমিকাই তাঁর সম্বন্ধে বিচিত্র ও বহুমুখী আলোচনার ধারাকে উন্মুক্ত রেখেছে। বিদেশীয় সাহিত্য ও দেশী সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয়-রহস্যের সূত্রটি তাঁর হাতেই বিধৃত। প্রায় দেড়শত-বৎসরের আধুনিক বাংলা সাহিত্যধারা যে পথে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর রচনাই তার গতিপথনির্ণায়ক। মধুসূদনকে সম্যক্ না বুঝলে যে মানসচেতনা ও কল্পনাসমৃদ্ধির মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রাণরস ভারতীয় কবিচিত্তের অন্তঃ-প্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে তার রহস্য অবিদিতই থাকবে। নূতন ও পুরাতনের এই অন্তরঙ্গ মিলন মধুসূদনের কবিপ্রতিভারই স্বীকরণশক্তির পরিচয় ও তাঁর পরবর্তীদের সাহিত্যকৃতির আদিম প্রেরণা।

মধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের ও কবিস্বভাবের মৌল প্রাণকেন্দ্রটি এখনও অনাবিষ্কৃতই আছে। তাঁর প্রথম যৌবনের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস, ভাঙনের নেশা যে কোন্ মন্ত্রে বাইরের সমস্ত বিক্ষোভ সংবরণ করে সৃষ্টিসুষমার রূপছন্দে শান্ত-কল্যাণশ্রী ধারণ করল তা তাঁর জীবনীকারদের চোখে ধরা পড়ে নি। ইয়ং বেঙ্গলের উগ্রমদিরা কোন নিগূঢ় প্রভাবের ফলে নবসাহিত্যসৃষ্টির অমৃতরসে উদ্বর্তিত হয়েছে, খেয়ালী অস্থিরমতিত্ব কেমন করে নূতন নূতন রূপকলা-উদ্ভাবনের নিয়মিত কক্ষে ছন্দ-পরিক্রমায় স্থির হয়েছে তা জীবনবিধাতার দুর্লক্ষ্য অভিপ্রায়ের মধ্যেই চিরবন্দী হয়ে থাকল। তাঁর কাব্যপ্রতিভা-প্রস্তুতির প্রক্রিয়াও একইরূপ দুর্ভেদ্য অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে। তাঁর জীবনে ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ও কাব্যে সৃষ্টিপ্রতিভার দীপ্ত উন্মীলনের ইতিহাস তাঁর মাদ্রাজ-প্রবাসের কয়েকবৎসরের অখ্যাত ও আপাত-ব্যর্থ জীবনকাহিনীর মধ্যে গুহাহিত। এই কয়েক বৎসরের জীবনায়নের ও প্রবৃত্তিচালিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের, প্রেমের বিভ্রান্তি, মোহভঙ্গ ও নূতন পরীক্ষার যে বহির্ঘটনামূলক বিবরণ আমরা পাই, তা' প্রতিভার উৎস-উন্মোচনের উপর কোন আলোকপাত করে না। তরুণ মনের প্রেমচর্চা ও জ্ঞানচর্চা কোনটাই প্রতিভাস্ফুরণের ভূমিকা-রচনায় সহায়তা করে বলে মনে হয় না। শিক্ষকতা ও সম্পাদকতাবৃত্তি, নীলনয়না

ইংরেজ তরুণীর চটুল কটাক্ষে বিহ্বল আত্মসমর্পণ, তার বেদনাময় উপসংহার ও দগ্ধ হৃদয়ের প্রলেপরূপে নূতন প্রণয়িনীর স্পর্শাতুরতা—এই তুচ্ছ অভিজ্ঞতার আবরণে কোন দিব্য সম্পদের অস্তিত্ব-কল্পনা দুরূহ। যে কবি অষ্টাদশ শতকের অন্তর্দৃষ্টিহীন ইংরাজ কবিগোষ্ঠীর অনুসরণে বিদেশী ভাষায় মামুলি প্রেমকবিতা ও আলংকারিক গাথাকাব্যরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁর প্রেরণা যে পরানুকারীর সুলভ অভিমানতৃপ্তির ঊর্ধ্বে কোন সূক্ষ্মতর কবিচেতনার অনুশীলন নয়, তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। এ যেন বিলাতী সুরারই একটা সারস্বত অনুকল্প। আর তিনি যে নিয়মিত ভাবে নানা প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার চর্চায় নিবিষ্ট ছিলেন, তা তাঁর জ্ঞানসাধনার নিদর্শন হতে পারে, কিন্তু এই বিপুল সমিধ-সংগ্রহ যে কবিপ্রতিভার হোমাগ্নিপ্রজ্বলনের প্রস্তুতি তা সহজে প্রতীয়মান হয় না। অবশ্য এই বিচিত্র পাঠক্রমের মধ্যে সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্তি ও বিশেষ ফরমাইস দিয়ে বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের সংগ্রহ পরবর্তী কালের আলোকে এক নূতন তাৎপর্যে প্র তভাত হয়। হয়ত এই দুটি ক্ষুদ্র খবর সমসাময়িক কালে কারুর দৃষ্টিই আকর্ষণ করে নি। আজ ভবিষ্যৎ পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উপলব্ধি করছি যে এগুলি ধূমায়মান যজ্ঞকাষ্ঠসঞ্চয়ে শিখাবর্ধক, প্রাণরসসিক্ত ঘৃতের অঞ্জলি-নিষেক।

এই স্থূল মৃত্তিকা-আধার থেকেই রতনসম্ভবা বিভা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়েছে। মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কৃতিত্ব হল প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভাবাদর্শের আশ্চর্য সমীকরণ। মধুসূদনের কৈশোর ও যৌবনের জীবন-অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যচর্চাপ্রসূত রুচিপ্রকর্ষের কথা বিবেচনা করলে এই সমন্বয় প্রতিভার অসাধ্যসাধনের অলৌকিক নিদর্শন বলে মনে হবে। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই মিশ্র আবহসৃষ্টিকে প্রতিভার জ্ঞানাতীত, বোধাতীত, দুর্লভতম দিব্য দৃষ্টির অযত্নসিদ্ধ লীলাবিস্তারের পর্যায়ভুক্ত করা অনিবার্য হয়ে উঠে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীব প্রথম প্রাদুর্ভাবকালে ভারতীয় সংস্কৃতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার নিম্নতম বিন্দুতে অবনমিত হয়ে ছিল। এক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছাড়া ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে আর কেহই হিন্দু ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের যথার্থ অনুরাগী ও নিষ্ঠাবান সমর্থক ছিল না। ভূদেবের অবিচল প্রত্যয়ের উৎস ছিল তাঁর পারিবারিক ধর্মনিষ্ঠা। মধুসূদন ঘরে-বাইরে কোথায়ও হিন্দু-আদর্শের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান নি। তাঁর পরিবার ভোগবিলাস-নিমজ্জিত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার অনুসারী ছিল। তাঁর পিতা বিলাসী ও

ঐশ্বর্যমত্ত ছিলেন এবং মধুসূদন তাঁর উত্তরাধিকার রূপে তাঁর রক্তধারার মধ্যে এই বিকারের বীজ বহন করেছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষা তাঁর এই ভোগাসক্তি ও স্বৈরাচারের শিক্ষাকে অনুকূল বায়ুসঞ্চারে সর্বধ্বংসী উগ্রতায় উদ্দীপ্ত করেছিল। তিনি ধর্মত্যাগী, সমাজদ্রোহী ও পাশ্চাত্ত্য-জীবনমদিরামত্ত হয়ে তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও ভাবসত্তার প্রাচীন উপাদানকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে পরকীয় সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ স্বীকরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজের বাঙালী-পরিচয় মুছে ফেলে শুধু আহারে-বিহারে নয়, বহিবঙ্গ জীবনব্যবস্থায় নয়, যে অন্তরতম সত্তা প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থেকে সমস্ত অন্তর্জীবনের সৌরভ বিকশিত করে তোলে, সেই সৃষ্টিধর্মী চেতনার মূলে সাহেব হতে চেয়েছিলেন। পরাধীন জাতির মধ্যে টম-ডিক-হ্যারির মত ঘৃণ্য জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রতীচ্য মনীষী ও মহাকবিদের সূক্ষ্মতর আত্মিক প্রভাব আত্মসাৎ করে তিনি তাঁদের সমকক্ষতার স্বপ্নে মশ্‌গুল ছিলেন। তিনি বিশ্বকর্মার মত উৎকট তপস্যার দ্বারা কাব্যজগতে দ্বিজত্বলাভের অভিলাষী ছিলেন এবং জীবনচর্যার যে ভূমিতে এই কাব্যপারিজাত ফুটে উঠে, সেই পারিজাতগন্ধে বিভোর হয়ে তিনি তাঁর মানসক্ষেত্রটিকেই রূপান্তরিত করার দুরাশা পোষণ করতেন। এই জটিল প্রক্রিয়ার কার্যকারণশৃঙ্খলা, এই সংস্কৃতির সমাহারকৌশল আমাদের কাছে অবিদিত রয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর অভূতপূর্ব সিদ্ধিকে আমরা ফলপরিণতির মানদণ্ডে বিচার করে তাঁর দুরূহ সাধনার সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই গ্লানিকর, দ্বিধা-দ্বন্দ্বদীর্ণ, ভোগলোলুপ ও প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবন-পরিবেশে তিনি তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধের মহাকাব্যিক ভাবকেন্দ্রনিষ্ঠ নিটোল একটি ঘটনাবৃত্ত ও রসসংহতির উপাদান কেমন করে সন্ধান করলেন? রাবণ ও ইন্দ্রজিতের স্বাজাত্যাভিমান ও দৃঢ়মূল ব্যক্তিসত্তা হয়ত তাঁর নিজ ব্যক্তিত্ব ও যুগমানসের প্রতিভাসরূপে মহাকাব্যের অন্তর্লোকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল, নানাদ্বন্দ্বমথিতযুগে মহাকাব্যের কায়াব্যূহনির্মিতি, তার বিরাট, কেন্দ্রানুগ অবয়বসংস্থানের সংকেত আসে কোন্ অদৃশ্য উৎস হতে? এ যুগের দান নয়, মধুসূদনের প্রতিভা ও মানস অনুশীলনের বিরল, ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টিসুষমার উদ্ভাসন। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্‌টন, ট্যাসো, এরিয়স্টো প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মহাকাব্যরচয়িতাবৃন্দের আত্মার নির্যাস তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন ও তাঁর কল্পনার মধুচক্র নানা দেশ-কালের বিচিত্র মধুসঞ্চয়ে পূর্ণ ছিল। তাঁর পাঠ-আহরণ তাঁর কবিস্বভাবের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে

মিশে গিয়েছিল যে যখনই তাঁর পূর্বগামী কবিদের অনুরূপ পরিস্থিতি তাঁর কবি-কল্পনাকে উত্তেজিত করেছে, তখনই স্মৃতিসঞ্চয় তাঁর স্বাধীন প্রেরণার সঙ্গে সহযোগিতা করে তার মধ্যে প্রাণশক্তি ও অনুরণননির্ঘোষ সঞ্চার করেছে। মধুসূদনের মহাকাব্যগঠনশিল্প এক কষ্টার্জিত ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল ছিল—দশবৎসরের মধ্যেই সেই ভারসাম্য তাঁর অনুগামীদের হাতে বিচলিত হয়ে উপাদান-বিভিন্নতায় বিশ্লিষ্ট হয়েছে।

এছাড়া মধুসূদনের কাব্যজীবনে আরও অনেক জটিল প্রশ্ন উত্তরের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ আছে। তিনি যেমন তাঁর নায়ক রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে এক গূঢ় নিয়তির ক্রীড়নক-রূপে দেখিয়েছেন, তাঁর নিজের সৃষ্টিকার্যেও তেমনি এক অনিবার্য নিয়তির অলক্ষ্য প্রভাব ক্রিয়াশীল। তিনি সচেতনভাবে যা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর অবচেতন মনে সুপ্ত এক অদৃশ্য শক্তি তাঁর সৃষ্টিকে এক অনভিপ্রেত পথে চালনা করেছে। তাঁর অন্তরের গোপন উৎস থেকে করুণরসের উচ্ছ্বাস উৎসারিত হয়ে তাঁর বহুঘোষিত শৌর্যসাধনাকে অশ্রুনিষেকে কোমল করে তাঁর কাব্যের সিদ্ধরসকে ভারতীয় ঐতিহ্যানুগত করেছে। প্রমীলার বীর্যসারগঠিত প্রণয়লাবণ্য তাঁর কবিচিত্তকে এক দুর্বোধ্য ভারসাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রেরণায় সীতাচরিত্রের শাশ্বত আদর্শানুগামী ম্লান মাধুর্যকল্পনার পরিপূরক চিত্রসংযোজনায় অনুপ্রেরিত করেছে। প্রমীলা তাঁর পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের সদ্যোজাত অনুরাগের প্রখর প্রকাশ। সীতা তাঁর অন্তরশায়ী-রক্তধারাবাহিত প্রাচীন সংস্কারের স্নিগ্ধ উদ্ভাসন। সীতা ও প্রমীলার চিত্র পাশাপাশি রেখে তিনি তাঁর সমন্বয়-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন। রাম-লক্ষ্মণ তাঁর নব-আদর্শ-সন্ধানী সমাজ-চেতনার দ্বারা নিন্দিত হয়ে তাঁর দাক্ষিণ্যবঞ্চিত। কিন্তু সীতারূপিণী ম্লান লতিকা তাঁর সক্রিয় মনের সমর্থন-রহিত হয়েও কবির বোধাতীত এক নিগূঢ় সমবেদনার ধারায় অভিস্নাত ও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার করুণ লাবণ্যে বিকশিত। প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের মোহাকর্ষণ এক অদৃশ্য জীবনদেবতার অমোঘ ইঙ্গিতে কবির সচেতন মনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, তাঁর যুক্তিবাদের সমস্ত ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর মনোলোকের কোন্ এক অজ্ঞাত স্মৃতিসমাধির বিদারণপথে অকস্মাৎ উদ্বুদ্ধ ও স্বতঃউৎসারিত হয়েছে। মহাকবির এই উভচরত্বের লীলাসংক্রমণ, এই আধুনিক ও প্রাচীনের মধ্যে সহজ যাতায়াতের পথটি কোন সমালোচনার মানচিত্রে এখনও অঙ্কিত হয় নাই।

তাঁর সংকল্পঘোষণা ও কাব্যরচনায় পূর্বনির্ধারিত পথ থেকে মুহুর্মুহু বিচ্যুতি—এই দুইএর মধ্যে বৈপরীত্য কবিমানসে এক দ্বৈত শক্তির নিগূঢ় ক্রিয়ার

ইঙ্গিতবাহী। তিনি বারে বারে বলেছেন যে তিনি একজন গ্রীকের মত লিখবেন; তিনি আলংকারিক বিশ্বনাথের নির্দেশ মানবেন না ও প্রথানিষ্ঠ অলংকারবিন্যাসপদ্ধতি অনুসরণ করবেন না তা' স্পর্ধার সঙ্গে জানিয়েছেন। এবং নিষ্ঠাবান, বিবেকবান সাহিত্যস্রষ্টার ন্যায় তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর ঘোষিত আদর্শের অনুবর্তন করেছেন। সচেতন শিল্পী হিসাবে তিনি কখনও তাঁর আদর্শভ্রষ্ট হন নি। কিন্তু তাঁর যুগযুগান্তরের সাধনাসংস্কার-লালিত, অন্তর্যামী পুরুষ তাঁকে বঞ্চনা করেছেন। তিনি গ্রীকের মত লিখেছেন এ-কথা অবিসংবাদিত সত্য। তাঁর মহাকাব্যকায়ানির্মাণের প্রতিটি রেখা ও রং, প্রতিমার সূক্ষ্মতম অঙ্গবিন্যাস, তাঁর আখ্যানবস্তুবৈচিত্র্যের অভ্রান্ত কেন্দ্রনিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন স্বর ও রসের অপূর্ব সমাহার—সবই গ্রীক ভাস্কর্যশিল্পের নিখুঁত রূপাদর্শের সার্থকতম প্রতিষ্ঠা। তবু তাঁর অজ্ঞাতসারে এর মধ্যে ভারতীয় জীবন-চেতনার কিছু কি প্রতিফলন ঘটে নাই? যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকার মধ্যে, লঙ্কার ঐশ্বর্যাড়ম্বরের মধ্যে, বীরের স্পর্ধাবিনিময়ের মধ্যে, কিছু কি জীবনের নশ্বরতাবোধ, কিছু কি মাতার শোকদীর্ণ হৃদয়ের করুণ হাহাকার, কিছু কি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের আভাস, বাঙলার বিগত জীবনেতিহাসের মর্ম-উৎসারিত কিছু কি ক্ষীণ স্মৃতির কলধ্বনি ভেসে এসে পাঠককে উন্মনা ও অতীতচিন্তাবিভোর করে না? প্রধান স্বরটি পাশ্চাত্ত্য অর্গানের গুরুগম্ভীর ধ্বনির মাধ্যমে অভিব্যক্ত। কিন্তু গৌণ স্বরগুলি সবই ভারতীয় বীণাযন্ত্রের সূক্ষ্ম তার হতে অনুরণিত। এবং এই উভয়বিধ ধ্বনিসংমিশ্রণ থেকে এক অভিনব স্বরসংগতি জন্ম নিয়েছে। অবশ্য হোমারেও মানবিক রসের যথেষ্ট স্ফুরণ হয়েছে। তবে সেই বর্বর যুগে মানবমনের কোমল বৃত্তিসমূহ শৌর্যপ্রধান, নৃশংস জীবনাদর্শের অবদমন-প্রক্রিয়ায় অনেকটা সংকুচিতই ছিল। প্রায়াম, হেকুবা ও আনড্রোমেকীব চক্ষুতে শোকাশ্রু টলটল করে উঠে, কিন্তু এ অশ্রুধারা লৌহযুগের বিরল রন্ধ্রে ক্ষরিত ও একিলিস-আগামেমননের রুদ্র রোষে শীর্ণ ও ক্ষীণপ্রবাহ। করুণ রস সে যুগের জীবনযাত্রার উপজাত রস (bye-product); ওর স্নিগ্ধতা জীবনের প্রান্তসংলগ্ন, কেন্দ্র-উৎসারিত নয়। রুক্ষ, প্রস্তরময় পর্বতগাত্রে ক্বচিৎ-দৃষ্ট ও বিরলপ্রক্ষিপ্ত সবুজ-শ্যামলিমার ন্যায়। মধুসূদন হোমারের অনুসরণ করলেও তাঁর শোকোচ্ছ্বাস জাতীয় জীবনের উৎস-লালিত, ভারতীয় সাধনা-সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় রসধারাপুষ্ট ও তার উপর নদীমাতৃক বাঙলা দেশের হৃদয়যমুনার প্লাবনে উচ্ছল। তাঁর করুণরস বীর্যকে দ্রবীভূত করে স্বাধীন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ—বীররসের প্রসাদভোগী নয়। তাঁর

মহাকাব্যের সংযত ও সাধারণীকৃত বিলাপ যেমন একদিকে অতিরেকমুক্ত, তেমনি অন্যদিকে অন্তরের গভীরতম স্তর হতে অনুরণিত ও মর্মভেদী। তিনি পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের ইস্পাত-দৃঢ় মৃত্তিকা খনন করতে গিয়ে অকস্মাৎ যুগযুগান্তরসঞ্চিত করুণরসের অন্তঃসলিলপ্রবাহ আবিষ্কার করলেন এবং এই অপ্রত্যাশিত ভাবতরঙ্গ তাঁকে এক নূতন রসতীর্থে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অতীত সংস্কার যে তাঁর মধ্যে কত দুর্নিবার তা তিনি অতীতদ্রোহের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই অনুভব করলেন। তাঁর কাব্যতরণী তাঁকে পশ্চিমের উপকূলে না পৌঁছে দিয়ে শাশ্বত আদর্শের ভাগীরথী-তীরেই ফিরিয়ে নিয়ে এল। তাঁর সমুদ্রযাত্রা সৈকততীরের ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার প্রাচ্যভাবাপ্লুত সংকার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানভূমিতে, পিতৃপিতামহের স্মৃতিপূত শ্মশান-প্রাঙ্গণেই তার গতিবেগকে সংহরণ করে দিল। তাঁর লঙ্কা-ঐশ্বর্যের সমস্ত অস্তমিত মহিমার উপর অশোকবনের করুণ স্মৃতি সন্ধ্যাতারার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে রইল।

অলংকার ও উপমাপ্রয়োগেও তিনি প্রথাজীর্ণ ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেন নি। তাঁর বহু অলংকার ভারতকাব্যের চিরন্তন সঞ্চয় থেকে গৃহীত, পুরাণ-চেতনার দ্বারা অনুবিদ্ধ। কোথায়ও কোথায়ও তাঁর মৌলিকতা আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেলেও মোটের উপর তিনি পাঠকের চিরাভ্যস্ত প্রত্যাশাকে নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ণ করেন নি। দেবলোক ও স্বর্গ-নরকের পরিকল্পনাতে তিনি পাশ্চাত্ত্যচিন্তা-প্রভাবিত হলেও, যথাসম্ভব পৌরাণিক আদর্শের প্রতি বিশ্বস্তই থেকেছেন, উৎকটভাবে প্রচলিত সংস্কারের উল্লঙ্ঘন করেন নাই। সচেতন সৃষ্টিপ্রয়াসে তিনি বিদেশের মুখাপেক্ষী হলেও অবচেতনের গভীরে তিনি জাতীয় সংস্কৃতির টানে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর সরস্বতীর স্তব, বাল্মীকি-বন্দনা ও এই ভক্তিবিহ্বলতা প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী সবই সুপ্রাচীন ভারতীয় কাব্যসাধনার শিষ্টরীতির অনুগামী। এই অস্থিমজ্জাগত ভাবচেতনার মূল তাঁর মনোভূমিতে কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁর জীবনকাহিনী সে সম্বন্ধে নীরব। এর হেতু খুঁজতে গিয়ে অন্য পর্যাপ্ত কারণের অভাবে একে মধুসূদনের জাতিস্মরতার অলৌকিক নিদর্শনরূপেই নিতে আমরা বাধ্য হই। যিনি সমস্ত জীবন দিয়ে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সাধনা করেছেন শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে দেশের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক চেতনার মূল পর্যন্ত প্রসারিত ও অবিস্মরণীয়।

মধুসূদনের জীবন ও কাব্যের অসমাহিত সমস্যা দুটির কথা উল্লেখ করলাম। প্রথম হল তাঁর কাব্যজীবনের ভূমিকাসম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয় হল তাঁর মনে প্রাচ্যভাবের বদ্ধমূলতা-বিষয়ক। কেমন করে তিনি মহাকবি হলেন ও কেমন করে পাশ্চাত্ত্য

ও প্রাচ্য সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয়কারী জীবনচেতনার প্রতীকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন এই দুই প্রশ্নের সমাধান শেষ পর্যন্ত প্রতিভারহস্যের স্বরূপ-উপলব্ধির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আধুনিক যুগের আর দুই প্রতিভাধর প্রবর্তক—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—সম্বন্ধে আমাদের এই সংশয়িত মনোভাব নাই। কেবল এই ভাব-গঙ্গার আদি ভগীরথ এককালে মাইকেল, এখন শ্রীমধুসূদন সম্বন্ধে আমরা যত জানি, তার চেয়ে অনেক বেশী জানি না এই ধারণাই অ-খণ্ডিত রয়ে গেল।

মেঘনাদবধের এই সংস্করণটি আমার ভূতপূর্ব স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর দ্বারা সম্পাদিত ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত। সম্পাদক এই সংস্করণে অশেষ শ্রমস্বীকার ও পাণ্ডিত্যের সহিত অমর মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য-আস্বাদন করেছেন ও নানা প্রয়োজনীয় তথ্যসম্ভারে ও আলোচনা-বৈচিত্র্যে একে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নয়, রসজ্ঞ পাঠকের জন্যও বিশেষভাবে উপভোগ্য করেছেন। এর উপর আমার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচিতি না দিলেও চলত, কিন্তু স্নেহাস্পদ সম্পাদক ও প্রকাশকের নাছোড়বন্দা অনুরোধে এই সুলিখিত ও সুসম্পাদিত সংস্করণের কিঞ্চিৎ কলেবর-বৃদ্ধি করতে হল। সর্বান্তঃকরণে আশা করি এই গ্রন্থখানি বিদগ্ধমহলে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে।

ইতি

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের নিবেদন

মধুসূদনের কাব্য প্রকাশের পর যেমন এক শতাব্দীর অধিককাল কাটিয়া গিয়াছে, তেমনি এই গ্রন্থের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ হইবার গৌরবও প্রায় শতবর্ষ অতিক্রম করিল। আজ পর্যন্ত মধুসূদনের কাব্য তাহার ক্লাসিকাল মর্যাদার আসন হইতে ভূলুণ্ঠিত হয় নাই। যতই দিন যাইতেছে, অমর-বিদ্রোহী মহাকবির জীবন-সাধনা ও যুগপরিবেশের পটভূমিকায় এই মহাকাব্যের জ্যোতি প্রদীপ্ততর হইতেছে। ইহা কেবল কৃত্রিম ক্লাসিকাল যুগের একটি পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কাব্য নহে—ইহা যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমীকরণের যুগে নবজাগ্রত বঙ্গভূমির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মবিশ্বাস, প্রথাবিরোধী বিদ্রোহ ও নবসৃষ্টিশীলতার আত্ম-জীবনী—তাহা আজ অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পরন্তু রামায়ণের এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পুনর্বিবৃতির মধ্য দিয়া আধুনিক কাব্যসাহিত্যের প্রথম কবির যে নাটকীয় বিস্ময়কর ব্যক্তিজীবনের এক অনিবার্য প্রতিফলন ঘটিয়াছে, তাহাও অধুনা বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ছন্দ অলংকার চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া নবীন কালের যে সকল কাব্যলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই পরবর্তী এক শতাব্দীর বাঙলা কাব্যের বিচিত্রমুখী ধারণার প্রেরণা তাহাতেও বিশেষ মতবিরোধ নাই। এই সকল কারণেই মেঘনাদবধ কাব্য কেবল একখানি পরীক্ষামূলক কাব্য হিসাবেই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হয় না—ইহা তদপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ দাবী করিয়া থাকে। অন্তত এক শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন পাঠ্যতালিকায় এই কাব্যের অন্তর্ভুক্তির ফলেও বাঙালী বা বাঙলাভাষী ছাত্রছাত্রী মধুসূদন দত্ত বা মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করিতে পারে ইহা আশার কথা।

মেঘনাদবধ কাব্যের একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণের প্রয়োজন ছিল, কেবল পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবেই নহে, একটি ক্লাসিক সাহিত্যের উদাহরণ হিসাবে। বাঙলায় বর্তমানে বহু সংস্করণই আছে, কিন্তু সেগুলি কেবল অসতর্ক পুনর্মুদ্রণ মাত্র। আমাদের এই সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে গত এক শতাব্দী কালের মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যের যত উল্লেখযোগ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সেগুলি মিলাইয়া দেখিয়াছি এবং বহুকাল যাবৎ প্রচলিত বহু অসংগতি ও ত্রুটি সংশোধন করিয়াছি। প্রচলিত যে-কোনও একটি মেঘনাদবধ গ্রন্থের সহিত আমাদের গ্রন্থ সূক্ষ্মভাবে

তুলনা করিলেই আমাদের পুস্তকের পার্থক্য যে কোনও অনুসন্ধিৎসু পাঠক আবিষ্কার করিবেন। মধুসূদন তাঁহার জীবিতকালের সংস্করণে গ্রন্থের সূচনায় একটি প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহার নিম্নে 'শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্যং বা সাধয়েয়ং' এই বাণীটি মুদ্রিত ছিল। তাহা ছাড়া দিগম্বর মিত্রকে লেখা একটি উৎসর্গপত্রও ছিল। পরবর্তী সংস্করণে যে কোনও কারণেই হোক, এই দুইটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। উক্ত প্রতীক চিহ্নের মূল্য আজ কতটা আছে জানি না, কিন্তু দিগম্বর মিত্রকে উৎসর্গ-করা ভূমিকাটি আমরা কবির কিছু মূল্যবান মন্তব্য আছে বলিয়া পুনরুদ্ধৃত করিয়াছি। ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা এই সুসম্পাদিত সংস্করণের গৌরব আশাতীত বৃদ্ধি করিয়াছে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দুইটি অসমাহিত সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদনের কষ্টার্জিত শিক্ষা ও যৌবনোচ্ছ্বাস, ইয়ং বেঙ্গলের উগ্র মদিরা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আসক্তি তাঁহার সৃষ্টিকেন্দ্রে কোন্ নিগূঢ় রহস্যমন্ত্রে সমীকৃত হইয়া এমন পরিচ্ছন্ন সংহত কাব্যরূপ লাভ করিল, তাহা মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের কোনো ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না বলিয়াই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন। অবিশ্রাম প্রতীচ্য ভাবধারায় অভিস্নাত হইয়াও তাঁহার মনোভূমিতেও প্রাচ্য প্রথাসিদ্ধ ভাবনাই দৃঢ়মূল ছিল, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্যের নির্দেশ ও পরামর্শ ছাত্রাবস্থা হইতেই অযাচিত লাভ করিয়াছি, এই গ্রন্থ সম্পাদনেও উহা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি। প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগের দ্বারা এই জাতীয় গ্রন্থের মুদ্রণ ও অঙ্গসৌষ্ঠবে যে আগ্রহ ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন, তাহা বর্তমান ব্যবসায়িক যুগে সহসা সুলভ নহে। মধুসূদনের সমগ্র রচনাবলী এইরূপ সুশোভন আকারে সুসম্পাদিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইবে, প্রকাশকের নিরলস উদ্যম ও সংকল্পই তাহার একমাত্র প্রতিশ্রুতি।

অরুণকুমার বসু
অধ্যাপক
বঙ্গবাসী কলেজ

মঙ্গলাচরণ

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু,

আর্য,—

আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে! তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহসপূর্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি তিলোত্তমাসম্ভব নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না যে, এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

দাস শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তঃ

প্রথম সংস্করণে এই উৎসর্গপত্রটি ছিল

ক্তবাগদ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ
[প্রথম সংস্করণে উদ্ধৃত রঘুবংশম্-এর শ্লোক]

শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্যং বা সাধয়েয়ম্
[দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত মধুসূদনের
সাহিত্য সাধনার বীজ মন্ত্র]

মেঘনাদবধ কাব্য

বিস্তৃত কাব্যসমালোচনা

কবি শ্রীমধুসূদন ও আধুনিক যুগ

মেঘনাদবধ কাব্যের কবি মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব বাঙলার সহস্রাব্দ-প্রাচীন সাহিত্য-ইতিহাসে একটি অসামান্য বিস্ময়। বাঙলা দেশে ইংরাজ শাসন ও প্রতীচ্য ভাবধারাশ্রিত শিক্ষা-দীক্ষা প্রচলিত হইবার পর সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প ও চিন্তাধারার সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিতে সুরু করিয়াছিল। তাহার বৃহত্তম প্রকাশ মধুসূদনের সাহিত্যসাধনার মধ্যে এমন তড়িৎপ্রভাবৎ সার্থক হইয়াছিল যাহা সমসাময়িক অন্য কোনো বাঙালী কবির মধ্যে কল্পনা করা যায় নাই। মধুসূদনই সর্বপ্রথম তাঁহার কাব্যচর্চার দ্বারা পুরাতন যুগের সম্পূর্ণ অবসান ঘোষণা করিলেন এবং বঙ্গ-কলালক্ষ্মীকে বিশ্বভারতীর সভাতলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য ছিল একান্তভাবেই গ্রাম্য, পল্লীকেন্দ্রিক ও ধর্মভীরু। দৈবমাহাত্ম্য অদৃষ্টনির্ভরতা পূজানুষ্ঠান ও মঙ্গলাচারই ছিল সেই যুগের সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। ধর্মীয় প্রেরণাকেই প্রাচীন কবিরা সারস্বত প্রেরণা মনে করিতেন, সঙ্ঘবদ্ধ জনরুচির বিশ্বাসভাজন হওয়াই ছিল তাঁহাদের সারস্বত সিদ্ধি। স্পষ্টতই লোকচেতনা ও জনসাধারণের বোধগম্য সহজ পৌরাণিক বিশ্বাস উক্ত সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিত। 'রাষ্ট্রীয় জীবনের গভীর ঘূর্ণিবাত্যা পল্লীনির্ভর সাহিত্যের সনাতন জীবনছন্দে বিন্দুমাত্র কলঙ্করেখা আঁকিয়া যায় নাই। উনবিংশ শতাব্দী হইতে এই অবস্থার অচিন্তিতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিল, সংকীর্ণ নদীখাতের বালুবন্ধ উল্লঙ্ঘন করিয়া লবণসমুদ্রের নীলসফেন তরঙ্গরাশি জীবনের স্তিমিত-কল্লোল উপত্যকা ভাসাইয়া লইয়া গেল। বাঙালীর চিত্তদ্বার মুক্ত হইল—পশ্চিম দিগন্তের নক্ষত্রের আলো আর সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপের প্রাসাদ-সংগীত তাহার চেতনা আচ্ছন্ন করিল। ভাববিপ্লবের এই মহালগ্নের কবি শ্রীমধুসূদন।

/মধুসূদনের এই চমকপ্রদ আবির্ভাবের সহিত বাঙলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নবজাগৃতির ইতিহাস অতি ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত। উনিশ শতকের নবজাগৃতি একটি বহুশ্রুত বহুব্যবহৃত শব্দ—নবজাগৃতির পূর্বপ্রচলিত কোনো ব্যাকরণের

সূত্রে বা শব্দরূপাদর্শে ইহাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগই এই নবজাগৃতির কারণ, কিন্তু পরোক্ষভাবে জাতির জড়ত্বমোচন ও প্রাণশক্তির আবেগই ইহার জন্য দায়ী। দেশের সমগ্র মানবসত্তা এই সময় আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল—নিছক রাজনৈতিক ঘটনা বা শিল্প-সংস্কার কিংবা কোনো নূতন সাহিত্যধারার আকস্মিক প্রবর্তনেই এই জাগৃতি সূচিত হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যের পুনরুদ্ধার, পুরাকীর্তির নবমূল্যায়ন, অতীত জীবনের বীর্যবত্তার মধ্যে মনুষ্যত্ব-গৌরবের বীজ-আবিষ্কারপ্রবণতা—নবজাগৃতির যাহা কিছু সাধারণ লক্ষণ, সবই এই পর্বের বৈশিষ্ট্য। যুক্তিবাদ, সংশয়, বিতর্ক ও বুদ্ধির আলোকে জগৎকে নিরীক্ষণ ও বিচার করিবার সর্বাত্মক অভিমুখিতা এই যুগকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়াছিল। মানুষের দৃষ্টি অপ্রাকৃত জগৎ অস্বীকার করিয়া আপনার চারিপার্শ্বকেই গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিল, মনুষ্যজন্মের নূতন সার্থকতার উপলব্ধি ঘটিল। এই মর্ত-জীবনের মহত্ত্বকে আবিষ্কার করা এভারেস্ট শৃঙ্গ-আবিষ্কার ও বিজয়াভিযান অপেক্ষা কম উত্তেজনাকর মনে হয় নাই। তাই এ যুগের সাহিত্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশিখর-বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ মনুষ্যমর্যাদা-লাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন করা হইল। মৃত সমুদ্রের উপকূল হইতে ভগ্নপ্রস্তর তুলিয়া তাহার দ্বারা নূতন শাণিত অস্ত্র নির্মিত হইল, ক্ষেপণযন্ত্রে স্থাপিত করিয়া তাহাদের অমোঘ দূরগামিতা ও লক্ষ্যভেদ-কৌশল অভ্রান্তভাবে পরীক্ষিত হইল। ইহার সহিত আমাদের ধর্ম সমাজচিন্তায় অভাবনীয় সংস্কার ঘটিল। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে বুদ্ধির অগ্নিশিখা দাবানলের মত দেশের দূরাঞ্চল পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। স্বদেশ-চেতনায় বাঙালীর নবদীক্ষা ঘটিল। সাহিত্যের সকল শাখাতেও এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল, পুরাতন প্রথার নিঃশেষ অবসান ঘটাইয়া নূতন রূপরীতি ও চিন্তার প্রসার হইতে লাগিল। এই নবজাগৃতির রাজধানী ও কর্মকেন্দ্র হইল গঙ্গাতীরবর্তী এই মহানগরী—ইহারই ইষ্টক-নির্মিত গৃহকোণে, কঠিন নবনির্মিত রাজপথে, কোলাহলমুখর বন্দরে নবযুগের তূর্যধ্বনি শ্রুত-অশ্রুতসুরে মুহুর্মুহু বাজিয়া উঠিতে লাগিল। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের সংস্কারদ্রোহী মনোভাব, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতি, বিলাত যাইবার ও ধর্মান্তরগ্রহণের প্ররোচনা, নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্রতি আগ্রহ, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কারভঙ্গের উত্তেজনা—এইগুলি যেমন সামাজিক জীবনের লক্ষণরূপে প্রকট হইতে লাগিল,

তেমনি জাতির গভীরতম আত্মায় দেখা দিল মানবিকতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতাপ্রীতি, যুক্তিবাদ, ঐহিকতা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির ঘোষণা। সাময়িক পত্রে বক্তৃতায় শিক্ষাপ্রচারে, জাতীয় চরিত্রের সংস্কারে, সমাজকল্যাণে, আদর্শ মানবমুখী সাহিত্যনিষ্ঠায়, মাতৃভাষার প্রতি অতন্দ্রনিবিড় অনুরাগে এই যুগের যে ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহারই অন্যতম দৃপ্ত অধ্যায়ের নাম মধুসূদন।

নবযুগের মহাকবি হইবার সর্বপ্রকার অধিকার লইয়াই মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইংরাজি সাহিত্যে তাঁহার রসগ্রহণ ও ভাবপ্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল মাতৃভাষার উপর অধিকার অপেক্ষাও শ্লাঘনীয়, সেই সঙ্গে একাধিক য়ুরোপীয় ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান অর্জিত হইয়াছিল। সেই লব্ধজ্ঞান বিশ্বের খ্যাতকীর্তি ধ্রুপদী কাব্যগুলির রসাস্বাদনে কবিকে নিত্যই নিমন্ত্রিত করিত। সংস্কৃত ভাষার উপর কবির শ্রদ্ধা যেরূপ ছিল গভীর, পাণ্ডিত্যও প্রায় ততোধিক ছিল, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যনাটকাদির সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় যৌবনকালের মধ্যেই সমাধা হইয়াছিল। মহাকবি হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার ধমনীতে আশৈশব প্রবাহিত, তাহার জন্য জীবনের যে কোনও মূল্য দিতে কবি প্রস্তুত ছিলেন। বিদেশযাত্রার প্রলোভন ও ধর্মান্তরগ্রহণের আয়োজন সেই সম্ভাবনাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা-বিপর্যয়ে কবি ইংলণ্ডের সুদূর উপত্যকায় পদার্পণ করিয়া মিলটনের মত কবি হইতে না পারিলেও মাদ্রাজে বসিয়া ইংরাজি ভাষায় কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মহাকবির দুর্লভ খ্যাতি তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিল না। অবশেষে মাতৃভাষার বিপুল সম্পদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবির অস্থির অতৃপ্ত কবিচিত্ত সৃজনের আনন্দে বশীভূত হইল, স্বল্পকালের মধ্যেই বিচিত্রবীর্য প্রতিভায়, দুরন্ত সৃষ্টিকর্মে, বিপুল বিস্ময়ে তিনি স্বদেশবাসীকে স্তম্ভিত পুলকিত করিয়া দিলেন। কিন্তু জ্যোতিষ্কমণ্ডলীচ্যুত ধূমকেতুর মত নিঃশেষে দীপ্তি বিতরণ করিয়া তাঁহার আশ্চর্যজীবন অচিরেই ক্ষয়িত হইয়া গেল, মহাকবি হইবার বিপুল আয়োজন সমাধিপ্রস্তরের গাত্রে উৎকীর্ণ কয়েকছত্র রক্তাশ্রুমূর্ছাতুর বিলাপেই চরম সমাপ্তিলাভ করিল।

মেঘনাদবধ কাব্যের মৌলিকতা

মহাকবি মধুসূদনের প্রতিভার সমস্ত দুর্বার আবেগ দুঃসাহস ও ক্ষমতা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা মেঘনাদবধ কাব্যে স্তম্ভিত হইয়া আছে। প্রতীচ্য কাব্য-সাহিত্য পাঠের শিহরণশীল অভিজ্ঞতা ও বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের দুর্মর আকৃতি যে বৃহদায়তন কোনও মহাকাব্য-রচনার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিবে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। গভীর অন্ধকারের পদাতিক নিকটবর্তী বৃক্ষশাখার বিহঙ্গকণ্ঠ অনুসরণ না করিয়া অনন্ত আকাশের স্থির সমুজ্জ্বল নক্ষত্রজ্যোতি অবলম্বনেই তাহার যাত্রাপথ নির্ধারণ করিয়াছে। ব্যাস বাল্মীকি হইতে হোমার ভার্জিল দান্তে টাসসো অরিয়েস্টো মিলটনের কাব্যাদর্শই আজীবন মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, পোপ-ড্রাইডেন বা কালিদাস-ভবভূতি তাঁহার প্রতিভার নিয়ামকশক্তিরূপে দেখা দেয় নাই, ইতিহাসের দিক দিয়া ইহা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ পূর্বসূরীর নিকট হইতে তিনি কেবল কাহিনী ও বর্ণনাভঙ্গিই আয়ত্ত করিয়াছিলেন, মহাকাব্যের উপযোগী ছন্দ ও ভাষা তাঁহাকে নির্মাণ করিয়া লইতে হইয়াছিল। ধ্রুপদী সাহিত্যভাণ্ডার হইতে তিনি কেবল সমিধ্ সংগ্রহই করিয়াছিলেন, কিন্তু যজ্ঞস্থান-নির্বাচন ও স্বরচিত মন্ত্ররচনার দ্বারা সাগ্নিকব্রত উদ্‌যাপনের মৌলিক কৃতিত্ব তাঁহারই। অথচ শেষ পর্যন্ত সে কাব্য কেবল প্রচলিত মহাকাব্যের একটি রূপান্তরিত সংস্করণমাত্র হইল না, তাহা বিদ্রোহী নবযুগের তীব্র বলিষ্ঠ আত্মমর্যাদায়, শৃঙ্খলচ্ছিন্ন সিংহশক্তিতে, প্রথাভঙ্গকারী আদর্শে পরিণত হইল। কাব্যের নায়ক চরিত্রে পুরাণানুমোদিত ধর্মবিশ্বাস-স্বীকৃত ব্যক্তির বদলে অধম পুরুষের সবিক্রম প্রতিষ্ঠা ঘটাইয়া তিনি অসাধারণ মহৎ কীর্তি স্থাপন করিলেন, বহুশতাব্দী ধরিয়া অন্ধভাবে অনুসৃত একটি বিশ্বাসের ভিত্তি চূর্ণ করিয়া পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীন স্বতন্ত্র মহিমাকেই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত করিলেন। যুদ্ধাস্ত্রসংঘর্ষ ও জিগীষার উন্মত্ত হুংকারের পরিবর্তে মহাপতনের গভীর মর্মন্তুদ হাহাকার সৃষ্টি করিয়া তিনি মহাকাব্যের এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত রস নিষ্কাশিত করিলেন। বিষ্ণুশক্তির অংশাবতারের সহিত মর্তত্রাস রাক্ষসকুলের নিদারুণ সংঘাতকে তিনি ধর্মাধর্মের সংঘর্ষ-কাহিনীতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া দৈবশক্তিপুষ্ট মানুষের সহিত অদৃষ্টনির্যাতিত ভাগ্যবিড়ম্বিত পুরুষকারের শোচনীয় সংগ্রামে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই রূপান্তরকার্য হয়ত কলাকুশলী শিল্পীর অভিপ্রেত ছিল না,

হয়ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রচলিত রীতিনীতির একটি ক্ষেত্রোপযোগী সমীকরণ রচনা করাই তাঁহার সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা যেন অলক্ষ্যে বসিয়া কবির সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যে মধুসূদন প্রতিভার সকল বাহ্য লক্ষণে চিহ্নিত হইয়া, সর্ববিধ পুরুষকারের অবিশ্বাস্য ক্ষমতায় দীক্ষিত হইয়া মহাকবি হইবার আয়োজন করিলেন, নিষ্ঠুর দুর্জ্ঞেয় নিয়তি সাংসারিক দুর্দৈবে ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গে তাহা বারবার ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। এই স্বধর্মবিভ্রান্ত লক্ষ্যহীনতার আর্তনাদই শেষ পর্যন্ত মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রচরিত্রের কণ্ঠে মর্মভেদী স্বরে উদ্‌গীত হইয়াছে। ইহাই মহাকবি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের অভিনবত্ব ও মৌলিকতা।

মেঘনাদবধ কাব্য কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা

মধুসূদনের জন্ম হয় ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে, তাঁহার প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে এবং তাঁহার শেষ কাব্য চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং তাঁহার কাব্যজীবন মাত্র ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য ইংরাজি ভাষায় রচিত তাঁহার প্রথম কাব্য দি ক্যাপটিভ লেডি ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত হইয়াছিল এবং ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কবি মায়াকানন নামক একটি নাট্যরচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই সব ধরিলে তাঁহার সামগ্রিক সারস্বত জীবনের সীমানা হয় তেইশ-চব্বিশ বৎসরের। কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কথা বাদ দিলে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠকাল মাত্র তিন-চার বৎসরের—১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা হইতে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে বীরাঙ্গনা কাব্য রচনাকাল পর্যন্ত। এই স্বল্প পরিধির মধ্যে এমন বিস্ময়কর আত্মস্ফুরণ, এমন অবিশ্বাস্য সিসৃক্ষা অন্য কোনো বাঙালী কবির পক্ষে স্মরণাতীত কালের মধ্যে সম্ভব হয় নাই। ইহার মধ্যে তিনি শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী এই পাঁচখানি নাটক এবং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য এই কবিতাগ্রন্থচতুষ্টয় রচনা করিয়াছিলেন। মাত্র নবম বৎসর বয়সে তিনি কপোতাক্ষ তীরভূমির শ্যামশষ্পাচ্ছন্ন গ্রাম্যনিবাস ত্যাগ করিয়া কর্মমদির নগরীর প্রাণকেন্দ্রে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তারপর পঞ্চদশ বৎসর এই কলিকাতায় তাঁহার গৌরবময় ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। উনিশ বৎসর বয়সে মধুসূদন খ্রীস্টধর্মে

দীক্ষিত হন এবং চব্বিশ বৎসর বয়সে সামান্ত একটি বিত্থালয়-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজে বিদায় গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় সে-কালের যশস্বী মনীষীবর্গের সহিত তাঁহার যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল—বত্রিশ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তৎকালীন কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনস্ফুরণে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর এই সকল সুধীসমাজের আনুকূল্যেই তাহা সহজে প্রচারিত হইয়াছিল—বিত্থানুরাগী কাব্যরসজ্ঞ সমালোচকদের আস্বাত্থমানতার পরীক্ষায় সে সকল রচনার স্থায়িত্বগুণ যথাসম্ভব নির্ণীত হইয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী মধুসূদনকে যেভাবেই বঞ্চনা করুন না কেন, কবির বন্ধুভাগ্যই তাঁহাকে বিনা বাধায় মসৃণভাবে সেকালের বাঙলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিসম্মান দান করিয়াছিল, এমন কি কবির পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। সুদূর ফরাসী দেশের হিমজর্জর নিঃসঙ্গ প্রবাসে করুণাঘন বিত্থাসাগর মহোদয়ের প্রেরিত অর্থ-সাহায্যই মধুসূদনকে শোচনীয় বিস্মৃতির আশঙ্কা হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গের আর্দ্র মৃত্তিকায় ফিরাইয়া আনিয়াছিল। মধুসূদনের রোমাঞ্চকর নাটকীয় জীবনকাহিনী বাঙলা দেশে তাঁহার কাব্যের মতই জনপ্রিয় হইয়াছে, সুতরাং এক্ষেত্রে সেই সুপরিজ্ঞাত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই। কাব্য হিসাবে মেঘনাদবধ কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়াই আমরা উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির প্রতি একালের তর্পণ সমাপ্ত করিব।

মধুসূদনের প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব মহাভারতে উল্লিখিত সুন্দ-উপসুন্দের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যেই কবি প্রথম বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন এবং পৌরাণিক প্রসঙ্গকে কবিতার বিষয়বস্তু করিয়া আধুনিক রুচিশীল পাঠকের ধর্মচেতনা-নিরপেক্ষ কাব্য-রসোপভোগের পরীক্ষা করেন। ইহার বিষয়বস্তু মহাভারতীয় কাহিনী হইতে গৃহীত হইলেও স্বর্গমর্তের সমীকরণের দ্বারা এবং বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতীক তিলোত্তমা চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা কবি যে মৌলিক কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সেকালের পক্ষে অভিনব ছিল। প্রকৃতি ও মানবকে অবলম্বন করিয়া মধুসূদন যে রোমান্টিক সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভাষা ও

ছন্দে যে সংগীত লাবণ্য সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে একটি কাব্য-সৃষ্টির দ্বারাই বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দান করিল। তিলোত্তমা চরিত্রের দ্বারা নারীমূর্তি ও নারীসৌন্দর্যের প্রতি কবির যে সহজাত দুর্বলতা ও আকর্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই আরও পল্লবিত আকারে তাঁহার মেঘনাদ-বধ কাব্য ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যে দেখা দিয়াছে। তিলোত্তমায় কোনো সুগঠিত কাহিনী নাই, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মহাকাব্যের কোনো সংজ্ঞানুযায়ীও ইহা লিখিত হয় নাই। ইহা নিছক কাব্য মাত্র, কবির নিজেরই ভাষায়—

এ বাক্‌সাগর আমি মথি সযতনে
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা।

তিলোত্তমা রচনার ফলে কবি যেন আপনার আত্মপ্রকাশের শক্তি আবিষ্কার করিলেন এবং সেই নবাবিষ্কৃত প্রতিভাকে স্থিতধী এবং আত্মস্থ করিয়া মেঘনাদ-বধ কাব্য রচনায় নিয়োজিত করিলেন। রামায়ণ কাব্যের আবাল্যপ্রিয় একটি আখ্যান তাঁহার অনারব্ধ কাব্যের তনুরেখা অঙ্কন করিয়া দিল, ইহার সহিত আজীবনলব্ধ জ্ঞান, দীর্ঘাচরিত কাব্য-রসবোধ ও সঞ্চয়ন যুক্ত হইল। হৃদয়ের গভীর বেদনায়, সৃষ্টির রক্তবেগতরঙ্গিত অন্তর হইতে যে বাণীর দিব্যসংগীত উৎসারিত হইল, তাহাই হইল উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য—নবজাগৃতির শ্রেষ্ঠতম ফসল, যুগজীবনের নিপুণতম প্রতীক। মেঘনাদবধ কাব্যের পর মধুসূদনের প্রতিভা আর এরূপ জ্যোতির্ময় ভাস্বরতায় জ্বলিয়া উঠে নাই—প্রবল দ্বীপধ্বংসকারী অগ্ন্যুৎপাতের পর ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যে স্তিমিত লাভাস্রোতের রক্তপ্রবাহ দেখা দিয়াছে মাত্র। ব্রজাঙ্গনা কাব্য যেন যুদ্ধক্লান্ত কবির দিবাবসানে উপকূলে বসিয়া স্বচ্ছতোয়া নদীর সলিলে রক্তপ্রক্ষালন এবং পাণ্ডুসন্ধ্যার অন্ধকারে বসিয়া পূরবীর সংগীতধ্বনি শ্রবণ। বীরাঙ্গনা কাব্য রোমক কবি ওভিদের নায়িকা-লিখিত পত্রকাব্যসংকলনের আদর্শে রচিত, কিন্তু ইহাও মেঘনাদবধের সহিত কোনো মতে তুলনীয় নহে। এই কাব্যের চরিত্রগুলি মহাকাব্যের নায়িকা হইবার যোগ্য কিন্তু ইহারা সকলেই যেন একটি অলিখিত মহাকাব্যের নায়িকা। বরং বলা যায় মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ যেরূপ মহাকাব্যের মধ্যবর্তী গীতি-ধর্মময়তায় আক্রান্ত, বীরাঙ্গনার নায়িকারাও সকলে যেন রণকোলাহলমুখর অস্ত্রবাদ্যধ্বনিত প্রতিহিংসাপরায়ণ ঘটনায় রুদ্ধশ্বাস এক একটি অদৃশ্য মহাকাব্যের অনুরূপ সম্ভাব্য চতুর্থ সর্গের নায়িকা।

এইজন্য মেঘনাদবধ কাব্যকেই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থন কৌশল, চরিত্রচিত্রণ প্রণালী, পূর্ণাঙ্গ কাব্যের রসাবেদনসৃষ্টির রহস্য, সর্গবিন্যাসবিদ্যা, ভাষা ও ছন্দোধ্বনি, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাক্‌সাগর মন্থনপূর্বক অমৃত চয়ন করিয়া বাণীমূর্তিকে সঞ্জীবিত করার যে পদ্ধতি মেঘনাদবধের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাহা পরবর্তী যুগে আর প্রত্যাবর্তন করে নাই। মেঘনাদবধ কাব্য কোনো অচরিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেও পরবর্তী কালে মধুসূদনের কবিকল্পনায় উদ্‌ভাসিত কোনো বৃহত্তর সম্পূর্ণতর আদর্শ জ্বলিয়া উঠে নাই, পরন্তু আয়ুর স্তিমিত দীপশিখা তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার উপর আলোকের বদলে ধূম্রবিকিরণ করিয়াছে। এমন কি মেঘনাদবধ কাব্য রচনার সহিতই কবি প্রকাশ্যে মহাকাব্যিকতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সংকল্প করিয়াছেন। তাই কুসুমদামসজ্জিত দীপবলীতেজে উজ্জ্বল প্রাসাদপুরীর কনকসিংহাসনে উপবিষ্ট মহানায়কের আস্ফালন হইতে কবি যমুনাতীরবর্তী রাধার মৃদু বিরহ-কলগীতে স্থানান্তরিত হইতে পারিয়াছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে নারীচরিত্রের মধ্যে বীর্যকোমলতার উচ্চাবচতা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত প্রণয়ের অপরিবর্তনীয় সূত্রের দ্বারাই ইহাদের সংগ্রথিত করা যায় বলিয়া ইহা বীররস বা করুণরসের বদলে মধুর রসের কোঠায় মহাকাব্যকে চিরকালের মত নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে। চতুর্দশপদী কবিতাবলী সম্পূর্ণ ভিন্নস্তরের কবিতা—কবির অন্তর্লোকের সামাজিক ও ব্যক্তিসত্তার দিনলিপি ও মন্ময় স্মৃতির খণ্ডকাব্য। ইহার সহিত তিলোত্তমা-সম্ভব-বীরাঙ্গনার কবির সাদৃশ্য নাই।

এই কারণে মেঘনাদবধ কাব্যই মধুসূদনের কবিপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দিগ্‌-দর্শনী। ইহার কারণ, প্রথমত, মেঘনাদবধ কাব্যেই কবি সর্বপ্রথম মহাকাব্যের উপযোগী সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত একপ্রকার ভাষা ও ছন্দোপদ্ধতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন যাহার ভিতর দিয়া বীর্য ও কোমলতা, রৌদ্র ও পেলব, ক্রোধ ও হতাশা, ঘৃণা ও প্রণয় ইত্যাদি বিচিত্র মনোভাব অনায়াসে সঞ্চারিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, এই কাব্যের বিশাল পটভূমিতে কল্পনার যে লহরীলীলা প্রকাশের সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে কবির দেশী-বিদেশী কাব্যসাহিত্য পাঠের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা নানা উপাদান যোজনার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পাইয়াছে। তৃতীয়ত, ইহার কাহিনীটি কবি সহসা আবিষ্কার করেন নাই। রাম-রাবণের সংগ্রামের মধ্য দিয়া পুরুষকারের ভাগ্যাহত পতনের দৈন্য-বিষাদজড়িত

রূপটি সম্ভবত শিশুকাল হইতে কোনো বৃহত্তর কাব্যে সার্থকরূপে চিত্রিত হইবার জন্য তাঁহার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়াছিল। চতুর্থত, অমানিত অবরুদ্ধ নারীত্বের প্রতি কবিমনের যে চিরন্তন সহানুভূতি ও দুর্বলতা ছিল, তাহাকে এই কাব্যে তাঁহার প্রিয় নায়কচরিত্রের পতনের হেতুরূপে ব্যবহার করিতে পারিয়া কবি অদৃষ্টবাদের প্রতি বিশ্বাসকে একটি নাটকীয় সংহতি দান করিতে পারিয়াছেন। পঞ্চমত, এই কাব্য রচনাকালে কবি কেবল বাঙলা ভাষায় একখানি আদর্শ মহাকাব্যই রচনা করেন নাই—ইহার মূল ঘটনা ও প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়া কবি যেন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ভাগ্যবিড়ম্বিত হাহাকার ও আর্তনাদকেই ভাষা দিতে পারিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই শেষ পর্যন্ত মেঘনাদবধ কাব্য প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য মহাকাব্যিক রীতির বিশুদ্ধ উদাহরণ মাত্রে পর্যবসিত না হইয়া একখানি জীবনরসাত্মক মহান কাব্যে পরিণত হইয়াছে এবং মধুসূদনের অলিখিত আত্মজীবনের খশড়া হইয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ষষ্ঠত, আধুনিক যুগের ইংরাজি-শিক্ষিত নাগরিকের বুদ্ধির বিজয়াভিযান, নবজাগৃতির যাবতীয় লক্ষণ এই কাব্যের বিষয় নির্বাচন ও কাব্যভাষ্যের ভিতর দিয়া সার্থক-ভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে। পুরাণ-কাহিনীর নূতন ব্যাখ্যা, দুর্জ্ঞেয় মানব-নিয়তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, পুরুষকারের মহিমা প্রভৃতি যাহা কিছু নবীন যুগের সাহিত্যচিহ্ন সে সবগুলিকেই কবি একটি কাব্যের আধারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। ইহাই মেঘনাদবধ কাব্যের অভাবনীয় জনপ্রিয়তার হেতু।

মেঘনাদবধ কাব্য বিচারের পদ্ধতি

গত এক শতাব্দী কালের মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যের তথা মধুসূদনের কবিপ্রতিভার বিস্তারিত ও বহুমুখী বিশ্লেষণ হইয়াছে এবং মেঘনাদবধ কাব্যখানি অবলম্বন করিয়া নানা ভাষ্যগ্রন্থ টীকাটিপ্পনী প্রকাশিত হইয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ারের মত মহাকবিকে ব্রাডলের মত সমালোচকের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; মল্লিনাথ কালিদাসের অনেককাল পরবর্তী। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই রাজনারায়ণ বসু ইহার সমালোচনা করিয়াছেন, সাময়িক পত্রপত্রিকায় মেঘনাদবধ কাব্যের ও মধুসূদনের অন্যান্য কবিকীর্তির যথাসম্ভব রসবিশ্লেষণ হইয়াছে। কবির

অকালমৃত্যুর দুই দশকের মধ্যে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই জীবনবৃত্তান্তের ভিতর দিয়াও কবির সাহিত্যসাধনার যথাসম্ভব পর্যালোচনা ও রসবিচারের চেষ্টা হইয়াছে। মোটামুটি এ পর্যন্ত মেঘনাদবধ কাব্যের বিচার-পদ্ধতি ও সমালোচনার আদর্শ দুই প্রকার দেখা গিয়াছে। একজাতীয় সমালোচনা কেবল কাব্যবিশ্লেষণ, পংক্তিগত সৌন্দর্যাবিষ্কার কিংবা সর্গীয় রহস্য ও তাৎপর্য-উদঘাটন অথবা চরিত্র-চিত্রণেই সীমাবদ্ধ। আর এক জাতীয় সমালোচনায় মধুসূদনের জীবনের পটভূমিকায় কাব্যবিচারের একপ্রকার আদর্শ প্রায় প্রথায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের অস্থির জীবননাট্য, তাঁহার প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত অবস্থাবিপর্যয়ের বৈপরীত্য, শিক্ষাদীক্ষা ও প্রতিজ্ঞার সহিত মাতৃভাষার কবিতে পরিণত হইবার অসামঞ্জস্য, তাঁহার ভাগ্যাহত জীবনের আর্তনাদ ও আশাভ্রষ্টতা এ সবই তাঁহার কাব্যের চরিত্রবিশেষের উপর পুনঃপুনঃ প্রতিফলিত হইয়াছে—এই জাতীয় বিশ্বাস হইতেই এই প্রকার সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। কবিজীবনের সহিত কাব্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ইহা সত্য এবং মোহিতলালের ভাষায়, "আধুনিক কবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব বা আত্মভাবপ্রাধান্য এতই প্রবল যে, কবির সহিত সহমর্মিতা ব্যতিরেকে কাব্যের রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে," ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই জাতীয় সমালোচনায় পথভ্রষ্টতার আশঙ্কা থাকে সর্বাধিক এবং মধুসূদনের কাব্যসমালোচনায় এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতি ছত্রেই মধুসূদনের কবি-জীবনের, ব্যক্তিজীবনের বা আত্মভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাস হইতে তাঁহার কাব্যের অপব্যাখ্যা কম হয় নাই। আবার কবিআত্মা কবিমানস ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় শব্দের দ্বারা মেঘনাদবধ কাব্যের বিশ্লেষণে অকারণ জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাব্যের চরিত্র-চিত্রণ, জীবনাদর্শ নির্মাণ, ভাষা ও ছন্দোরূপে কবির ব্যক্তিত্ব বিগলিত হইয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যুগজীবনের প্রবণতা ও কবির মধ্য দিয়া আপন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে—এইগুলি স্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত সেই প্রকার বিশ্লেষণ যে গভীর ইতিহাসচেতনা, বস্তুবাদী-দর্শনজ্ঞান ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে তাহা অনেক সমালোচকের মধ্যেই দেখা যায় না।

মেঘনাদবধ কাব্যখানি যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রচলিত আঙ্গিক অনুসরণে লিখিত, তখন এই কাব্যের বিচারে মহাকাব্যের সূত্রসম্মত

ও হেতুনির্দেশপূর্বক আলোচনা অপরিহার্য। মহাকাব্যের প্রচলিত আঙ্গিকের সহিত মধুসূদনের মহাকাব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতখানি, কবি কী পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কতটুকু মৌলিকতা যোজনা করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই কাব্যের নায়ক কে, ইহার রসবিচারে কবির উদ্দেশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে কিনা এবং কবি শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধে দুষ্ট কিনা এই সকল প্রসঙ্গের যথাযথ পর্যালোচনার দ্বারাই মধুসূদনের এই অমর সৃষ্টির মূল্যনিরূপণ করা সম্ভব। মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু শতাব্দীর অগ্নিবিহঙ্গের পক্ষবিধূননের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া জাতির মহা উপকার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি তির্যক মনোভাব উত্তরকালের পাঠকদের নিকট মধুসূদন ও তাঁহার কাব্য সম্পর্কে কিছু বিরূপ সমালোচনার জন্ম দিয়াছিল। যোগীন্দ্রনাথ এবং মধুসূদনের সমসাময়িক অসংখ্য সুধী মনীষী মধুসূদনের বৈপ্লবিক প্রতিভার সপ্রশংস স্বীকৃতি জানাইলেও মধুসূদনের ধর্মান্তরগ্রহণ এবং ব্যক্তিগত জীবনের উচ্ছৃঙ্খল অমিতাচারকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এইজন্য মধুসূদনের কাব্যে রামচরিত্রের অবমাননা ও রাক্ষস বংশের মানোন্নয়নের জন্য কবি রক্ষণশীল সমালোচকদের নিকট যথেষ্ট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মবিলাপের মধ্যে আশাভঙ্গের আর্তনাদের পশ্চাতে কবির ধর্মান্তরগ্রহণজনিত অনুতাপ আবিষ্কারেরও যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছে। ভক্ত ও প্রেমিক না হইবার জন্য কবির ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার অধিকার লইয়াও তাঁহার জীবনচরিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ অপরিণত বয়সে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠের নির্মম অভিজ্ঞতা হইতে এই কাব্যের উপর সর্বাধিক কঠিন সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিবে। মোটের উপর, মধুসূদনের কাব্যসমালোচনায় সেকালের মনীষীদের অনেকেই ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিরপেক্ষ কাব্যবিচারের মানদণ্ড বজায় রাখিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রবীণ রসবোদ্ধা ব্যক্তিও মধুসূদনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া কিরূপে মধুসূদনের পার্শ্বে হেমচন্দ্রের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে বিস্ময়কর লাগে। মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ ও সমালোচক রাজনারায়ণ বসুর মত ব্যক্তি মধুসূদনকে জাতীয় কবিরূপে স্বীকৃতি জানাইয়াও মধুসূদনের কাব্যের 'হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট প্যাণ্টলন' দেখা যাইবার গুরুতর অভিযোগ করিয়াছিলেন।

সুতরাং একালে মধুসূদনের কাব্যবিচারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ কাব্যরসাস্বাদনের অভ্রান্ত মানদণ্ড, তুলনামূলক কাব্যবিচার পদ্ধতির প্রয়োগ এবং সাহিত্যিক মহাকাব্যের প্রথা ও প্রসিদ্ধির পূর্বপ্রচলিত তৌল-পদ্ধতির সাহায্যে কবির শ্রেষ্ঠ রচনার মূল্যায়ন। মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনায় সমাজজীবনের পটভূমিকায় কাব্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিবার প্রবণতা যেমন কাব্যের রসাবেদনের দিকে উদাসীন হইয়া পড়িতে পারে, তেমনি কবির ব্যক্তিগত জীবনের সহিত সৃষ্ট চরিত্রবিশেষের ঐকরূপ্য আবিষ্কারের প্রসক্তিও এক ধরণের অতিরঞ্জিত সংস্কারের জন্ম দিতে পারে। এই উভয় প্রকার আশঙ্কা হইতে সতর্কভাবে মুক্ত থাকিয়া কাব্যকে কাব্যরূপে বিচারের চেষ্টাই সর্বাগ্রে বাঞ্ছিত।

ভারতীয় সংস্কার ও সিদ্ধরস-বিরোধী কিনা

নিরপেক্ষ কাব্যবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদবধ কাব্য ভারতীয় সংস্কারের প্রতিকূলতা করে কিনা এবং ইহা সিদ্ধরস-বিরোধী কিনা প্রথমে এই সম্পর্কে আমাদের অভিমত স্পষ্ট করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে কাব্যের লক্ষ্য আলোচনা-প্রসঙ্গে আচার্যগণ সিদ্ধরস নামে একটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'প্রসিদ্ধ কাব্যে বা মহাকাব্যে কবিদের উদ্দিষ্ট ও মৌলিক রুচির মধ্যে সংগতিস্থাপনই' এই জাতীয় শব্দের অভিপ্রেত। শ্রেষ্ঠ কাব্যে আমাদের রুচি ও নীতির নিয়ামক কতকগুলি আদর্শ থাকে, সেই সকল আদর্শের দ্বারা কাব্য জনচিত্তের যুগযুগ-বাহিত স্থির বিশ্বাস ও প্রত্যয়াদিকে অবিচলিত রাখিতে সাহায্য করে। সভ্যতার বিবর্তনে একদিকে মানুষের মৌলিক বিশ্বাসের যেমন নিয়ত পরিবর্তন ঘটে, তেমনি সেই অস্থির ঘূর্ণাবর্তের ভিতর হইতেই একটি শাশ্বত সত্যের ধ্রুব মহিমা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। যুগরুচি বিবর্তনশীল, মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু, রসগ্রহণ ক্ষমতা অসহিষ্ণু হইলেও সমাজ-দেশ-কাল-নির্বিশেষে আমরা কতকগুলি সনাতন সত্যকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করি। সেই সত্যগুলি দীর্ঘকাল মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠে, নতুবা কোনো মহাকবির প্রবর্তনায় অভ্রান্তভাবে তাহাদের গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়। এই সকল যুগপ্রসিদ্ধ চিরাগত সম্ভ্রান্ত প্রত্যয়গুলির সহিত সামাজিক মানুষের স্বীকৃতি ও আনুগত্যের যে মৌলিক যোগ স্বতঃসিদ্ধ, নতুন কালের কবিরা তাহা

প্রশ্নাতীতভাবেই গ্রহণ করিবেন, ইহাই আশা করা যাইতে পারে। সুতরাং বহুল-প্রচলিত, যুগান্তরে প্রচারিত ও অবিসংবাদিত কোনো কাব্যে বা মহাকাব্যে প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যের উপলব্ধিকেই সিদ্ধরস বলা যাইতে পারে। কাব্য শ্রবণ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার দ্বারা সিদ্ধরস পরিতৃপ্ত হয় বলিয়া রসবেত্তাগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতে আদিম ভারতীয় সমাজের মহাকবি যে শাশ্বত নীতি-নিয়মের প্রতিষ্ঠা ঘটাইয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুশির সৃষ্টি নহে—তাহা বহুতর ঘটনার দ্বারা পরীক্ষিত ও দীর্ঘকালের সমাজ-অভিজ্ঞতায় বিশ্বস্তভাবে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তীকালের কবিবৃন্দ সেই আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাদের যাথার্থ্যে কোনো সন্দেহ উত্থাপিত হয় নাই। মহর্ষি বাল্মীকি পৃথিবীর নরসমাজ অন্বেষণ করিয়া যে আদর্শ সর্বগুণান্বিত মহৎ নরচন্দ্রমার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাকেই নায়ক করিয়া তাঁহার অমর মহাকাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। সুখে-দুঃখে বিপদে-সংঘাতে ত্যাগে-ধৈর্যে বিচিত্র ঘটনার উত্থান পতনের মধ্য দিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শ মানবকেই জয়যুক্ত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কাব্য-মহিমা—ব্যক্তিবিশেষের অনুরাগ-বিরাগই তাঁহার কাব্যকাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। এই জন্যই পরবর্তীকালের আচার্যগণ কবিযশঃপ্রার্থীর কাব্য-প্রয়াস সমালোচনার পূর্বে এই নীতিবাক্যটি উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ।

সিদ্ধরসের এই অনড় নির্দেশ একালের কাব্যবিচারে কঠিন বিধানের মত পালিত হয় না বটে, কিন্তু একালের কবি যখন নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবন না করিয়া প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারত অবলম্বন করিয়াই তাঁহার কাব্যপ্রসঙ্গ প্রণয়ন করেন, তখন তাঁহার কাব্যবিচারে সেই পুরাতন নীতিবাক্যের প্রয়োগ অনিবার্যভাবে উত্থাপিত হইতে পারে। মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিলে দেখা যায় যে, মধুসূদন তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু রামায়ণ হইতেই সযত্নে সংকলন করিয়াছেন এবং আর্ষ মহাকাব্যের পরবর্তী অনুসারকদের পন্থাকেই নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করিয়া ভারতীয় কাব্যের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সহিত আপনার সংযোগরক্ষার দাবী জানাইয়াছেন। কাব্য বর্ণনায়, ভাষা ও ছন্দে, ভঙ্গি ও প্রসঙ্গে তাঁহার যতখানি বিদ্রোহ ও মৌলিকতা থাকুক, যে উৎস হইতে তাঁহার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অন্তত তিনি সম্মুখসমর

ঘোষণা করেন নাই। তৎসত্ত্বেও তাঁহার কাব্যের প্রধান চরিত্র হইয়াছেন রাবণ, যিনি বাল্মীকির কাব্যে সীতাকে প্রাতরাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। দেবতাবৃন্দকে তিনি হীন ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত করিয়াছেন, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ রাক্ষসগণের তুলনায় কাপুরুষরূপে চিত্রিত হইয়াছেন—ইত্যাদি বহু অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং সমকালীন পাঠক ও সমালোচকগণ মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিয়া এই কাব্যের সহিত ভারতীয় মহাকাব্যিক সংস্কার ও সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন, ইহা আশ্চর্যের নহে। এইজন্যই মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের পর রামচরিত্রের হীনতা এবং রাবণচরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের ফলে মধুসূদন সিদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন, এইরূপ অপবাদ প্রচণ্ডভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। I despise Rama and his rabble কিংবা Ravana was a grand fellow—কবির বিভিন্ন পত্রে ব্যক্তিগত মন্তব্যে উল্লিখিত এবং মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনী-গ্রন্থের মধ্য দিয়া জনসমক্ষে প্রচারিত এই জাতীয় উক্তি এই প্রকার বিশ্বাসের আনুকূল্য করিয়াছে। কাব্যের মধ্যেও নানাস্থানে রামচন্দ্র সম্পর্কে অশ্রদ্ধাকর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা আবিষ্কার করা কঠিন নহে। অন্তত প্রসঙ্গচ্যুত করিয়া দেখিলে তাহাদের উদ্দেশ্য আপাতদৃষ্টিতেই সেইরূপ মনে হইতে পারে। বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্র অবতার না হইলেও দেববংশ-সঞ্জাত অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, রাবণ রাক্ষসবংশজাত অধর্মাচারী। সুতরাং দেবরাক্ষস-সংগ্রামের পরিণামে রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণের পরাজয় ও হত্যায় সত্যের জয় স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহাতেই প্রাচীনতম ভারতীয় মহাকাব্যের সিদ্ধরস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাল্মীকির পরবর্তী যে সকল ভারতীয় কবি রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য বা নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাল্মীকি-প্রতিষ্ঠিত এই সিদ্ধরস অবহেলা করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার কাব্যে বাল্মীকির কাহিনীকে পরিবর্তিত না করিলেও রামচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের পৌরাণিক সম্ভ্রম-সংস্কারকে বিনষ্ট করিয়াছেন। এই কারণেই সমকালীন পাঠক ও সমালোচকবর্গ মেঘনাদবধ কাব্যের মৌলিকতা কবিপ্রতিভা ও অসাধারণ রচনানৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেও মধুসূদনের এই অপৌরাণিক মনোভাবকে বিনাদ্বিধায় স্বীকার করেন নাই। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মহাদেব-পার্বতী চরিত্রের অবমাননা ও হীনতার জন্যও কবি নির্মমভাবে সমালোচিত

হইয়াছেন। এমন কি, সমগ্র রাক্ষসবংশের প্রতি সমবেদনা ও রামচরিত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও যে সীতার প্রতি মধুসূদনের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, সেই সীতা চরিত্র সম্পর্কেও রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায়' মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"এই কাব্যের অতি সাধ্বী নারীচরিত্রও বিলাসিতার কলঙ্কে দূষিত হইয়াছে। একস্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয়, চপল বালিকার ন্যায় হরিণদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন, এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে 'নাতিনী জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে (৪র্থ সর্গ :৮৬-১৯৩ পংক্তি)। সীতার নম্রতা, অসাধারণ সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরন্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরোক্ত বর্ণনার ঐক্য হয় না।"

'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়' রাজনারায়ণ লিখিয়াছিলেন,—

"আর্যকুলসূর্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে।"

আলোচ্য উদ্ধৃতির মধ্যে রাজনারায়ণ-উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রুটির জন্যই মধুসূদনের সর্বাধিক সমালোচনা হইয়াছে। যে মধুসূদন স্বয়ং সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—You shan't have to complain again of the unHindu character of the poem, তিনিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, People here grumble and say that the heart of the poet in মেঘনাদ is with the Rakshasas! And that is the real truth!

কিন্তু কেবল রাক্ষসদিগের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্যই কবি নিন্দিত হইতে পারেন না। আসলে মধুসূদনের এই পুরাণবিরোধী মনোভাব ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকেই ইহার জন্য দায়ী করা হইয়াছে। তাঁহার চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু রামচরিত্রের হীনতা, লক্ষ্মণের কাপুরুষতা

ইত্যাদি ব্যাপারে বারবার মধুসূদনকে তিরস্কৃত করিয়াছেন এবং কেবল এই কারণেই ষষ্ঠ সর্গকে সমগ্র কাব্যের মধ্যে নিকৃষ্ট বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইহার কারণ স্বরূপ যোগীন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—

"ইহার প্রথম কারণ রক্ষোবংশের প্রতি কবির অত্যধিক সহানুভূতি এবং দ্বিতীয় কারণ বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া, হোমরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা। রক্ষোবীরদিগের বীরত্ব মধুসূদনকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তাহাদিগের প্রতিপক্ষগণও যে বীর, সে কথা তিনি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মবিশ্বাসও তাঁহার ভ্রমের অপর কারণ। জাতীয় ধর্মে বিশ্বাস থাকিলে যে মহাপুরুষদ্বয় বহু সহস্র বৎসর অবধি, হিন্দুজাতির হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, তিনি তাঁহাদিগকে এরূপভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না।"

বলা বাহুল্য মধুসূদনের সমালোচকগণ সকলেই নির্বিবাদে এই সমালোচনা স্বীকার করিয়া লন নাই এবং মধুসূদনের খ্রীস্টধর্মাবলম্বিত মনোভাবকেই একবাক্যে ইহার জন্য দায়ী করেন নাই। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহার মধুস্মৃতি গ্রন্থে ১৩২৩ সালের ১০ই চৈত্র তারিখের এডুকেশন গেজেট হইতে জনৈক সমালোচকের আলোচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তিনি রাক্ষসদিগের সহিতই সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া উহাদেরই বাড়াইয়াছেন। কিন্তু ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসদিগকে বাড়াইলে প্রকৃত কথা স্বীকারের সহিত রাক্ষসবিজেতাদিগকেই বাড়ান হয়। বাল্মীকি রামায়ণেও আছে যে, হনুমান রাবণকে সুন্দরকাণ্ডে রাবণ-সভায় দেখিয়া তাহার তেজে মোহিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন—

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা ॥
যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥

অর্থাৎ "আহা! রাক্ষসপতির কী রূপ, কী ধৈর্য, কী পরাক্রম, কী দ্যুতি! কী সুলক্ষণ! যদি ইহার অধর্ম এত বলবান্ না হইত, তাহা হইলে ইন্দ্রসহ সুরলোকের রক্ষক হইতে পারিতেন।"

দেখা যাইতেছে, রামায়ণে রাবণসম্পর্কিত এই সংকেতটুকুকেই মধুসূদন তাঁহার রাবণ-চরিত্র-নির্মাণে কাজে লাগাইয়াছেন। মধুসূদনের প্রসিদ্ধ

টীকাকার দীননাথ সান্যালও রামচরিত্র সম্পর্কে কবির উপর আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন—

"লক্ষ্মণের জন্য সমধিক ব্যাকুলতা ও কাতরতাও বীর রামের পক্ষে অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভাবিতে হইবে যে, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। কারণ, লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ এবং রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধনই এ কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং রাম এ কাব্যে সুভ্রাতৃবৎসলরূপেই চিত্রিত। অযোধ্যা ত্যাগকালে সুমিত্রা-জননী লক্ষ্মণকে রামের হস্তে ন্যাস-স্বরূপই দিয়াছেন। সুতরাং লঙ্কার বনরাজি মাঝে চণ্ডীর দেউলে গিয়া চণ্ডীপূজা যে কী ব্যাপার, বিভীষণের মুখে তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণের জন্য রামের ভয়-ব্যাকুলতাই রামের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসলের পক্ষে স্বাভাবিক।"

সর্বশেষে এই ব্যাপারে মধুস্মৃতি-রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ সোম যেভাবে সংস্কারমুক্ত কাব্যবিচারের আদর্শে মধুসূদনকে নিষ্কলঙ্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মন্তব্য—

"মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্রকে কাপুরুষের ন্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন, এই বিষয় লইয়া সমালোচকদিগের মধ্যে বড় অল্প বাগ্‌বিতণ্ডা হয় নাই। নানাজনে এ সম্বন্ধে নানামত ব্যক্ত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ রচনায় কবি রাক্ষসদিগের প্রতি ইচ্ছা করিয়াই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এজন্য অনেকেই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন।…কিন্তু তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে রামচন্দ্রকে কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন কিনা, তাহা ঠিক করিয়া বলা বিশেষ দুরূহ। রামচন্দ্র, কাব্যের অনেক স্থলে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার বীরত্বের লাঘব হইয়াছে, আর তিনি প্রতিপদে ক্রোধোন্মত্ত হইলেই যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত, এই মত যে সমীচীন তাহাও বলা যায় না। ইহা সত্য, তিনি রামায়ণের চরিত্রগুলিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। কোনো প্রাচীন কাব্যকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিলে (বিশেষত পৌরাণিক কাব্য) সেই মূল গ্রন্থের আদর্শে ও অনুকরণে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিতেই হইবে, এ নিয়ম স্বাধীন প্রকৃতির কবি কখনই মানিয়া চলিতে পারেন না। আর রামচন্দ্রকে মধুসূদন যদি যথার্থই কাপুরুষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই যে কেবল

অপরাধী, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিকেও উক্ত অপরাধে অপরাধী হইতে হইয়াছে।'

এই উক্তির দ্বারা মেঘনাদবধ কাব্যে সিদ্ধরসহানির অপরাধ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হয় কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চয়পূর্বক মন্তব্য করিবার অধিকারী নহি। কিন্তু আধুনিক কাব্যবিচারের উদারতর মানদণ্ডে মধুসূদনকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার প্রলোভনও ত্যাগ করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকগণ মেঘনাদবধ কাব্য-বিচারে জাতীয় সংস্কার ও স্বধর্মভীরুতার দ্বারা বারবার নিয়ন্ত্রিত হইয়াই ভুল করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু রামায়ণ হইতে গৃহীত হইলেও ইহা একটি স্বতন্ত্র কাহিনীকাব্য, নূতন কালের চেতনায় ইহার পুষ্টি ও গতিবেগ, একথা ভুলিলে চলিবে না। তাই প্রচলিত ধর্মসংস্কার, আদর্শ বা সিদ্ধরসের প্রতিষেধ-বাক্য এই কাব্য বিচারে সম্পূর্ণ অবান্তর বলিয়া মনে হয়। এই কাব্যের নায়ক কাব্যবিচারের মানদণ্ডে রাবণ নহেন, মেঘনাদ—যিনি বীর্যে আত্মপ্রত্যয়ে পুরুষকারের মহিমায় প্রেমে পারিবারিক কর্তব্যবোধে ও স্বদেশ-চেতনায় একটি নির্দোষ নিষ্পাপ চরিত্র—অথচ পিতৃকলঙ্কে ও বংশলজ্জায় যাঁহার শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে। সুতরাং এই তরুণ অপ্রগল্‌ভ বীর মেঘনাদের করুণ মৃত্যুকে মহান করিয়া তুলিবার জন্য কবি এক ভাগ্যবিড়ম্বিত অন্তঃসারশূন্য মহাশক্তির অবতারণা করিয়াছেন, যাহার বাহ্যিক নাম রাবণ। রাক্ষসবংশের সহিত বিষ্ণুর অবতারের পৌরাণিক সংগ্রামই এই কাব্যের কাহিনী—এরূপ ব্যাখ্যাই মেঘনাদবধ সম্পর্কে অর্থহীন মনে হইবে। মেঘনাদবধ কাব্যের মূল দ্বন্দ্ব ধর্ম-ভীরুতার সহিত ধর্মদ্রোহিতার, পুরুষকারের সহিত দৈবানুগ্রাহিতার। মধুসূদনের পক্ষে রামবিদ্বেষী হওয়ার অর্থ হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ বুঝায় না, তাহা দৈবানুকূল্যের প্রতি পদে-পদে-পরাজিত অদৃষ্টবিড়ম্বিত এক পুরুষকারের চরম উপহাস মাত্র। মধুসূদনের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পশ্চাতে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ ছিল না, বরং উনবিংশ শতাব্দীর বহু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর মতই তিনি মনে করিতেন, খ্রীস্টধর্ম একালের সর্বশ্রেষ্ঠ civilizing agency—সভ্যতার বাহক। এই নবপ্রবুদ্ধ সভ্যতার আলোকেই তিনি হিন্দুপুরাণের দেবদেবীদের নূতন চোখে দেখিয়াছেন, তাই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে স্বপ্নদেবতা ইন্দ্রও নিয়তির গতি লঙ্ঘন করিতে পারেন না, ত্রিলোকের ভাগ্যবিধাতা মহেশ্বরও মেঘনাদবধ কাব্যে স্বীকার করেন, দেবতা মানব কাহারও পক্ষে প্রাক্তনের

গতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই। মধুসূদন ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয়—বিলাসিতা ঐশ্বর্য সম্পদ ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁহার যে দুর্বলতা ছিল তাহাই তাঁহাকে সৌধকিরীটিনী লঙ্কা ও ইহার অধীশ্বর রাবণের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। রামকে কবি যে দেবতারূপে দেখেন নাই, মানুষরূপে দেখিয়াছেন, তাহার মূলে আছে নবজাগৃতিলব্ধ সেই দৃষ্টি, যে বলে—man is the measure of all things। রামচন্দ্রের প্রতি কবি যে সকল হীনম্মন্যভাবাত্মক উক্তি করিয়াছেন সেইগুলিকে পূর্বাপর-সম্পর্কচ্যুত করিয়া বিচ্ছিন্ন করিলে অনভ্যস্ত শ্রবণে পীড়াদায়ক হইবে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী তাহার যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে, তাহা পূর্ববর্তী সমালোচকগণ লক্ষ্য করেন নাই। তৃতীয় সর্গে প্রমীলাকে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশাধিকার দিবার সময় কবি রামচরিত্রে যে বিনয়, নারীত্বের প্রতি সম্ভ্রম ও বীর্যের প্রতি প্রণম্য মনোভাব প্রদর্শিত করিয়াছেন তাহা কোনো কাপুরুষের পক্ষে শোভা পায় না। যাঁহার চরিত্র ঘেরিয়া সুকঠিন ধর্মের নিয়ম মাণিক্যের অঙ্গদের মত সুকঠিন কান্তি লাভ করে, যাঁহার বীর্য ক্ষমাকে অতিক্রম করে না, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করিয়াও ধরাতলে সর্বোত্তম দুঃখ বরণ করিয়াছেন, তাঁহার বাহ্যিক দীনতা ও বিনতিকে যদি কবি অস্বীকার করিতেন এবং তাঁহাকে উদ্ধত করিয়া তুলিতেন তবে তাহা সিদ্ধরসের মর্যাদা রক্ষা করিত কিনা জানি না, কিন্তু কাব্যের চরিত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক হইত।

মহাকাব্য হিসাবে মেঘনাদবধের বিচার

মেঘনাদবধ কাব্য যে সময়ে বাঙলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তখন প্রচলিত সাহিত্যে কোনো আদর্শ ছিল না, সুতরাং পূর্বাবস্থিত কোনো কাব্যের আঙ্গিকে এই কাব্যের শ্রেণী নির্ণয় সম্ভব হয় নাই। বিবিধার্থসংগ্রহ পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন সিংহ এই কাব্যরচনার জন্য মধুসূদনকে হোমার ভার্জিল এবং মিলটন অপেক্ষা উচ্চমর্যাদায় স্থাপন করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ইণ্ডিয়ান রিফর্মার পত্রে তাহার সমালোচনা করেন এবং সমকালীন পত্রপত্রিকায় এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদও চলিয়াছিল। মোটের উপর, মেঘনাদবধ কাব্য যে বাঙলা ভাষায় একটি তুলনাবিহীন বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং মধুসূদন যে অসামান্য বাক্‌শিল্পী এই বিষয়ে তৎকালীন রসজ্ঞ সমালোচকদের মনে একটি অক্ষীয়মাণ ধারণা জন্মাইতেছিল। ইহার

দীর্ঘকাল পরে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তই প্রথম স্পষ্টভাষায় মেঘনাদবধ কাব্যকে এপিক বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহার সাবলিমিটি বা ভাবসমুন্নতি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন[১]। এপিক শব্দটি বিষয়ে বর্তমান কালে সাহিত্য-বিচারে কোনো অস্পষ্টতা নাই। এপিক বলিতে প্রতীচীয় সাহিত্যে যাহাকে long narrative poem, recounting heroic actions, usually of one principal hero and often with a national significance বলা হয়, মেঘনাদবধ কাব্যের উপর তাহার প্রয়োগ বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করে না। পাশ্চাত্য এপিক ও ভারতীয় মহাকাব্যের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় দুই রীতিপ্রকরণের একটি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য সমীকরণের দ্বারাও মেঘনাদবধ কাব্যকে বিচার করিবার প্রবণতা সার্থক হইয়াছে। হোমার ভার্জিল অরিয়েস্টো কিংবা ব্যাস-বাল্মীকি কালিদাস—দেশীয় বিদেশীয় সাহিত্যের সর্বকালীন শ্রুতকীর্তি কবিদের সহিতই বিনাদ্বিধায় মধুসূদন-প্রতিভার তুলনা করা এখন অনেক মসৃণ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং মেঘনাদবধ কাব্য যে মহাকাব্য বা এপিক লক্ষণাক্রান্ত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই এপিক বা মহাকাব্য শব্দটির দ্বারা সাহিত্যের রীতি প্রকৃতির কতখানি উদ্ভাসিত হয়, সেই বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা ও মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে তাহার উপযোগিতার আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যালোচনায় এপিক শব্দটি দ্বিধাবিভক্ত—স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য এবং সাহিত্যিক মহাকাব্য নামে ইহার দুইটি শাখা কল্পনা করা হইয়াছে। উভয় শাখার কতকগুলি সার্বভৌম লক্ষণ থাকিলেও ঐতিহাসিক দিক হইতে স্বতঃস্ফূর্ত বা primitive epic এক আদিম সমাজের পৃথুল-কলেবর কাব্য, যাহার ভিতর দিয়া একটি বৃহৎ যুগ ও জাতির ইতিহাস মূর্ত হইয়া উঠে, রবীন্দ্রনাথ যাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, "বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান" করিয়া থাকে। ইহারা ইতিহাসের এক প্রাচীন কালসন্ধিতে রচিত হয় এবং শত শত বর্ষ ধরিয়া এক একটি মহাদেশের উপর নানাভাবে—জাতীয় জীবনে ধর্মে

১ অবশ্য গ্রন্থ-প্রকাশের কিছুকালের মধ্যেই মেঘনাদবধের একাধিক টীকাকার এই কাব্যের সহিত হোমার-ভার্জিল-মিলটনের কাব্যের তুলনা করিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি এরিস্টটল-নির্দেশিত পাশ্চাত্য এপিক-লক্ষণের সহিত মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্যত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যচিন্তায় পরিবারিক আদর্শে কিংবা আধ্যাত্মিক চিন্তায়, প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এইজন্যই মানব সভ্যতা ও সাহিত্যের আদি ইতিবৃত্তের সহিত ইহাদের নিগূঢ় সম্পর্ক থাকে। বিশালতায় ওজস্বিতায় একটি সামগ্রিক দেশকালের সর্বাত্মক প্রতিবিম্বনে এবং একটি সমগ্র জাতির কাহিনীর গ্রন্থনে এইগুলি একটি নৈসর্গিক বস্তুর মত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার বিখ্যাত 'মহাকাব্যের লক্ষণ' নামক প্রবন্ধে তাই লিখিয়াছিলেন, "উহাদিগকে কোন মানবহস্ত-নির্মিত কৃত্রিম কারুকার্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্ত-নির্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।" ঋজুতা সরলতা প্রশস্ততা ও মহান ভাব ইহাদের উপাদান—কোনো অলংকার শাস্ত্রের বিধিবিধান এই জাতীয়কাব্যের সূত্র নির্দেশ করিতে পারে না। একজন কবির নামেই ইহাদের রচয়িতৃ-পরিচয় চিহ্নিত হয় বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন, ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না।" বিশ্বসাহিত্যে কেবল হোমার ব্যাস বাল্মীকি এবং আরও দুই একজন কবি এইরূপ মহাকাব্যের কবি। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পুনরায় স্মরণ করিলে বলা যায়, "আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড ও এনিড ছিল। তাহারা সমস্ত গ্রীস ও রোমের হৃৎপদ্মসম্ভব ও হৃৎপদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর ও ভার্জিল আপন আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই বাক্য উৎসের মত স্ব স্ব দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে। আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না"—(রামায়ণ—প্রাচীন সাহিত্য)।

ইহাই যথার্থ মহাকাব্য, মহত্ত্বে আকারে সব দিক দিয়াই সার্থকনামা সুতরাং এই বিশেষ্যের শিরোনামায় মাঘ ভারবি বা মিলটনের কাব্যের বিচার চলে না। রবীন্দ্রনাথ হোমারের সঙ্গে ভার্জিলের নাম যুক্ত করিয়াছেন, যদিও সমালোচকগণের মতে, ভার্জিল সাহিত্যিক বা কৃত্রিম মহাকাব্যের রচয়িতা মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব কিরাতার্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্যায়ের গ্রন্থ

নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সংগত হয় না।"

সুতরাং নামকরণে বিভ্রান্তির প্রয়োজন নাই—ইংরাজি authentic বা primitive epic এবং literary epic এই শব্দদ্বয়ের দ্বারাই সামগ্রিক ভাবে মহাকাব্যের আলোচনা করা সংগত এবং মেঘনাদবধ কাব্য বিচারে মহাকাব্য বলিতে literary বা সাহিত্যিক মহাকাব্যই বুঝাইবে।

বস্তুত মহাকাব্যের সেই আদিম যুগের অবসান হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যিক মহাকাব্যে তাহার রেশ রহিয়া গিয়াছে। সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য ও বিশেষ যুগের জীবনধারার রূপায়ণের মধ্য দিয়া কৃত্রিম মহাকাব্যও জীবনের একটি ওজস্বল বীর্যবান রূপকেই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন কাল ও যুগান্তরে বীর্যবত্তার শাশ্বত অপরিবর্তনীয় সংজ্ঞাটির উপরই যদি মহাকাব্যের প্রতিষ্ঠা হয় তবে সেই বীর্যবত্তা এক এক সময়ে ও সমাজে এক এক বেশে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই গৌরবভূয়িষ্ঠ স্বভাব বা 'হিরোইক নেচার' ঐহিক সুখ অথবা আত্মরক্ষা, জীবনমোহ অথবা স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুর উর্ধ্বচারী এমন কিছু, যাহা যশের দ্বারা সংকীর্ণ নহে, জিগীষার দ্বারা পীড়িত নহে, লৌকিক লিপ্সা বা পারলৌকিক মুমুক্ষার দ্বারা মুদ্রিত নহে। তাহা কোনো সাম্রাজ্যের মহান পতন হইতে সুরু করিয়া একালের কোনো তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। 'হিরোইক এজ' কোনো কালবিশেষের সম্পত্তি নহে। এবারক্রম্বি যাহাকে vehement private individuality freely and greatly asserting herself বলিয়াছেন, তাহা যে কোনও যুগেই ঘটিতে পারে। সাবলিমিটিকেই যদি মহাকাব্যের চূড়ান্ত লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তবে সেই বিশালতা, চিত্তপ্রসার, গাম্ভীর্য ও বিস্ময় সাহিত্যিক মহাকাব্যের কবির পক্ষে অনায়ত্ত নহে।

অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অলংকারশাস্ত্র কৃত্রিম অর্বাচীন কালের ব্যক্তি-কল্পিত মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছে, তাহা মহাকাব্যের স্বরূপকে অনেকখানি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই জাতীয় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু যে আদিম কালের মহাকাব্য হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই ইহাদের অনুচিকীর্ষার প্রধান সূত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার সুরচিত কাহিনী ও একমুখিতা, সর্গগ্রন্থনের শিল্পকৌশল, বিষয়বস্তুর বিন্যাস-রীতি, পাণ্ডিত্যের সূচীকর্ম, ঐতিহ্যানুযায়ী রসাবেদন সব মিলিয়াই সাহিত্যিক

মহাকাব্য কেমন যেন নিষ্প্রাণ আদর্শ। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সাহিত্যিক মহাকাব্যের কবিবৃন্দ সকলেই এরিস্টটল পোপ ড্রাইডেনের সূত্র অনুসরণ করিয়া কাব্য রচনা করেন নাই। তাই তাঁহাদের ব্যক্তিচিত্তের নিজস্ব প্রবণতা এই জাতীয় মহাকাব্যগুলিকেও অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব দান করিয়াছে। মধুসূদনও তাঁহার সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনায় কোনো নির্দিষ্ট বন্ধনরীতিকে স্বীকার করেন নাই বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থের মহাকাব্যত্ব পাণ্ডুর নিয়মনিষ্ঠায় ধন্য হয় নাই—অনিয়মিত প্রতিভায় সার্থক হইয়াছে।

এরিস্টটল এপিককে ট্রাজেডির সহিত সমসূত্রে আলোচিত করিয়াছেন এবং রচনাগত ও রসগত পার্থক্য ব্যতীত ট্রাজেডির সামান্য লক্ষণগুলি এপিকেও স্থাপন করিয়াছেন। ঘটনার দিক দিয়া ইহা সরল ও জটিল এবং করুণ ও নৈতিক এই পর্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার ঘটনাবহুলতা কেবল বিশালতার বোধকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্যই, অন্যথায় নায়ক-লক্ষণে, কাহিনীর এক-মুখিতায়, স্থান-কাল-ঐক্যে, সর্গবন্ধে ইহা নাটকের সহিতই তুলনীয়। মহা-কাব্যের জন্য যে বিশেষ এক প্রকার ছন্দের প্রয়োজন তাহা পরবর্তী সমালোচকগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সূচনাংশে মিউজ বন্দনা, বস্তুনির্দেশ, জাতীয় ইতিহাস বা পৌরাণিক বৃত্তান্ত গ্রহণ, দেবতা-মানব সমীকরণ, উপমা-সম্ভার প্রভৃতি লক্ষণগুলি পরবর্তী মহাকাব্যে প্রায় যথাযথই দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে এই সকল রীতি-নির্দেশ মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার নায়ক মেঘনাদ সাহিত্যিক মহাকাব্যের নায়কের মতই উদাত্ত ও বীর্যবান, অকুতোভয়, আত্মবিসর্জনকারী। মহাকাব্যের নায়ক সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমালোচক বলিয়াছেন—

Epic heroes are to some extent representative of whole human races. Thus while epic raises its figures to astounding heroic stature, if never makes them strange by eccentricity. They may be giants but they retain the form and blood of the family of man. (Cassell's Encyclopaedia of Literature.) মেঘনাদবধ কাব্যের নায়কও সেইরূপ মানববংশ-সম্ভূত, মানবিকগুণের সর্বাত্মক বিকাশ তাহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার পরাক্রম ও প্রেম, জিগীষা ও পিতৃভক্তি, পৌরুষের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও

সহজ ভাবে মৃত্যুবরণের দুঃসাহস, স্বদেশপ্রেম ও বংশমর্যাদা তাঁহাকে অতিকায় জীবে পরিণত করে নাই—তাঁহার সকল অসাধারণত্ব সত্ত্বেও এই মর্ত্যপৃথিবীর রক্তমাংস-সজীব প্রাণীতেই পরিণত করিয়াছে। এপিক-কবির উদ্দেশ্য সর্বদাই to magnify this theme and his men—মধুসূদনও তাঁহার কাব্যের যে themeটিকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহা দৈবশক্তির সহিত পুরুষকারের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে রাবণের বা মেঘনাদের কোনো ঐহিক চরিতার্থতা বড় হইয়া দেখা দেয় নাই, কোনো পার্থিব বা অপার্থিব লাভক্ষতি অপেক্ষা মানবাত্মার মহৎ মর্যাদা রক্ষাই তাঁহাদের কাছে একমাত্র অভিলষিত হইয়া উঠিয়াছে। যে ধ্রুপদী রচনার আদর্শকে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের পক্ষে বরণীয় বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে—সেই ধ্রুপদী রচনার প্রত্যক্ষতা, ঋজুতা, স্থাপত্য ও গাম্ভীর্য সবই মধুসূদনের রচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত পত্র-রচনায় কবি একাধিকবার গ্রীক সাহিত্যরীতির প্রতি তাঁহার আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে গ্রীসীয় জীবনাদর্শ উহার সর্বশ্রেণীর সাহিত্যে, বিশেষত গ্রীক মহাকাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং যে সাহিত্যরীতির অনুকরণ করিয়াই ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে সমগ্র য়ুরোপে ভাববিপ্লব ও নবজাগৃতি দেখা দিয়াছিল, সেই জীবনাদর্শ মধুসূদনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, উহাই তাঁহার মহাকাব্যের আদ্যন্ত প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। জীবন সম্পর্কে বাস্তব ইন্দ্রিয়-সচেতন ঋজুদৃষ্টি, ভাবাতিরেকবর্জিত বোধশক্তি, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ, অতন্দ্র পুরুষকারের প্রতি আস্থা, সংস্কারমুক্তি ও মানবিকতা এইগুলিকেই গ্রীক জীবনাদর্শ বলা যাইতে পারে। হোমার-ভার্জিল হইতে মিলটন পর্যন্ত যে জীবনের স্তাবকতা করিয়াছেন, মহাকাব্যের কবি মধুসূদন সেই জীবনকেই আকুল আগ্রহে তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে স্থান দিয়াছেন, এইখানেই মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্যত্ব।

কিন্তু কেবল জীবনাদর্শের প্রতি আত্মার আকর্ষণই তো মহাকাব্যের কায়-ব্যূহ নির্মাণ করিতে পারে না, ইহার সহিত আলংকারিক প্রথারও সমীকরণের প্রয়োজন। সেই অলংকার-নির্দেশ কবি ভারতীয় শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ আছে মধুসূদন সেগুলির সহিতও সুপরিচিত ছিলেন। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ তাঁহার অপঠিত ছিল না, কারণ বঙ্গভাষার

শ্রেষ্ঠ কবি হইবার প্রস্তুতিতে তিনি কোনো ত্রুটি রাখেন নাই। তাঁহার একটি পত্র হইতেও জানিতে পারি, বিশ্বনাথের নির্দেশ তাঁহার নিকট অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় নাই, এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে মহাকাব্যের যে সকল শর্ত আছে তাহার ভিতর সর্গবন্ধতা, কাব্যারম্ভের নমস্ক্রিয়া ও বস্তুনির্দেশ, ইতিকথাশ্রিত বিষয়বস্তু, চতুরোদাত্ত নায়ক, অলংকার-প্রাচুর্য, নানা বৃত্তান্তের অবতারণা প্রভৃতি সূত্র বিশ্বনাথের আলোচনাতেও পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। বিশ্বনাথের মতে, মহাকাব্য সর্গবন্ধ হইবে, নায়ক হইবে ধীরোদাত্তগুণান্বিত কোনো সদ্বংশ ক্ষত্রিয় শূর, ইহার রস হইবে শৃঙ্গার বীর ও শান্ত রসের অন্যতম (টীকাকারের মতে করুণও), ইতিহাস বা কল্পনা-অবলম্বিত ও চতুর্বর্গ-উদ্দেশ্যযুক্ত হইবে। এই জাতীয় মহাকাব্যের প্রারম্ভে নমস্ক্রিয়া, আশীর্বাদ ও বস্তুনির্দেশ থাকিবে, মুখ্যত একই ছন্দে রচিত হইবে—ইহার সর্গ সংখ্যা হইবে আট বা তাহারও অধিক, সর্গের শেষে ভাবীসর্গের সূচনা করিতে হইবে। কাব্যের ও সর্গের নামকরণেও বিশ্বনাথ সূত্র বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং ইহার সহিত মহাকাব্যে বর্ণনীয় সন্ধ্যা সূর্য চন্দ্র রজনী যুদ্ধ যজ্ঞ প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপস্থাপনারও নির্দেশ দিয়াছেন। এই সকল বাহ্য লক্ষণে অবশ্য মহাকাব্যের চূড়ান্ত প্রকৃতি নির্দেশিত হয় না, কিন্তু ভারতীয় বা পাশ্চাত্য মহাকাব্যে মোটামুটি এই সকল লক্ষণেরই সচেতন বা অচেতন অনুসৃতি দেখা যায়। মহাকাব্যের কবিদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মধুসূদনও সজ্ঞানে পূর্বাপর এই সকল শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করিতে বসিয়াছিলেন। এমন কি 'কোনো ফরাসী সমালোচকও আমার কাব্যে ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারিবেন না' এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ও এক সময় তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল—একটি পত্রে তাহার প্রমাণ আছে। বিশ্বনাথের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, গ্রন্থারম্ভে নমস্ক্রিয়া, আট সর্গের অধিক সর্গে কাব্যরচনা, নায়কের ধীরোদাত্ত স্বভাব, বীর শৃঙ্গার ও করুণ রসের যোজনা, সর্গের বিষয়বস্তু অনুসারে সর্গনামকরণ, বৃত্তের নামানুসারে অর্থাৎ মেঘনাদহত্যা ঘটনানুযায়ী কাব্য-নামকরণ এবং একই ছন্দের ব্যবহারে মধুসূদন বিশ্বনাথকেই অনুসরণ করিয়াছেন। অথচ এই অনুসরণ সর্বাত্মক নহে, কারণ এই কাব্যের নায়ক সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় নহে বা নায়কের জয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া কাব্য সমাপ্ত হয় নাই। এ সকল ক্ষেত্রে মধুসূদনের উক্তিই সত্য যে,

I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpana. I shall look to the great dramatists of Europe for models.

কিন্তু ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবির উল্লেখ না করিয়া মধুসূদন কেন নাট্যকারদের উল্লেখ করিলেন? ইহার সম্ভাব্য কারণ, রাবণ চরিত্রের ট্রাজিক পরিণাম—তাহার দুর্জ্জেয় দুরতিক্রম্য অদৃষ্ট-শক্তির সহিত নিষ্ফল সংগ্রাম ও অসহায় পতন বাস্তবিকই নাটকোচিত, তাই গ্রীক নাটকের সেই অদৃষ্টচক্রই কবিকে হয়ত রাবণ চরিত্র নির্মাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অথবা হয়ত কবি অসতর্ক-ভাবেই ড্রামাটিস্ট শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। মোটের উপর, প্রাচ্য পাশ্চাত্য মহাকাব্য লক্ষণগুলি সম্মুখে প্রসর্পিত করিয়াই মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্যগুলির সহিত তাঁহার রসগত অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল, সুতরাং তাঁহাদের রূপরীতি প্রকরণ ও আদর্শ তাঁহার কবিকল্পনায় নানা সময়ে উপাদান যোজনা করিয়াছে। তবে প্রাচ্য মহাকাব্য-লক্ষণের তুলনায় প্রতীচীয় মহাকাব্যে যে ওজস্বিতা ও বীর্যবত্তা আছে এবং অপেক্ষাকৃত আঙ্গিক-শিথিলতা আছে, তাহার জন্যই ইউরোপীয় সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলি অনুকরণের পক্ষে তাঁহার নিকট আদর্শ হইয়া দেখা দিল। কাব্যের বিষয় নিরূপণের পদ্ধতি, অভিষেক যুদ্ধ হত্যা অস্ত্রপ্রদান, শত্রুতার দৈব আয়োজন, দেবমানবের মিলিত নাট্যরঙ্গ, অন্ত্যেষ্টি—এই সব ব্যপারে তিনি হোমারের কাছেই অধমর্ণ হইয়াছেন। প্রেতপুরীর বর্ণনা তিনি ভার্জিলের ও দান্তের কাব্য হইতেই গ্রহণ করিলেন, টাস্‌সো মিলটন হইতেও তাঁহার ঋণের সীমা নাই। কিন্তু কেবল নির্বিকার উপাদান সংগ্রহ করিয়াই তিনি মহাকবি হইবার দুঃসাহস বা স্পর্ধা দেখান নাই। তৎসহ আত্মপ্রকাশের যে বিপুল আগ্রহ তাঁহার শিক্ষাদীক্ষায় স্তম্ভিত হইয়াছিল তাহা কোনো ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসে সার্থক হইত না। দুর্ভাগ্যবশত তিনি সেই আদিম কালে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, যে-কালে মহাকাব্য রচনা সার্থক হইত। তাই পৌরাণিক কাহিনী হইতেই তিনি বিষয়বস্তু নির্বাচন করিলেন। কিন্তু সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়া তাঁহার আপন জীবনের প্রবণতাই বড় হইয়া উঠিয়াছে—সে প্রবণতা মনুষ্যত্বের পুরুষকারের, আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদার। নবযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, নবজাগৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ এই কাহিনীকে রূপক করিয়া তুলিল—মধুসূদনের যুক্তিবাদী মনন তাই এই কাহিনীতেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন

রামায়ণের সহিত ইহার যে আদর্শগত বৈষম্য তাহার মূল নিহিত আছে মধুসূদনের চিত্তে, তাঁহার ধর্মভাবনায় নহে। তিনি তো দৈবশক্তির উপর বিশ্বাস রাখেন নাই, আত্মমর্যাদার উপরই আস্থা রাখিতে চাহিয়াছেন। তাই রামচন্দ্রকে নায়ক করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। অথচ মহর্ষির কাহিনীকে পরিবর্তিত করিবার স্পর্ধা তাঁহার ছিল না, তাই তাঁহার নায়ক রাক্ষসবংশের মহাবীর হইলেও মৃত্যুই হইল তাঁহার ললাটলিখন—ইহা অপেক্ষা একালের কবি সংঘার্ত-জটিল সমস্যাবহুল পীড়িত সংসারে কোন্ মহাযুদ্ধবিজয়ের কথা কল্পনা করিতে পারেন? বিশেষত যে নারীকে নবযুগের কবি সম্ভ্রমের স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়াছেন, সেই নারীর প্রতি অসম্মান এই বিলাপিত পতনকে যেন আরও অপরিহার্য করিয়া তুলিল। অতএব মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনীতে মহাকাব্যত্বের বিন্দুমাত্র অভাব নাই। ইহার ভাষা ও ছন্দ মধুসূদনের প্রতিভারই উপযুক্ত নিমিতি। বিদ্যুতের ভাষা যেরূপ বজ্রধ্বনি, বর্ষণ যেরূপ তাহার ছন্দোরূপ, সেইরূপ এই প্রমত্ত প্রাণের উপযুক্ত একটি ভাষা ও ছন্দই মধুসূদন আবিষ্কার করিলেন। এইভাবে রামায়ণে বর্ণিত অগৌরবী বিষয়বস্তু কবির হাতে বিশাল জীবনের বলিষ্ঠ কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে এবং উপযুক্ত প্রতিভায় তাহা বিশালতা গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে বলিয়াই, মেঘনাদবধ কাব্য কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোনও সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডেই সর্বাঙ্গসার্থক না হইলেও, কেবল ওজস্বিতা ও বিশালতা গুণেই ইহাকে মহাকাব্য বলিতে একালের সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে কোনো প্রকার দ্বিধার কারণ ঘটে না। এই মহাকাব্য আখ্যা যুগপৎ ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতেই প্রযোজ্য হইতে পারে, কারণ দুই রীতির প্রতিই তাঁহার সচেতন আনুগত্য ছিল এবং ভারতীয় কিংবা কোনও প্রতীচ্য কোনও নির্দেশকেই তিনি উপেক্ষা করেন নাই। মধুসূদন হয়ত বিনয়বশত তাঁহাব কাব্যকে মহাকাব্য বলেন নাই—কিন্তু খর্বাকার মহাকাব্য-যশঃপ্রার্থী উদ্বাহু কাব্য-অধ্যুষিত বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র ইহার উচ্চতাই বিস্ময়কর এবং সেই উচ্চতায় দাঁড়াইয়া কেবল বঙ্গসাহিত্যের শ্যামশস্যশোভন উপত্যকাকেই সমতট বলিয়া মনে হয় না—বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যান্য অভ্রভেদী শিখরগুলিও দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

কাব্যনায়ক রাবণ না ইন্দ্রজিৎ

মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণ না ইন্দ্রজিৎ, এই সম্পর্কে বহুকাল পর্যন্ত মধুসূদনের কাব্যসমালোচকদের মনে কোনো সন্দেহ জাগে নাই। মধুসূদন তাঁহার কাহিনীকাব্যে কাব্যনায়কের মৃত্যুরই বিতানিত আয়োজন করিয়াছেন, ইহাই সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু প্রখ্যাত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই বিষয়ে নূতন আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছেন—এই সম্পর্কে আমাদের অভ্যস্ত ধারণা পরিমার্জনের যুক্তিপূর্ণ দাবী করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদনের মহাকাব্যের নায়ক-সম্পর্কিত পূর্বপ্রচলিত বিশ্বাসকে পুনর্বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। মোহিতলাল আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে নায়ক চরিত্রচিত্রণে কবির নিষ্ঠা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মেঘনাদ কবির সজ্ঞানমনের অনুমোদিত নায়ক হইলেও নির্জ্ঞানমন রাবণকেই নায়কপদে গ্রহণ করিয়াছে। কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারে মেঘনাদকে এই কাব্যের নায়ক বলিলেও 'গভীরতর অর্থে এ কাব্যের নায়ক রাবণ', বিষয়টি তাই পরীক্ষার প্রয়োজন।

মহাকাব্য ক্লাসিক কবিকল্পনার সৃষ্টি—এখানে সরল প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ঋজু-ভঙ্গিতে সব কিছু বর্ণনা করা হয়। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গম্য আমাদের দেহমনের পক্ষে সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য তাহাই ক্লাসিক কবির উপযোগী। সুতরাং মধুসূদন যে উদার সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ জীবনাদর্শ ও ধ্রুপদী সরল ভঙ্গিতে তাঁহার কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনো নির্জ্ঞান-সজ্ঞান মনের স্তরভেদ আদৌ ছিল কিনা, অথবা এখানে কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিচারে দুই পৃথক মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায় কিনা, তাহা চিন্তনীয়। মধুসূদন রোমান্টিক কবি ছিলেন না—তাঁহার আত্মনিরপেক্ষ নিরাসক্ত হৃদয় ও মননের বাঙ্ময় প্রকাশই এই কাব্যটিকে নিপুণ সূচীশিল্পের মত ধীরে ধীরে নির্মাণ করিয়াছে। সুতরাং এই কাব্যের সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত কবি একটি আদর্শকেই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন—সে আদর্শ ক্লাসিক কবির, মহাকাব্যের কবির যুগায়ত আদর্শ। এই কাব্যের ছত্রবিশেষে গীতিকবিতার স্বরমূর্ছনা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা মহাকাব্যেরই অপরিহার্য স্বভাব বলিয়া। মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানেরই স্থান হয়, শস্য-ক্ষেত্রের স্থান হয় না। মহাকাব্যের স্থূল বস্তুবিবৃতি, রণকোলাহল এবং ধীরোদাত্ত নায়কের শৌরহুংকারের পাশে তাই স্বগতকণ্ঠের স্মিত সংগীত-ঝংকার মহাকাব্যের সংগতি ও সামঞ্জস্যকেই

পরিস্ফুট করিতে সাহায্য করে। অতএব সামগ্রিকভাবে যাহা মহাকাব্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহাকে রোমান্টিক কাব্যের লক্ষণে দেখা উচিত কিনা বিচার্য। সেইদিক হইতে মধুসূদন তাঁহার নায়ক চরিত্র সৃষ্টিতেও আদর্শভ্রষ্ট হন নাই এবং একটি নায়ককেই তাঁহার কাব্যের অক্ষরেখায় স্থাপিত করিয়াছেন এইরূপ বিশ্বাসই সমীচীন। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায়, নিরঙ্কুশ ক্লাসিক কল্পনা এ যুগে কোনো মতেই সম্ভব নহে। বিশেষত প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জাগরণের যুগে সর্বাধিক ক্লাসিক কাব্যেও রোমান্টিক গীতিমূর্ছনা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, মিলটনই তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং মধুসূদনের কাব্যের একনায়কত্বের বিশ্বাস ভিত্তিহীন।

এই প্রশ্নের বা সমস্যার মীমাংসা ঠিক বিশ্লেষণ বা আলোচনার দ্বারা সম্ভব নহে। কাব্যবিশ্লেষণের আলোকে ইন্দ্রজিৎ যে এই কাব্যের নায়ক পদের একমাত্র প্রার্থী তাহাতে প্রথম হইতেই কোনো সন্দেহ থাকে না। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য মহাকাব্যের মূল ঘটনা তাহার নায়ক চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই সংঘটিত হইবে। মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনা যাহা এই নামকরণের মধ্যেই প্রকাশিত, তাহা স্বভাবতই ইহার নায়ক মেঘনাদকে ঘিরিয়াই। মেঘনাদই এই কাব্যের নায়ক, মেঘনাদের মৃত্যুকে লইয়াই মেঘনাদবধ কাব্য। হেক্টরকে ইলিয়ডের নায়ক বলা যায় না, বরং একিলিস সে গৌরব পাইতে পারেন। হোমারের কাছে ইলিয়ডের প্রধান ঘটনা ছিল একিলিসের ক্রোধ। কিন্তু মধুসূদনের কাছে হেক্টরের বীরত্বই এ কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাই ইলিয়ডের অনুবাদের নাম তিনি দিয়াছিলেন হেক্টর বধ। নামকরণের মধ্যে নায়ক চরিত্রের অস্তিত্ব সর্বত্রই কবি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অডিসির নায়ক অডিসিউস, এনেইডের নায়ক এনিয়াস, অরিয়েস্টোর ওরল্যাণ্ডো ফিউরিয়োসোর নায়ক ওরল্যাণ্ডো একই জাতীয় উদাহরণ সন্দেহ নাই। নায়ক চরিত্রের যে জাতীয় গুণাবলীর উল্লেখ যুগপৎ এরিস্টটল বা বিশ্বনাথের সাহিত্য-মীমাংসায় উল্লিখিত হইয়াছে, মধুসূদন সেইগুলিও অনুসরণ করিয়াছেন। এরিস্টটল ট্রাজেডির নায়ক ও মহাকাব্যের নায়কের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য সীমারেখা টানেন নাই, কিন্তু টরকুইটো টাস্‌সো মহাকাব্যের নায়ক সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, মহাকাব্যের নায়ককে সৎ ও নির্দোষ চরিত্র হইতে হইবে। রাবণ এরিস্টটলের শর্তানুযায়ী নায়কোচিত লক্ষণে ভূষিত, কিন্তু মেঘনাদ

টাস্‌সোর বিচারে কবিকল্পিত নায়ক। বীররসের কাব্যে বীর্যই আমরা প্রত্যাশা করি, তাই তাহার নায়ককে বীর হইতে হইবে। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের পরাক্রম ও বীর্য একটি স্মৃতিমাত্র—অনুতাপ ও বিলাপই আগাগোড়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। একমাত্র পুত্রশোকাতুর স্নেহান্ধ পিতার ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসার মুহূর্ত ব্যতীত তাঁহার বীরত্বের প্রদর্শনী ঘটে নাই। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ যে যথার্থ বীর এই কাব্যে তাহা কৃত্রিম রসোদ্‌গার মাত্র নহে, তাহা প্রমাণের সীমান্ত স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্যে সমগ্র লঙ্কাপুরী নিশীথের নৈশ কোলাহলে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, পরদিবস অসীম গৌরবপূর্ণ নিশ্চিত একটি বিজয়াভিয়ানের প্রত্যাশায় দেশের নাগরিকবৃন্দ শয়নগৃহের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে নাই। রাবণের পাপে পৃথিবীর মজ্জমানতা অথবা বাসুকির দুর্বহতা দেবতাদিগকে শঙ্কিত করিয়াছে, তাই তাহারা রাবণকে বধ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন—কিন্তু ইন্দ্রজিৎ তো কোনো পাপ করেন নাই, তবে ইন্দ্রজিৎ নিধনের জন্য দৈবরাজধানীতে এত ষড়যন্ত্র কেন? কারণ তিনি ইন্দ্রজিৎ—দেবরাজ এখনও তাঁহার ভয়ে কম্পমান হন। ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ যজ্ঞ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে তাঁহার আক্রমণ হইতে দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্র বা লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা ত্রিলোকে আর কাহারও নাই, তাহা স্বয়ং মহাদেবেরও জানা ছিল। মায়াদেবী ইন্দ্রকে দ্বিতীয় সর্গে বলিয়াছেন, ন্যায়-যুদ্ধে তাঁহাকে বধ করা দেবতা মানব কাহারও সাধ্য নহে। ইহাই তাঁহার বীরত্ব—এই বীরত্বের জন্য তিনি সামান্য যজ্ঞপাত্র নিক্ষেপ করিয়াই লক্ষ্মণকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলেন। এই কাব্যে একমাত্র বীর তাই ইন্দ্রজিৎ, তাই তিনি মহাকাব্যের নায়ক, যেমন নায়ক একিলিস এনেস রোলাণ্ড অথবা আর্টিগল। এই নায়কের উপযুক্ত নায়িকা সৃষ্টির জন্যই প্রমীলা চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে রামচন্দ্রকে বিভীষণ বলিয়াছেন, দম্ভোলী-নিক্ষেপী স্বয়ং ইন্দ্রকে যিনি সংগ্রামে বিমুখ করেন সেই মহাশক্তিধর মেঘনাদকে পদতলে রাখিবার জন্যই প্রমীলারূপী দানবীর জন্ম, জগতের রক্ষা হেতু বিধাতাই এহেন নিগড় গঠন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ এ কাব্যের নায়ক বলিয়াই মেঘনাদবধ কাব্যে তাঁহার প্রমোদলীলা ও পত্নীপ্রেম, অভিমান ও ক্ষোভ, ক্রোধ, সাধনা ও আত্মবিসর্জন পঞ্চাঙ্ক নাটকের মত স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়াছে। তাই তাঁহার মৃত্যু বিপক্ষদলে যোগদানকারী ধর্মনিষ্ঠ স্বধর্মত্যাগী বিভীষণকে পর্যন্ত মুহূর্তের

জন্য দুর্বল ও শোকাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার কর্তব্যবোধ, পারিবারিক দায়িত্ব, বংশমর্যাদা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, ইষ্টদেবতায় অগাধ বিশ্বাস, স্বদেশচেতনা, গুরুজনপদে বিনয় ও সম্ভ্রম—মধুসূদন তাঁহার চরিত্র-মহিমাকে দীপ্তোজ্জ্বল করিবার কোনোই ত্রুটি রাখেন নাই। এই ইন্দ্রজিতের নিধনের জন্য ষষ্ঠ সর্গের প্রায় সাড়ে সাতশত যন্ত্রণার্ত পংক্তি রচনা করিতে কবি মধুসূদনেরও অশ্রুবর্ষণ কম হয় নাই। এমন ব্যক্তি এ কাব্যের নায়ক হইবেন না তো কে হইবেন? আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু তো তাঁহাকে আরও স্বমহিম্নি করিয়া তুলিবার জন্যই—স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় রথ তাঁহাকে ইহলোকের ঊর্ধ্বে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর প্রতি সমবেদনায় রামচন্দ্র এক সপ্তাহ যুদ্ধ কোলাহল ক্ষান্ত রাখিয়াছেন, মহাসমুদ্র তাঁহার লবণাম্বুশীকর দ্বারা এই মহাবীরের চিতায় শান্তিবারি নিক্ষেপ করিয়াছেন। সপ্তদিবানিশি সৌধকিরীটিনী লঙ্কা তাহার পঙ্কজরবির অস্তগমনে মহাশোক পালন করিয়াছে। বোধন ও বিসর্জন যে প্রতিমার, পূজা তো তাঁহারই—শূন্য দেবমণ্ডপে মূর্ছাতুর হাহাকার কি পূজারীকে দেবস্থানে বসাইতে পারে? ট্রাজেডির সহিত মহাকাব্যের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও একটি ব্যাপারে অবশ্যই দুস্তর ব্যবধান। ট্রাজেডি মানবমনে ভয় ও অনুকম্পা জাগায়, মহাকাব্য জাগায় বিশালতা ও বিস্ময়। তাই doing ও suffering ট্রাজেডি নায়কের ক্ষেত্রে সত্য হইলেও মহাকাব্যের নায়কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না, অথচ সেই কার্যকারণ ও যন্ত্রণাবিদ্ধ পরিণামের সূত্র ধরিয়া মেঘনাদ অপেক্ষা রাবণ চরিত্রকে নায়কোচিত প্রাধান্য দান করিতে বসিয়া কবিসমালোচক মোহিতলাল এই ভুল করিয়াছেন।

কোনো কোনো সমালোচক এই দুই বিপরীত মতবাদের ক্ষেত্রোপযুক্ত সমীকরণের জন্য মেঘনাদবধ কাব্যের যৌথ-নায়কত্বের প্রস্তাব করিয়াছেন। মেঘনাদ অপেক্ষা এই কাব্যে যে রাবণের প্রাধান্য ঘটিয়াছে তাহা মানিয়া লইলে এই ধরণের যৌথ-নায়কের পরিকল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কবির নিজস্ব উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। ইহা সত্য পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কোনো কোনো সাহিত্যিক মহাকাব্যে একজাতীয় যৌথ-নায়কের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। সেখানে কাহিনীর মুখ্য চরিত্রই কাব্যের নায়ক, নায়কোচিত সকল প্রথানির্দিষ্ট লক্ষণই তাঁহার প্রাপ্য, তথাপি পাঠকের

সজ্ঞান অভিপ্রায়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য আর একজন সেই নায়কের নামে সমর্পিত নৈবেদ্য আপন চরণে গ্রহণ করিতেছেন। ইহা কবির নির্জ্ঞান মনেও ফল নহে—কবিই যেন স্বয়ং এই জাতীয় লীলার প্রবর্তয়িতা। এসকল ক্ষেত্রে নায়ক যেন সেই অদৃষ্ট বা অদৃশ্য রাজপুরুষের স্বাক্ষরিত মুদ্রা—মুদ্রার মধ্য দিয়াই প্রজাসাধারণ এক নিয়মতান্ত্রিক সুশৃঙ্খল বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতার সর্বাত্মক অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে, কিন্তু তিনি কোনো ক্রমেই তাঁহার শারীরিক মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া আপন বিশাল আত্মমর্যাদা খর্ব করেন না। ভার্জিলের এনেইড মহাকাব্যের বিষয় ট্রয়ধ্বংসের পর এনিয়াসের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবং দিদোর প্রেমে সেই সংকল্পে প্রতিবন্ধকতা, তারপর লাতিয়ুম রাজ্যে অবতরণ করিয়া বাহুবলের দ্বারা রাজকন্যা লেভিনিয়াকে অর্জন করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এনিয়াসের নামে ভার্জিল রোম সম্রাট অগস্টাসেরই প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন—অগস্টাসই তাঁহার কাব্যের নেপথ্য নায়ক। টাস্‌সো তাঁহার জেরুজালেম উদ্ধার কাব্যে অখ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের কবল হইতে খ্রীস্ট-বিশ্বাসীদের সংগ্রামে জেরুজালেম মুক্ত করিবার যে বীর্যগাথা গাহিয়াছেন তাহা কি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের মাহাত্ম্য নহে? তাই টাস্‌সোর পৃষ্ঠপোষক ফেরারা-র দ্বিতীয় আলফেন্সোই তাঁহার নায়ক। অথচ কাব্যে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন গফ্রেদো, আলফেন্সোর কোনো পূর্বপুরুষ। কালিদাস রঘুবংশম্-এর মহতী কীর্তি প্রচার-প্রসঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই প্রশস্তি করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কেবল রামচন্দ্রের নহে, তৎসহ কবির পৃষ্ঠপোষক রামপালদেবেরও প্রশস্তিগীতি। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের স্তাবকতা করিবার জন্যই অন্নপূর্ণাকে গঙ্গাপার করাইয়া ভবানন্দের গৃহে অধিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে এইরূপ কোন গোপন অদৃশ্য নায়ক নাই, সুতরাং অনুরূপ যৌথ-নায়কত্বের তত্ত্ব আবিষ্কার এক্ষেত্রে অবান্তর। এ কাব্যের সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত আমরা রাবণকেই প্রত্যক্ষ করি, তাঁহার ঐশ্বর্য তাঁহার মনুষ্যত্ব তাঁহার পুরুষকার তাঁহার হাহাকারই আমাদের চিত্ত বিস্তৃত করিয়া থাকে। মহাকাব্যের নায়কের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তাহা যেমন ইন্দ্রজিতে আছে তেমনি রাবণের মধ্যেও আছে। সীতাহরণের জন্য তাঁহার যে অপরাধ সে অপরাধের বিষয়ে তিনি সচেতন নহেন।

সুতরাং তাঁহার নায়ক হইবার পক্ষেও বাধা থাকিবার কথা নহে, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পরের পরিপূরক তাহাও অস্বীকার করা যায় না—তথাপি রাবণকে নায়ক বলিতে আপত্তি কোথায়! এ আপত্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—তাহা ঐ অনুতাপ ও হাহাকার—ঐ নিয়তি-নির্ধাতিত ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানবাত্মার রোরুদ্যমান করাঘাত। এইখানেই রাবণ নায়কের উপযুক্ত মর্যাদা পান নাই—বৃদ্ধ প্রিয়ামকে যেমন ইলিয়াডের নায়করূপে কল্পনা করা যায় না। ইহা ব্যতীত রাবণ সম্পর্কে কবির মনঃস্থিরতার অভাবের কথাও ইতিপূর্বে বলিয়াছি—সেই দ্বিধাগ্রস্ততার জন্যই রাবণ এই কাব্যে কবির সহানুভূতি ও করুণা, গভীর আকর্ষণ ও অনুকম্পার মধ্যে দোলায়িত হইয়াছেন। কিন্তু মেঘনাদ সম্পর্কে কবির চিন্তাকেন্দ্র বিন্দুমাত্র স্খলিত হয় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের সর্গনামগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাইবে, নায়কের গৌরব নিঃসপত্নভাবে ইন্দ্রজিতেরই—সর্গের নামকরণে তাঁহারই মেঘরন্ধ্রচ্যুত জলদর্চিরেখা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রথম সর্গের ‘অভিষেক’ তাঁহারই সৈনাপত্য-গ্রহণের উৎসবায়োজন এবং সেই চরম অন্তিম পরিণামের পূর্বে প্রদীপশিখার শেষ উজ্জ্বলতার আরতি মাত্র। দ্বিতীয় সর্গের নাম ও বিষয় ‘অস্ত্রলাভ’—দেবলোকের তৎপরতায় লক্ষ্মণের দৈবাস্ত্রলাভ। কিন্তু এত আয়োজন, বিনিদ্র রাত্রির এত কর্মব্যস্ততা সবই ঐ মেঘনাদকে প্রভাতে যজ্ঞারম্ভের পূর্বে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্যই। তৃতীয় সর্গ ‘সমাগম’ প্রমীলার স্বামীর সহিত মিলন—বীর্যের সহিত প্রেমের সমাগম। সেই মিলনের শর্বরী প্রভাত হইলেই চিতাশয্যায় তাহাদের নিবিড়তম মিলন ঘটিবে, তাহারই অশ্রুত রাগিণী পাঠকের কানে এই সর্গে নিষ্ঠুর কণ্ঠে কে যেন গাহিয়া যায়। চতুর্থ সর্গ ‘অশোকবন’, অশোকবনে বন্দিনী সীতার অশ্রুবাষ্পাতুর মূর্তি—প্রথমে মনে হয় ইহার সহিত মেঘনাদের কী সম্পর্ক! কিন্তু ইহা তো প্রদীপের তলবর্তী অন্ধকার! ইন্দ্রজিতের অভিষেক ও সেনাধ্যক্ষ-পদগ্রহণে সমগ্র লঙ্কা যখন আলোকমালায় দীপাবলীতে উন্মত্ত, তখন তাহারই প্রান্তে এই সকল ঘটনার হেতু যে সীতা—তিনিই অন্ধকারে অবরুদ্ধা হইয়া আছেন। অন্ধকার যেখানে কর্মফলে ঘনীভূত হইয়া আসে, সেনাপতি-বরণের দীপসজ্জায় কি তাহাকে অপনোদিত করা যায়? তাই উৎসবপ্রমত্ত লঙ্কাপুরীর বৈপরীত্যেই এই সর্গের পরিকল্পনা। ইন্দ্রজিতের অভিষেকে আরব্ধ যে উৎসব তাহার পরিণাম মৃত্যুর স্তব্ধতা ; আর এখানে অশোকবনে যে স্তব্ধতা তাহার পরিণাম

মুক্তির আনন্দ। ইহাই ইন্দ্রজিতের সহিত অশোকবনের নিয়তিগ্রথিত সম্পর্ক। 'উদ্যোগ' নামক পঞ্চম সর্গ ইন্দ্রজিৎবধের উদ্যোগ—রাত্রি অবসানের উদ্যোগ। ষষ্ঠ সর্গ 'বধ'—কাব্যের কেন্দ্র ঘটনা, নায়কের মৃত্যু-ঘটনা। সপ্তম সর্গে অবশ্য রাবণের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাও তো ঐ ইন্দ্রজিতের জন্যই—এই মৃত্যুর মহান্ কারুণ্য প্রমাণ করিবার জন্যই অনমনীয় প্রতিহিংসার এই তীব্রতা! অষ্টম সর্গ 'প্রেতপুরী'কেই কেবল ইন্দ্রজিৎ-প্রধান কাহিনীর পক্ষে ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, নতুবা নবম সর্গে ইন্দ্রজিতের 'সংক্রিয়া' অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টির দ্বারা কাব্যসমাপ্তি করিয়া কবি ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদের জীবনবৃত্তকে সম্পূর্ণই করিয়াছেন। এই সম্পূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাব্যে রাবণকে দেখা যায় না। ইন্দ্রজিৎ যেন পর্বতকে বেষ্টন করিয়া পর্বতশিখরে উঠিবার একখানি পথ, আর রাবণ সেই পর্বতের শীর্ষচূড়া। লতাগুল্মে জঙ্গলে মুক্ত আকাশের নীচ দিয়া সেই পথ চলিতে চলিতে পর্বতশিখর কখনও যাত্রীর পক্ষে দৃশ্যমান হইয়াছে, কখনও পার্শ্ববর্তী বিরাট খাদ মুখব্যাদান করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পদতল হইতে পথটি কখনও সরিয়া যায় নাই বলিয়াই পর্বত-পরিক্রমা সম্ভব হইয়াছে। এই পথটাই অভিযানের নায়ক।

মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার

মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় খ্যাতি ও অভ্যর্থনায় ইহা বঙ্গীয় পাঠকের নিকট যেমন অনন্যসাধারণ লাভ করিয়াছিল, তেমনি ইহার অনেকগুলি প্রসঙ্গ ও বিষয় এক দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কেরও সূচনা করিল। মেঘনাদবধ কাব্যের রসপরিচয় ইহার অন্যতম। এই সম্পর্কে কবিচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"যে বিষাদময় সংগীত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে আরব্ধ হইয়াছিল নবম সর্গে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। অনেকে মেঘনাদবধ কাব্যকে বীররসপ্রধান কাব্য বলিয়াই অবগত আছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনাদবধে বীররস অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য। বর্ণনীয় বিষয় পাঠান্তে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, তদনুসারে যদি গ্রন্থের রস-নির্ণয় করিতে হয়, তবে মেঘনাদ-বধকে করুণরসপ্রধান কাব্য বলিয়া নির্দেশ করাই সংগত।…অধিকাংশ পাঠকই মধুসূদনকে বীররস-বর্ণনায় নিপুণ কবি বলিয়া অবগত আছেন, কিন্তু অশোকবনস্থিতা মূর্তিমতী বিরহ-ব্যথারূপিণী জানকীর এবং শ্মশানশয্যায়

স্বামীর পদপ্রান্তে উপবিষ্টা, নববিধবা প্রমীলার অনুপম চিত্র দর্শন করিয়া কে বলিবেন যে, মধুসূদন কেবল বীররসের কবি? মধুসূদনের নিজের জীবনের ন্যায় তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যও করুণ-রসাত্মক।"

যোগীন্দ্রনাথ বসু একাধিকবার তাঁহার এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, হয়ত কবির সচেতন কোনো ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিয়াই কাব্যখানি অশ্রুর মালা হইয়া উঠিয়াছে। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "কবি অশ্রুজলের সঙ্গে তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, অশ্রুজলের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষসরাজের আর্তনাদের সঙ্গে গ্রন্থের আরম্ভ এবং সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণের সঙ্গে ইহার শেষ। ইহার আদি মধ্য এবং অন্ত, সমস্তই বিষাদপূর্ণ, সেইজন্য আমরা বলিয়াছি যে, মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে।" মধুসূদন গ্রন্থের লেখক শশাঙ্কমোহন সেন মন্তব্য করিয়াছেন, "সাহিত্যে এমন কাব্য আর আছে কিনা জানি না—যাহার কান্নাতেই আরম্ভ, কান্নাতেই পরিণতি, কান্নাতেই সমাপ্তি।" এইরূপ বিভিন্ন সমালোচকের মতামত বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে রসের ব্যাপারে সকলে কখনই একমত হন নাই—বীররস ও করুণরসের আপেক্ষিক প্রাধান্য বিষয়েও যেন সমালোচকদের বিশ্বাস দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের রস-সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা মোটামুটি চার প্রকার অভিমতের সহিত পরিচিত হই। প্রথম, এই কাব্যে মধুসূদন তাঁহার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করিয়া বীররসের পরিবর্তে করুণ রসের প্রাবল্য ঘটাইয়াছেন। দ্বিতীয়ত, কবি যে 'হিরোইক পোয়েম' লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বৃথা হয় নাই। এই কাব্য বীররসেরই কাব্য, ইহার আগাগোড়া বীররসের উন্মাদনা। হেমচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় দ্বিতীয় সংস্করণে লিখিয়াছিলেন, মধুসূদনের যে কুহকিনী কল্পনা-শক্তিরূপিণী দেবী, তিনি "মহাতেজস্বিনী—সর্বদাই বীরভাবান্বিতা, সর্বদাই বীররসাশ্রিত বাক্যপ্রিয়া।" রামগতি ন্যায়রত্নও এই মত ব্যক্ত করেন যে "এই কাব্য বীররসাশ্রিত।" তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে তিনি ব্যাখ্যা করিয়া লেখেন যে, "বাঙ্গালায় বীররসাশ্রিত কাব্যের উচিতরূপ সদ্ভাববিরহ এই এক মেঘনাদ দ্বারা অনেক অংশ পুরিত হইয়াছে।" অন্যত্র তিনি বলেন যে, মধুসূদন "এই কাব্যের আত্মস্বরূপ রসটিকে যেরূপ বীরপুরুষ করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছদস্বরূপ রচনাটিকেও সেইরূপ ওজস্বিনী

করিয়া দিয়াছেন।" রস সম্পর্কে তৃতীয় মত, মেঘনাদবধ কাব্যে বীররস করুণ রসের দ্বারা সম্মোহিত হইয়াছে—তাই কাব্যের আগাগোড়া বীরত্ব ও কারুণ্য, শক্তি ও শোকের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এজন্য তাঁহার অঙ্গীকার-পালনের অক্ষমতার ইঙ্গিত করা হয় নাই, কেবল কাব্যের যুগ্মরস-সংস্কার সম্পর্কেই এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন, "করুণ- ও শোকরস বর্ণনা শক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ, এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্চিকার দ্বারা সহানুভূতির অশ্রুদ্বার উন্মুক্ত করা যায়, প্রকৃতি দেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন।" সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মন্তব্য, "মাইকেল শুধু বীররসের কবি নহেন, তিনি করুণরসেও সিদ্ধহস্ত।" চতুর্থ মত মেঘনাদবধ কাব্যে একটি রসের প্রাধান্য বিষয়ে নহে, ইহার একাধিক রসের সমন্বয় বিষয়ে। অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, এই কাব্যে একাধিক রস আছে এবং সেই সকল রসবৈচিত্র্যই মহাকাব্যের পক্ষে উপযুক্ত। হেমচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্য ভূমিকার চতুর্থ সংস্করণে লিখিয়াছিলেন যে, "যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কী?" রামগতি ন্যায়রত্নের মত সমালোচকও একস্থলে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "সেতুদ্বারা বদ্ধ মহাসমুদ্র দর্শনে রাবণের উক্তি, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাবণ সমীপে খেদ, ইন্দ্রজিতের রণসজ্জা, পতিদর্শনার্থ মেঘনাদপ্রিয়া প্রমীলার বহির্গমন, অশোকবনে সরমার নিকট সীতার পূর্ব পরিচয় দান, শ্রীরামের যমপুরীদর্শন প্রভৃতি বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনোমধ্যে দুঃখ শোক উৎসাহ বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের কিরূপ আবির্ভাব হয় তাহা বর্ণনীয় নহে।" এই জাতীয় মন্তব্যের ভিতর দিয়া অবশ্য সাধারণ কাব্যপাঠকের মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, মহাকাব্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা কিংবা মহাকাব্যিক রসপ্রকরণের প্রতি কোনরূপ আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় এই জাতীয় অভিমতে নাই। সুতরাং মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার আলোচনায় এই চতুর্থ মতের প্রতি গুরুত্ব দিবার আপাতত প্রয়োজন নাই। মধুসূদন তাঁহার কাব্যে বীররসের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা যে শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই তাহাতে কোনো

সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রথম অভিমতটি সম্পর্কে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা নাই। এই কাব্য বীররসের আগ্রহে, 'হিরোইক পোয়েমে'র আদর্শে রচিত হইয়াছিল —কিন্তু বিষয়ের অনিবার্য আকর্ষণে কবি শেষ পর্যন্ত করুণরসের সমুদ্রমোহনায় উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সে বিষয়েও পূর্ববর্তী রসজ্ঞ সমালোচকগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আপত্তির কারণ দেখি না। অথচ মহাকাব্যের প্রচলিত আঙ্গিকে কবির নিষ্ঠা থাকায়, এই জাতীয় মহাকাব্যে যতখানি বীররস থাকা দরকার তাহা কবি সজ্ঞানে দিতে পারিয়াছেন—সুতরাং দ্বিতীয় মতের সত্যতাও অস্বীকার্য নহে। তৃতীয় মতবাদীরা কেবল কাব্যের বহিরঙ্গকেই বিচার করিয়াছেন—এই কাব্যে বীররস ও করুণরসের যুগপৎ অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কবিচিত্তের নিগূঢ় ইচ্ছাশক্তির লক্ষ্যভ্রষ্টতার কোনো হেতু সন্ধান করেন নাই। ইহা একপ্রকার প্রাচীন কাব্যবিচার পদ্ধতি এবং আধুনিক মধুসূদন কাব্য-সমালোচনায় এই জাতীয় অভিমতের কোনো গুরুত্ব নাই।

মেঘনাদবধ কাব্যে রসের প্রসঙ্গটিকে সংস্কৃত মহাকাব্যিক সূত্র-প্রয়োগের মানদণ্ডে বিচার না করিয়া কবির ব্যক্তিহৃদয়ের প্রবণতার আদর্শে বিচার করিলে তবেই ইহার প্রতি যথার্থ সুবিচার করা যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। মেঘনাদবধ কাব্যে বীররস যে করুণরসের দ্বারা সম্মোহিত হইয়াছে, রসবাদী সমালোচকের এই ত্রুটিনির্দেশ কাব্যের অঙ্গসংস্থানের অবিচ্ছিন্নতারূপে দাবী করিতে পারে না। বস্তুত এই ত্রুটি কাব্যগত নহে, প্রতিভার দ্বৈতচারিতাই ইহার প্রধান কারণ। কাব্যের প্রথম সর্গে বীররসাত্মক পন্থানুসরণের অঙ্গীকার যে শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবে কারুণ্যে পর্যবসিত হইয়াছে তাহা কাব্যের প্রাণচরিত্র রাবণের জন্যই—কবি তাঁহার এই অনুরাগ-রঞ্জিত চরিত্রটি সম্পর্কে মনঃস্থির করিতে পারেন নাই। কেবল রাবণ চরিত্র কেন, মধুসূদনের সমগ্র কাব্যখানি একটি অব্যবস্থিত-চিত্ততার উদাহরণস্থল। ইহার ফলে আঙ্গিকের গঠন-সৌষম্যে বাণীবিন্যাসে সর্গ-গ্রন্থনে কায়গঠনে কোনো ত্রুটি না ঘটিলেও সমগ্র কাব্যটি একটি গভীর উদ্দেশ্য-ভ্রষ্টতায় রক্তাক্ত হইয়া আছে। কবির এই দ্বিধাগ্রস্ততার মূল নিহিত আছে কবির স্বকাল ও সমাজে, যুগের অন্তর্নিহিত স্বভাবে। ইংরাজি-শিক্ষিত, নবযুগের বলিষ্ঠ আদর্শে অনুপ্রাণিত, নবজাগৃতির প্রাণরসে পুষ্ট বাঙালী যে মহাজীবনের বন্দনা করিয়াছে, ধনবাদী সভ্যতার ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন দেশে যে জীবন সম্ভব ছিল না।

তাই শেষ পর্যন্ত তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইয়াছে অতীতে, ইতিহাসের প্রাচীন ধূসরতায়, রোমান্সের কল্পলোকে, পুরাণের বর্ণচ্ছটায়। কিন্তু তাহার পরিণামও শেষ পর্যন্ত হইয়াছে আশাভঙ্গের ব্যর্থতা—তাই উনিশ শতকের সাহিত্য সবই বিষাদান্ত বা বিয়োগান্ত ট্রাজেডি বা ব্যর্থতার বিলাপ।[১] সমাজের এই অন্তর্বিরোধ অবশ্যই মধুসূদনের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং যুগচরিত্রের এই দ্বৈতপরায়ণতার জন্যই তাঁহার কাব্য উদ্দেশ্য ও উপলক্ষে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ইহার পরোক্ষ ফলশ্রুতি কবির চরিত্রকল্পনায় ও রসের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক অনুভূত হইবে। রাবণ চরিত্রে একদিকে পুরুষের শৌর্য বীরত্ব আদর্শ মনুষ্যগুণের বিকাশ যেমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অন্যদিকে কবি তাঁহার সীতাহরণজনিত পাপের জন্য তাঁহাকে বিধিতাড়িত করিয়াছেন। এমন কি প্রমীলা চরিত্রেও দুই বিপরীত ধর্মের বিকাশ ঘটিয়াছে—একদিকে তিনি বীরাঙ্গনা, অন্যদিকে লজ্জাশীলা কুলবধূ। তাঁহার সব কয়টি চরিত্রেই বীরত্বের সহিত বেদনাপরায়ণতা, বীর্যের সহিত স্নেহশীলতা জড়িত। রামচন্দ্র রামায়ণের মহাপুরুষ চরিত্র হইলেও অত্যধিক ভ্রাতৃবাৎসল্যের জন্য তিনি দুর্বল বলিয়া প্রতীয়মান হন, সত্যনিষ্ঠ ধর্মপথগামী হইয়াও বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুর জন্য কাঁদিয়া ওঠেন। আর ঠিক এই কারণেই কবির কাব্য বীররসাত্মক হইয়াও করুণরসের প্লাবনে ভাসিয়া যায়, সকল বীর্যস্ফুলিঙ্গ অশ্রুবারিবর্ষণে তেজস্বিতা হারায়, স্বজন হারানো ব্যথায় শত্রুবিমর্দনের কথা ডুবিয়া যায়।

বিশুদ্ধ কাব্যের দিক হইতে বিচার করিলেও বীররস ও করুণরসকে পরস্পরের বৈপরীত্যমূলক মনে না করিয়া মহাকাব্যের স্বাভাবিক গঠনবিন্যাসে

১ এই দ্বৈতচারিতার উদাহরণ উনিশ শতকের সাহিত্য ও জীবনে পদে পদে দৃষ্ট হয়। এই যুগের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মনীষীদের মধ্যে একদিকে প্রগতিশীলতা ও অন্যদিকে এক ধরণের রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বিস্মিত করে। যে ঈশ্বর গুপ্ত মানবজীবনের বন্দনা রচনা করিয়াছেন তিনিই আবার বিধবাবিবাহকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, নারীশিক্ষাকে উপহাসিত করিয়াছেন। রাধাকান্ত দেব নারী-প্রগতির অন্যতম সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তিনি সতীদাহ-নিবারণের পক্ষে ছিলেন না। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃমন্ত্রের বোধন করিয়া দেশকে শত্রু-বিতাড়িত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসের শেষে ইংরাজ-শাসনকেই বরণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে নীলদর্পণের উদ্দেশ্য ইংরাজ চরিত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা-উদ্দীপন, তাহাই নিবেদন করা হইয়াছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার চরণে!

পরিপূরক মনে করা যাইতে পারে। রসশাস্ত্রের আলোচনায় একটি স্থায়িভাবকে পুষ্ট করিয়া তোলে এক বা একাধিক ব্যভিচারী ভাব—যেমন উৎসাহ ক্রোধ বিস্ময় ইত্যাদি ভাব শোকের পরিপোষকতা করে। মেঘকজ্জলের প্রান্তবর্তী সূর্যলিখন মেঘের কালিমাকে যেমন আরও ঘনীভূত করিয়া তুলে, তমালতালীবনরাজিনীলার ধারানিবদ্ধ কলঙ্করেখা যেমন জলধির দুস্তরতা আরও প্রসারিত করিয়া থাকে, তেমনি যথার্থ বীরত্ব বীর্য উৎসাহ বেদনার সীমাকে দিগন্তবিতত করিয়া দেয়—ইহাই শাশ্বত মানবজীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। বীর্যের বসন্তচরণঘাতে শোকের অশোকতরু যেন মঞ্জরীতে উপচীয়মান হইয়া উঠে। মহাকাব্যে বীররস তো প্রান্তরের মধ্যে নিঃসঙ্গ বীরের অন্তঃসারশূন্য হুংকার মাত্র নহে, ইহা অপরের প্রাণসংহারের নৃশংসতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শরক্ষাই হউক বা দেশরক্ষাই হউক, অথবা অপহৃতা পত্নী বা ভূমিলক্ষ্মীর উদ্ধার সাধনের প্রশস্তবক্ষ প্রতিজ্ঞাই হউক, তাহা একপক্ষের নিশ্চিহ্নীকরণের দ্বারাই সম্ভব। একটি গৃহের স্নেহবন্ধন পদদলিত না করিলে, একটি পরিবারে সন্তানহারা জননী বা পতিহারা পত্নীর বিদীর্ণগগন বিলাপ জাগাইতে না পারিলে গরীয়ান বীর্যের ধমনী পরিতৃপ্ত হয় না—ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ। সেই মারণ-অঙ্গীকারে কবি তরবারি-সঞ্চালন-রত বীরের পক্ষ সমর্থন করিলেও নিহত ব্যক্তির পরিবারস্থ অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন দু একটি চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সমবেদনা থাকিবে না, এমন কঠিন অনুজ্ঞা কেহই দান করিবেন না। সমগ্র লঙ্কা যে শত্রু-সৈন্য-দলনের দৃঢ়ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বীররসাত্মক—কিন্তু অন্যদিকে লঙ্কার ঘরে ঘরে যে পুত্রহীনা মাতা ও পতিহীনা সতীর বিলাপধ্বনি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই লঙ্কার কুললক্ষ্মীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। দৈবশক্তির নিশ্চিত সহায়তা লইয়া লক্ষ্মণ মেঘনাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে যাত্রা করিবার পূর্বাহ্নে তাই অজ্ঞাত আশঙ্কায় রামচন্দ্রের স্নেহদুর্বল হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। "মহাকাব্যে এই কারণেই শোক বিয়োগ বেদনা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিতাড়িত করা যায় না। সকল মহাকাব্যেই শোকের ঝড় বহিয়া যায়। ইহার পরিসমাপ্তিতে 'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে' শোকস্তম্ভিত বীরবৃন্দ শিবিরে ফিরিয়া আসে। সুতরাং বীর ও করুণরসের অঙ্গাঙ্গী সমন্বয়েই মহাকাব্যের ভাবসংশ্লেষ গঠিত হয়। রণাঙ্গনের শবাকীর্ণ বীভৎসতার মধ্যে ব্যথাদীর্ণ অন্তরের শোকোচ্ছ্বাস স্মৃতিদীপহস্তে হারানো প্রিয়জনকে

খুঁজিয়া বেড়ায়"।[১] আধুনিক কালের মহাকাব্য যে অবিমিশ্রভাবে বীররসের হইতে পারে না, এ বোধ মধুসূদনের মত সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন কবির ছিল বলিয়াই তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, You must not judge of the work as a regular Heroic poem. I never meant it such. It is a story, a tale, rather heroically told. যদি কবির এই মন্তব্যে বিশ্বাস করি তবে বলিতে হয় 'বীররসে ভাসি মহাগীত' বলিতে তিনি এই 'বীর্যের সহিত কাহিনী বিবরণে'র কথাই বলিয়াছেন। নায়কের কৃপাণে শত্রুচ্ছিন্ন-শিরের মর্ত্যধূলিচুম্বনের করতালি-ধ্বনিত কাহিনী নহে, এক অপরাজেয় বীরের সদর্প মৃত্যুবরণের দৃপ্তকাহিনী। সে বীর অনেক কিছুই করিতে পারিতেন—ভাগ্য প্রতিকূল না থাকিলে লক্ষ্মণকে আপন রথচক্রে বাঁধিয়া লঙ্কা পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাকেই অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আততায়ীর নিকট নিরস্ত্র অসহায় মৃত্যুবরণ করিতে হইল! কিন্তু বীররস কি ইহাতে নিহত হইয়াছে? কারুণ্যের রক্তস্রোতে বীর্য এখানে আরও মহিমাময় হইয়া উঠিয়াছে—সে আর্তনাদ পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের গর্জন হইয়া উঠিয়াছে, সে পতন বসুধাকে কম্পিত করিয়াছে, সমুদ্রকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে, সমগ্র জীবজগৎকে আতঙ্কিত করিয়াছে। মৃত্যু যে কত heroically told হইতে পারে মেঘনাদের মৃত্যুই তাহার সিদ্ধান্ত।

করুণরসের প্রতি কবির প্রবণতা ছিল, কিন্তু বীররসের প্রতিস্পর্ধী করিয়া নহে, তাহাকে পুষ্ট করিয়াই। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর বীররস ও করুণরস নামক দুইটি সনেট তাহার প্রমাণ। এই দুই চতুর্দশপদীতে কবি যেন বীররস অপেক্ষা করুণরসের দিকেই আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন—উক্ত কবিতায় করুণরসের চিত্রকল্পটি যেন মধুসূদনের প্রিয়প্রসঙ্গ বন্দিনী সীতার চিত্রটি মনে পড়ায়—

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে মলিনমুখী শরদের শশী
রাহুর তরাসে যেন! বিরলেতে বসি,
মৃদু কাঁদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝরি
গলে অশ্রুবিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!

১ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'আধুনিক বাংলা কাব্যে'র ভূমিকা (তারাপদ মুখোপাধ্যায়)

এই পদের শেষে কবি দৈববাণী শুনিয়াছেন, কবিতারসের তীরবর্তী এই রোরুদ্যমানা করুণরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যাহার বশীভূতা সেই কবিই মর্তলোকে ধন্য। সুতরাং কারুণ্যের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই, বেদনায় পানপাত্র ভরিয়া তুলিবার গুণেই, কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করা যায়—ইহাই হয়ত তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল, রোমাণ্টিক বিশ্বাস ছিল।[১] সেই সঙ্গে হিরোইক পোয়েমের আত্মমর্যাদার সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল নিবিড়, গল্পকে কেমন করিয়া 'হিরোইক্যালি' বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। এই দুইয়ের মিশ্রণে কী ঘটিতে পারে? তিনি একটি pathetic tale বা storyকে heroically বলিবার চেষ্টা করিলেন—তাহাই মেঘনাদবধ কাব্য। ইহাই এই কাব্যের রস সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা। এ কাব্যে করুণরস বন্যাজলের মত কূল ছাপাইয়া কলকল্লোলে পল্লীর কাছে আসিয়া পড়ে নাই, ইহা ডুবাইয়া দিবার রস নহে। ইহা সমুদ্রের তরঙ্গের মত—বালুতটে ঝাঁপাইয়া পড়ে, আবার প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। ইহা ভাঙিয়া-পড়া করুণা নহে—বনস্পতি না হইলে বজ্রকে কে মাথায় গ্রহণ করিবে? ভূকম্পনে পর্বতশৃঙ্গ পতনকে কি পদাবলীর মাথুরের সঙ্গে তুলনা করা যায়?

তাই কাব্যের **প্রথম সর্গ** হইতেই আমরা এই বেদনার ঘনীভূত অন্ধকারে মসীলিপ্ত রাবণের মহীরূহ মূর্তিটি দেখিতে পাইতেছি। করুণরসের মুহুর্মুহু চকিতবিদ্যুৎস্ফুরণে তাঁহার ঘনশাখায়িত প্রসারিত রূপটি কাঁপিয়া উঠিতেছে। শোকের বৃষ্টিবারি তাহার পল্লব-চুম্বন করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, এক একটি ক্ষুদ্র বজ্রাঘাতে শাখা ভাঙিয়া পড়িতেছে, তথাপি সে তরু সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। 'সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু' অকালে যমপুরে গমন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে লঙ্কাধিপতির সিক্ত গণ্ডদেশে যত জলই গড়াইয়া পড়ুক, কেমন করিয়া 'সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী' নিহত হইল সেই কাহিনী শ্রবণের জন্য তাঁহার দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছে। ধূলিধূসরিত শোণিতার্দ্র-কলেবর ভগ্নদূত পর্যন্ত বীররস ও করুণরসের মিশ্র দৃষ্টান্ত—তাহার বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা নাই। প্রাসাদশীর্ষ হইতে রণক্ষেত্রে বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুর মহাপতন দৃশ্য দেখিয়া রাবণের বক্ষোদেশ

১ কবির পত্রাংশ স্মর্তব্য—He who is 'beautiful' 'tender' and the 'pathetic' with a dash of 'sublimity', is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him.

গৌরবে স্ফীত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রবাৎসল্যে অন্তর করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। শোকের ঝড় বহন করিয়া মৃতবৎসা চিত্রাঙ্গদা যখন রাজসভায় প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও রাবণ তাঁহার অপরিসীম বেদনা বক্ষে স্তম্ভিত রাখিয়া পুত্রের গৌরবগাথা স্মরণ করিয়াই জননীকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা সমস্ত সভার পরিবেশটিকে করুণরসের শীকরকণায় অভিসিঞ্চিত করিয়া দিয়াছিলেন, পরমুহূর্তেই তাহার উপর মেঘজালচ্যুত বীররসের স্ফুর্যকণা বিকিরিত হইল—শোকে অভিমানে কনকাসন ত্যাগ করিয়া রাঘবারি রক্ষোরাজ গর্জন করিয়া উঠিলেন। রাবণের স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার সংকল্প প্রচারিত হইলে সভাতলে দুন্দুভিমন্ত্র ধ্বনিত হইল, বীরমদে রাক্ষস-সৈন্যবাহিনী সজ্জিত হইতে লাগিল, সমগ্র লঙ্কায় যুদ্ধের ত্বরিতবেগ আয়োজন হইতে লাগিল। সমরসজ্জার এমন অপরূপ বর্ণনা, বীর্যের এমন অনিন্দিত মূর্তি রোদনপটু কবির পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। অথচ সর্বত্রই এই বীরত্ব, এই উদ্দীপনা, এই হুংকৃত আয়োজন একটি আসন্ন সর্বনাশের দিকেই অনিবার্যভাবে ধাবিত হইয়াছে, ইহাও পাঠক অনুভব করিতে পারে। প্রমোদোদ্যানে মেঘনাদ ক্রোধে অভিমানে কুসুমদাম ছিঁড়িয়া শত্রুনিধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। সেই মুহূর্তেই কোমলতার প্রতীক প্রমীলা তাহার চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে। অভিষিক্ত ইন্দ্রজিৎকে ঘিরিয়া উৎসবমত্ত লঙ্কার বন্দীগণ যে উদ্দীপনগীত ধরিয়াছে তাহার বীর্যমহিমা-উত্তেজনা-প্ররোচনার ভিতর দিয়া কিন্তু শোকাহত লঙ্কার চিত্রকল্পটিই মূর্তিমান হইয়া উঠে—

নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি
তোমার !

দ্বিতীয় সর্গের বিষয়বস্তু অস্ত্রলাভ—ইহার সহিত করুণরসের সম্পর্ক নাই, যদিও প্রত্যক্ষভাবে বীররসও এই সর্গের উদ্দিষ্ট নহে। কিন্তু দেবদৈত্য-নর-ত্রাস মেঘনাদকে নিশ্চিতভাবে বিনাশের জন্য ইন্দ্রের উদ্যোগ ও অস্ত্র-সংগ্রহের মধ্যে একটি বলিষ্ঠতা আছে। ইহা দেবসমাজের হীনতার চিত্র বলিয়া মনে হইলেও অপরাজেয় মহাবীরকে হত্যা করিবার ইহা অপেক্ষা আর কোন্ উপায় সম্ভব ছিল? ধর্মপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ সত্যব্রতী রামচন্দ্র ও

লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার জন্য, অসহায়া বন্দিনী অপহৃতা সীতার উদ্ধারের জন্যই ইন্দ্র ও অন্যান্য দেববৃন্দ এত তৎপর হইয়াছেন। তাঁহাদের সকল ষড়যন্ত্র ও গোপন পরামর্শ যতই দুর্বুদ্ধিপ্রণোদিত হউক, তাহা দেববিশেষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় হয় নাই, স্বয়ং ত্রিকালজ্ঞ পরমেশ্বর ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। তারকাসুর-নিধনের জন্য রুদ্রতেজে পূর্ণ যে মহাস্ত্রগুলি স্বয়ং দেবসেনাপতি ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্রগুলি রামচন্দ্রকে দান করিবার মধ্যে কুৎসিত হীনতা নাই—মহৎ বীরের মৃত্যুবাণ-সংগ্রহের কঠিন দুঃসাধ্য প্রয়াসই ইহার ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। রামায়ণে এ কাহিনী নাই, কারণ রামায়ণে মেঘনাদকে হত্যা করিবার জন্য দেবসমাজকে তো উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই—সেখানে রামলক্ষ্মণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মধুকবির ইন্দ্রজিৎ কবির মানসপুত্র—মহদ্‌বীর্যের শিলামূর্তি। তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ শিথিলভাবে প্রদত্ত হইতে পারে না। তাই অন্তরীক্ষে এত আয়োজন, এত উদ্বেগের নিঃশব্দ দুন্দুভি, এত অদৃষ্ট-অস্ত্রের শাণিত সমারোহ। ইহাই বীররস—rather heroically told, আশা করি ইহা স্বীকার করিতে কোনো কুণ্ঠা নাই। **তৃতীয় সর্গের** আগাগোড়াই এই বীর্যবৃত্তান্ত—নারীর স্বামী-সন্নিধানে যাত্রাকে কবি বীরাঙ্গনার অভিযানে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 'যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী' আধুনিক কবির এই উত্তরভাষণ যেন ধ্যানযোগে আত্মসাৎ করিয়া মধুসূদন তাহা তাঁহার পৌরাণিক কাব্য-নায়িকার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। এমন কি **চতুর্থ সর্গ**—যাহা ক্লাসিক-কাব্যের সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে একখানি গীতিকাব্যের দ্বীপ বলিয়া কথিত হয়, তাহাও ঐ heroically told-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই সর্গে শোককম্পিতা বন্দিনী সীতার স্বপ্নবৃত্তান্তের মধ্য দিয়া কবি লঙ্কারাজ্যের পতন ও রাবণের মৃত্যুর যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য সর্গের মত রাবণের দিক হইতে নহে, তাই ইহাতে কবির ব্যক্তিগত শোকবেদনার প্রলেপ পড়ে নাই। একটি সর্গেই আমরা রাবণবধ করিয়া সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের কঠোর সাধনা, দীর্ঘ অধ্যবসায়, বাহুবল ও জিগীষার পরিচয় পাইলাম।

করুণরস ও বীররসের এই একাকার মূর্তিটি পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গেও পাঠক দেখিতে পাইবেন। **পঞ্চম সর্গের** বিষয়বস্তু মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের পারস্পরিক সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইবার জন্য উভয় পক্ষের উদ্যোগ! উদ্যোগ অবশ্য রামানুজের দিক হইতেই প্রবল। সুরলোকে বিনিদ্র ইন্দ্রের উদ্বেগে

ইহার সূচনা। তাহার পর মায়াদেবীর অনুজ্ঞায় স্বপ্নদেবী লক্ষ্মণের নিদ্রাঘোরে সুমিত্রা জননীর রূপে আবির্ভূত হইয়া উত্তর-লঙ্কায় অবস্থিত চণ্ডীর দেউলে পূজা দিতে নির্দেশ দিলেন। লক্ষ্মণ বিঘ্নবিপদ অতিক্রম করিয়া অবসিত রাত্রির প্রথম প্রহরে দুর্গম চণ্ডীদেউলে দেবীর আরাধনা করিয়া আসিলেন এবং পার্বতীর আশীর্বাদ লাভ করিলেন। অন্যদিকে মেঘনাদও নিদ্রাশয্যা ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন প্রভাতে মাতৃবন্দনা করিয়া যজ্ঞাগারে গমন করিলেন। মেঘনাদের উদ্যোগের মধ্যে একটি নিশ্চিত বিশ্বাস, প্রসন্ন আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় সংকল্প আছে বলিয়াই তাহা আসন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের কাছে করুণ ও হতাশ হইয়া প্রতিভাত হয়। এমন আত্মবিশ্বাসী মাতৃভক্তের পতন কেন হইবে, এই দুর্বোধ্য ঘটনায় পাঠকও যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। **ষষ্ঠ সর্গ** সেই নিষ্ঠুরতম ব্যাপারের রঙ্গভূমি—ইহাতেই মধুসূদনের কাব্যজীবনের করুণতম ঘটনা ইন্দ্রজিৎনিধন সংঘটিত হইয়াছে। অথচ এই বেদনার শোকস্তম্ভিত বিবরণ দিতে গিয়া তাঁহার লেখনী ক্ষণিকের জন্যও কাঁপিয়া ওঠে নাই, তাঁহার বীরতম মানসপুত্র অকম্প্র বীর্যে, অকুতোভয় দুঃসাহসে, হীনশত্রু আততায়ীর শর প্রশস্ত বক্ষে ধারণ করিয়া, কাপুরুষতার প্রতি বর্বর শ্লেষবাক্য নিক্ষেপ করিয়া, মর্তভূমি কাঁপাইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। রক্তাপ্লুত এই মহান মৃত্যু দর্শন করিয়া স্বজনদ্রোহী বিভীষণ পর্যন্ত যখন স্নেহকাতরতায় আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে, তখনও মহাকাব্যের কবি মধুসূদন তাঁহার সর্গ সমাধা করেন নাই। কর্তব্য সমাপনান্তে লক্ষ্মণ বীরবিক্রমে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই শুভসংবাদ প্রদান করিয়াছেন, আকাশে দৈবপুষ্পবৃষ্টি হইয়াছে, বানর সৈন্যের বিজয়োল্লাসে আতঙ্কিত লঙ্কাপুরীর নিদ্রাভঙ্গ ঘটিয়াছে, সবই শুষ্কনেত্রে কবি যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—কর্তব্যপরায়ণ সাংবাদিকের মত তাহার প্রতিটি বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, যেন তাঁহার নিজের ব্যথাপ্রকাশের কোনোই অবকাশ নাই। তৎসত্ত্বেও কি আমরা অভিযোগ করিতে পারি, কবি বীররসের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন? একটি করুণ আখ্যানকে কতখানি বীর্যের সহিত ব্যক্ত করা যায়, এই ষষ্ঠ সর্গই কি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নহে?

সপ্তম সর্গ এক হিসাবে ষষ্ঠ সর্গ অপেক্ষাও করুণ, কারণ এই সর্গে কবি শোকমূর্ছাতুর হতভাগ্য পিতৃহৃদয়ের হৃতসর্বস্বতার সুগভীর বিলাপচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু এই বিলাপও পথপার্শ্বের হতাশ দৈন্যের নিশ্চেষ্ট ধ্বনি নহে—ইহা প্রতিশোধের সমুদ্রগর্জনে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাই এই সর্গের

অঙ্গিরস বীরই, করুণা ও শোকই তাহার সঞ্চারী ভাব। পুত্রহীন রাবণকে বেদনার বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব যেমন তাঁহার ভক্তকে এই সর্গে রুদ্রতেজে পূর্ণ করিয়াছেন, কবিও তেমনি যেন স্বয়ং আপনাকে এবং বেদনাবিহ্বল পাঠককে অপরিহার্য বিষাদ হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর নিষ্করুণ প্রতিজ্ঞাঘন ক্রোধে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। তাই মৃত্যুর তীব্রদংশনে মুমূর্ষু লঙ্কার প্রতি রেণু আবার শেষ দুন্দুভিতে কৃত্রিমভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, পতনের মহাসর্বনাশ যেন চরম মুহূর্তের পূর্বে অভ্রভেদী শিখর তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্ধকারে চিরনিমজ্জিত হইবার পূর্বে প্রদীপশিখা শেষবারের মত ধূম্রহীন ঔজ্জ্বল্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অনমনীয় প্রতিজ্ঞা ও আপোষহীন সংকল্পের লৌহকক্ষে সুরক্ষিত লখীন্দরের অপঘাত মৃত্যুর পর চাঁদ সদাগরের উন্মত্ত প্রলাপ ছিল যথার্থই করুণরসের উদাহরণ—তাঁহার অপ্রকৃতিস্থ আচরণ ও উদ্ভট স্বগতোক্তির মধ্যে নিষ্ফল সংগ্রামের হাহাকারই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। মর্মবিদারী শোক কোনো তীব্র প্রতিহিংসার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠে নাই। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে রাবণকে আমরা এই একবারের মত—প্রথম ও শেষবারের মত বহ্নিমান দেখি। বেদনার যে লেলিহান চিতা অন্তরের স্নেহদুর্বল পঞ্জরগুলিকে নিঃশব্দে গ্রাস করিয়াছে, তাহারই ভয়ংকর তেজ বাহিরে দুঃসহ অকল্পনীয় ক্রোধ ও প্রতিশোধরূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছে—নেত্রক্ষরিত শোকাশ্রুর প্লাবনও তাহাকে নির্বাপিত করিতে পারে নাই। সেই দুর্দমনীয় মহাতেজের সম্মুখে দৈবশক্তি পর্যন্ত বাষ্পীভূত হইয়া গেছে। একিলিসের ক্রোধ ছিল বীরত্বের আস্ফালন মাত্র—তাহার পশ্চাতে এইরূপ মৃত্যুর শেলবিদীর্ণ বক্ষের আর্তনাদ ছিল না। কিন্তু রাবণের ক্রোধের নেপথ্যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুকে স্থাপিত করিয়া মধুসূদন ক্রোধের যে বিশ্বকম্প্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কেবল তাহাই জগৎকবিসভায় মধুসূদনকে মহাকবির চিরন্তন জয়গৌরব দান করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই বীর্য-বলয়িত শোকের উদাহরণ পুনরায় **নবম সর্গেও** দেখিতে পাই—মহাবীরের মহাযাত্রার কী বিশাল গম্ভীর সমুন্নত চিত্র! অসীম গর্জমান নীলাম্বুজলধির পটভূমিকায়, অদ্বিতীয় মহানায়ক মেঘনাদের অন্তিমশয়ান চিতাদৃশ্যের সম্মুখে, কাতরচিত্ত রাবণের ভগ্নস্বর কণ্ঠের কম্পমান বিলাপ 'ছিল আশা মেঘনাদ মুদিব অন্তিমে' একটি আশ্চর্য বিস্ময়কর ভাবের সৃষ্টি করে। ইহা সাধারণ মানুষের ভূলুণ্ঠিত ক্রন্দন নহে, হতাশ আর্তনাদের উচ্চকণ্ঠ ধ্বনি নহে। ইহা বজ্রাহত

বনস্পতির শূন্যশাখ পত্রহীন কোটরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বায়ুর দীর্ঘশ্বসিত হাহাকার। যথার্থ বীরের মৃত্যুর বিলাপ ইহা অপেক্ষা আর কী করুণ হইতে পারে? এই সংযত শোকেরই দুর্মর শক্তিতে কৈলাসে শিবের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কম্পিত জটাজালে শান্তকল্লোল জাহ্নবী পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ত্রিনয়নের দীপ্তশিখা অনল স্ফুরণ করিতে লাগিল, কৈলাস পর্বত এবং তৎসহ সমগ্র জগৎ ক্রুদ্ধ পদভারে বেপথুমান হইল। এই রুদ্রক্রোধ প্রশমিত করিতে পার্বতীকে শিবের চরণ বেষ্টন করিয়া কাতর অনুনয় করিতে হইয়াছে। এই শিবক্রোধের চিত্রাঙ্কন করা কোনো পৌরাণিক তথ্যপ্রসূত বা বিদেশী মহাকাব্যের অনুরূপ দৃষ্টান্ত-সম্ভূত নহে, ইহা কাব্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনেই আসিয়াছে। মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবীত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াও, মৃত্যুকে মহান করিবার জন্য, নিহতকে তাহার শেষ প্রণামী দানের জন্য যে অপেক্ষিত বীররসের প্রয়োজন তাহা এই সর্গেই সম্ভব হইয়াছে। একমাত্র **অষ্টম সর্গে** কেবল বীররস বা করুণরসের বদলে কিছুটা অদ্ভুত ভয়ানক এবং বীভৎসের সমাবেশ ঘটিয়াছে মাত্র। অন্যথায়, কবি মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বত্র এক জাতীয় রস-ঐক্য রক্ষা করিয়াছেন। এই কাব্যে বীররস করুণরসের দ্বারা বিঘ্নিত হয় নাই, উজ্জ্বলতর হইয়াছে। করুণ-রস-বিধৌত হইয়া এই কাব্যে বীররসের পর্বতশিখরে আরও উজ্জ্বল আরও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে অদৃষ্টবাদ

মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক-চরিত্রের মত এই কাব্যের অদৃষ্টবাদের প্রসঙ্গটিও মধুসূদনের সমকালীন ও ঈষৎ পরবর্তীকালের সমালোচকদের নিকট বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ লাভ করে নাই। 'মধুসূদনের কাব্য পাঠ করিলে যে-কোনও পাঠকই বারবার দেখিতে পাইবেন, তাঁহার সকল চরিত্রই কোনো-না-কোনো দুঃখ-বিপদে এক দুর্জ্ঞেয় বিশ্ববিধাতার রহস্যময় বিধানের কথা স্মরণ করিয়া করাঘাত করিতেছে। ইহা কেবল মেঘনাদবধ কাব্যে নহে, তাঁহার যাবতীয় রচনাতেই দ্রষ্টব্য।'' প্রসিদ্ধ সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের ভাষায়—

"যেমন মেঘনাদবধে গ্রীক নিয়তিবাদ দেবযন্ত্র এবং অদৃষ্টবাদ দেখিতেছি, তেমন মধুকবির অসম্পূর্ণ কাব্যসমূহের মধ্যেও—সুভদ্রাহরণ ও সিংহল-

বিজয় প্রভৃতিতেও—উহাই দেখিতেছি। তিলোত্তমাসম্ভবের মধ্যেও ঐ অদৃষ্টবাদ।"

গ্রীক নিয়তিবাদ, দেবযন্ত্র ও গ্রীক অদৃষ্ট বলিতে কী বুঝায় যথাসময়ে তাহার আলোচনা করা যাইবে, কিন্তু মধুসূদনের প্রায় যাবতীয় রচনাই এইরূপ নিয়তি-চিহ্নিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নিয়তি এক প্রকার দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্টবাদ, দেবতা বা মানব, দৈত্য কিংবা রাক্ষস সকলেই কোনো-না-কোনোভাবে এই নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে দৃঢ়বদ্ধ। শর্মিষ্ঠা নাটকের তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠার মুখে শুনি—

"কিন্তু এ আবার বিধির কী বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি এতে তোর কি কোনো ফল লাভ হবে?"[১]

পদ্মাবতী নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মন্ত্রীর মুখে অনুরূপ উক্তি—"হে বিধাতঃ তোমার একি সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যে,—এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যে,—এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও দুষ্টরাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে?"

কৃষ্ণকুমারী নাটকে একাধিক চরিত্রের মুখেই বিধির এহেন বিচিত্র বিধানের উল্লেখ আছে।[২] আত্মবিসর্জিতা কৃষ্ণকুমারীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজমন্ত্রীর যে উক্তিতে নাটক সমাপ্ত হইয়াছে, সমগ্র নাটক তাহারই ভাষ্য মাত্র—"হে বিধাতঃ তোমার কী অদ্ভুত লীলা।"

মধুসূদনের শেষ নাটক মায়াকাননে এই বিধাতার দুর্জ্ঞেয় বিধানের প্রতি হাহাকার আরও চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে ভ্রাতার মৃতদেহের উপর রোরুদ্যমানা শশিকলার জন্য শোকার্ত সজলনয়না তপস্বিনী অরুন্ধতী বলিয়াছেন—

১ শর্মিষ্ঠা নাটকের চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শুক্রাচার্য বলিয়াছেন, "অপত্য স্নেহের কী অদ্ভুত শক্তি!—আবার তাও বলি বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে?"

২ কৃষ্ণকুমারী নাটকের পঞ্চমাঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজা ভীমসিংহ বলেন্দ্রসিংহকে বলিতেছেন—"বুঝেই দেখ না, যদি কোনও ব্যক্তি বিধাতা আমার কপালে কী লিখেছেন দেখি বলে কোন উচ্চ পর্বত থেকে লাফ দেয়, কিম্বা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে তাহলে বিধাতা কি তার কপালে কি লিখেছেন তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়?" পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সন্ন্যাসীর মুখে পর্যন্ত শুনা যায়—"বিধাতার যা নির্বন্ধ তা অবশ্যই ঘটবে।"

"বিধাতার সৃষ্টিতে কি রাজা, কি ভিখারী, কেহই সর্বতোভাবে সুখী নয়। দুঃখের শক্তিশেল কখনো না কখনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে।"[১]

মেঘনাদবধ কাব্যের পূর্বে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই কবি তাঁহার নিয়তি-সম্পর্কিত ধারণাটি প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যে দেবতাদের মুখে একটি অজ্ঞেয় বুদ্ধিবিধানের অতীত কার্যকারিতাকে বারবার বিধি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।' দ্বিতীয় সর্গে শচীর প্রতি ইন্দ্র বলিয়াছেন—

হায় প্রাণেশ্বরি,—
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে !

স্বর্গের দেবরাজের প্রতিও এই বিধি বিরূপ হইয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার পত্রাংশে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রের যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন, He cannot resist Fate, 'হায় বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি এহেন দারুণ' ? অথবা অন্যত্র, 'মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি না জানি কি দোষে এবে'। দেবাদিদেব-পুত্র কার্তিকেয় পর্যন্ত আক্ষেপসহকারে বলিয়াছেন, 'বিধির নির্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে' ? স্বর্গীয় দেববৃন্দ যখন সুন্দ-উপসুন্দের নিধনচিন্তায় পর্যাকুল, তখন কবি পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছেন—

হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ? (তৃতীয় সর্গ)

মেঘনাদবধ কাব্যে এই অদৃষ্ট বা বিধির ভূমিকা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। মধুসূদন-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মেঘনাদবধ কাব্যে অদৃষ্টতত্ত্বের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। রাবণের উক্তিতে পুনঃপুনঃ বিধির দুর্জ্ঞেয়তার উল্লেখকে তিনি পাপাসক্ত রাবণের দুর্বল আত্মপক্ষসমর্থন এবং আপন দোষ স্বীকারের অক্ষমতা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

"আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই রাক্ষসরাজ পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির ন্যায়, যে কোনো উপায়ে হউক, পাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মনুষ্যহৃদয়ে স্বভাবত প্রবল। পাপের সমর্থন করিতে যাইয়া মনুষ্য,

---

১ এই অদৃষ্ট সম্পর্কে কবির চিরন্তন বিশ্বাস ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির স্থিরকণ্ঠে পুনরায় ঘোষিত হইয়াছে—'আহা বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কত্তে পারে ;—দুর্নিবার দৈব ঘটনার প্রতিকূলাচরণ করা কার সাধ্য' ! (মায়াকানন ৫।২)

কত সময়ে যে জগতের সকলকে, এমন কি নিজের হৃদয়কেও বঞ্চনা করে, তাহার সংখ্যা নাই। রাক্ষসরাজ ঘোরতর পাপাচারী হইয়াও, বিধাতার নিকট বলিতেন ;—

কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই !

যে অশুভক্ষণে তিনি জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতেন ; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইত না। আত্মবঞ্চকের ন্যায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহার নিজের কোনো অপরাধ নাই……"

মেঘনাদবধ কাব্যের অদৃষ্টবাদ প্রত্যক্ষভাবে গ্রীক কাব্যনাটকের নিয়তিবাদের আদর্শে পরিকল্পিত। কেবল মধুসূদন নহে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে এই অদৃষ্টবাদের ধারণাটি প্রবেশ করিয়াছিল। মধুসূদনের কাব্যে নাটকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইহার লীলায়িত প্রকৃতি দেখিতে পাই। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কোনো পূর্ববর্তী সংস্করণের একটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

Real Fatalism is of two kinds. Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of Œdipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract destiny, will overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind, modified Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of motives presented to us and of our individual character.

কিন্তু গ্রীক নাটকের এই অদৃষ্টবাদ ও হোমারের মহাকাব্যের দৈব কর্মচক্র (divine machinery) ঠিক এক বস্তু নহে। হোমারের কাব্যে গ্রীক দেবতাগণ কলহপরায়ণ, মনুষ্যসুলভ দোষগুণের আধার। তাঁহারা লোভ-হিংসা, কুটিলতা,

পূজা ও প্রতিপত্তি আদায়ের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। আপন আধিপত্য-বিস্তারের ষড়যন্ত্রে তাঁহারা মনুষ্যজীবনকে ক্রীড়নক করিয়া তোলেন, দেবতাদের স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছাতেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাই গ্রীক কাব্যের দৈব কর্মচক্র বা divine machinery—মধুসূদন ইহাকেও গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ ইহার সহিত নাটকের অদৃষ্টবাদও সমীকৃত হইয়াছে।) স্বর্গের দেবতাগণ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাবণের ভাগ্য নির্ধারণ করিতেছেন। বসুন্ধরার ইন্দ্রপুরীতে আসিয়া রাবণের মৃত্যুর জন্য তদ্বির, মায়াদেবী ও ইন্দ্রের উদ্বিগ্ন কর্মব্যস্ততা, ভক্তবৎসলা পার্বতীর মহাদেব-চরণে পুনঃপুনঃ আকূতি ও শিবের নিকট হইতে কার্যসিদ্ধির কৌশল আবিষ্কার করা—এ সকলই একজাতীয় দৈবযন্ত্র মাত্র, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাবণ হইতে সুরু করিয়া স্বর্গীয় দেববৃন্দ—এমন কি মহাদেব পর্যন্ত এক অনির্দেশ্য অজ্ঞাত মহাশক্তিরূপ বিধাতার দোহাই দিয়াছেন।) ফলে এই নিয়তি কেবল রাবণের নহে, মানব-জীবন মাত্রেরই একটি অনিবার্য দুরতিক্রমণীয় বিধান-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে এবং রাক্ষস-দেবতা-মানব সকলেই ইহার নিকট মাথা নত করিয়াছে। এমন কি, প্রেতলোকের অধিবাসী দশরথ পর্যন্ত তাঁহার পাপভোগের জন্য এবং রামচন্দ্রের দুঃখভোগের জন্য এই নিয়তিবিধানের উল্লেখ করিয়াছেন। হোমারের কাব্যে দেবযন্ত্রের অমোঘ কার্যকলাপের পশ্চাতে মানব-চরিত্রের কোনো নৈতিক অপরাধের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নাই বলিয়া মেঘনাদবধ কাব্যে ইহাকে কবি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু গ্রীক নাটকে দেবতার ইচ্ছা দুর্জ্ঞেয় শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে, সে ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারী প্রগল্ভ নহে—মানুষের কোনো শাশ্বত নীতিভঙ্গেই সেই দৈববিধি সক্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহার পরিণাম মানবিক জীবনের ঘটনাগত পরিণামরূপেই দেখা দেয়—অলৌকিকতারূপে নহে।) এইজন্য রাবণ তাঁহার রিক্ত বিলাপে হতোদ্যম ললাটাঘাতে যে বিধাতার অচিন্তনীয় প্রকোপের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেখানে অস্পষ্টভাবে আপনার কোনো সম্ভাব্য অপরাধের ইঙ্গিতও আছে—যদিও সে অপরাধ রাবণের নিকটও স্পষ্ট নহে, কারণ এ বিধি ভারতীয় কর্মফল নহে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণের খেদোক্তি—

ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ?

মৃতবৎসা চিত্রাঙ্গদা যখন দ্বিধাহীন ভাষায় রাবণকে পুত্রহত্যার জন্য দায়ী রিয়াছেন, তখন নিষ্ফল যন্ত্রণায় রাবণ বিলাপিতা জননীর নিকট আপনার াগ্যাহত বিষাদের মূর্তিটিকে স্থাপিত করিয়াছেন—

এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে ?
গ্রহদোষে দোষী জনে·কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি !·········বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

কিন্তু বেলসাজারের ভোজসভায় প্রসারিত করালবাহুর মত এই বিধির মপ্রসর্পিত আক্রমণশীলতায় রাবণ কখনই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। ারবার দৈববলে-পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও তিনি কেবল জ্ঞেয় অদৃষ্টক্রমেই ভূপাতিত হইয়াছেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাবণ যেন াহার দুঃসাহসের অক্ষরেখাটি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই ইন্দ্রজিৎ মঘনাদকেও রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণে তাঁহার অন্তর অজানিত শঙ্কায় ম্পিত হয়, যেহেতু—

বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে !
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?

অদৃষ্ট-বিধ্বস্ত ভাগ্যবিপর্যস্ত রাবণের অসহায় মূর্তিটি সপ্তম ও নবম সর্গ আচ্ছন্ন রিয়া আছে। সপ্তম সর্গে মহাদেবের আদেশে রাক্ষসদূতের ছদ্মবেশে যখন শিবপ্রেরিত বীরভদ্র লঙ্কারাজসভায় লঙ্কারাজ রাবণের নিকট মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়াও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলেন, তখন াবণ তাঁহাকে সাহস ও অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন, 'শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।' কিন্তু এই মানসিক স্থিতিস্থাপকতা তাঁহার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ুত্র-মৃত্যুবার্তা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে রাবণ সংজ্ঞাহীনভাবে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছেন। াহার পর লক্ষ্মণকে বধ করিতে যাইবার সময় রাবণের শোকবারিধারা

ক্রোধাগ্নিতাপে বাষ্পে পরিণত হইয়াছে—তখন অদৃষ্টের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অসহায় নিষ্ফল আর্তনাদ মাত্র নহে—অদৃষ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াও শেষবারের মত প্রতিহিংসা ও পৌরুষের অট্টগর্জন ধ্বনিত হইয়াছে তাঁহার কণ্ঠে—

বাম এবে রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার।

শোকমূর্ছিতা জননী মন্দোদরীকে পুরাভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করা হইলে সংগ্রামোন্মুখ রাক্ষসবাহিনীকে সম্বোধন করিয়া রাবণ বলিলেন—

কিন্তু দেবনরে
পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি, তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি! কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন?

নবম সর্গে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের সংবাদে রাবণ পুনরায় তাঁহার ক্ষণ পৌরুষ-তেজিত জীবনে অদৃষ্টের প্রতিকূল বিধান প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্বার শিহরিত হইলেন, তাঁহার নিয়তিনিহত নিরাশ্বাস চরমে উঠিল। প্রিয়ামকে একিলিস যেমন বলিয়াছিলেন, নশ্বর মানুষের বিষাদ অপরিহার্য—এই পৃথিবীতে পাপ ও পুণ্য, অট্টহাস্য এবং বিলাপ উভয়েরই স্থান আছে, তেমনি ভাষায় রাবণের মুখে কবি বলিলেন—

বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
বিমুখি অমর নরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্য দোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি!

ইহাই যথার্থ গ্রীক অদৃষ্টচক্র—এই বিধি যথার্থই মানুষকে অনির্দেশ্য নিরুপায়তায় আচ্ছন্ন করে, প্রতিকারহীন নৈষ্ফল্যে হতবুদ্ধি করে। সেই মুহূর্তে মনে হয়, রাবণের সীতাহরণজনিত পাপ উপলক্ষ মাত্র, নতুবা রামচন্দ্র ও রাবণের মধ্যে যে মরণপণ শত্রুতা, তাহার মূলে কেবল বিধাতার দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোনো কারণ নাই। সপ্তদিবস যুদ্ধবিরতির জন্য রাবণের প্রস্তাব রামচন্দ্রের কাছে পেশ করিবার কালে বুধশ্রেষ্ঠ সারণমন্ত্রী তাই সবিনয়ে বলিয়াছেন—

কুক্ষণে ভেটিল দোঁহে দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু;
খগেন্দ্র নগেন্দ্রবৈরী; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?

রাবণের নিকট বিধাতার যে লীলা দুর্জ্ঞেয় বোধাতীত বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা সীতাহরণের পাপজনিত, ইহা তথ্যরূপেই অন্যান্য চরিত্রের মুখে ঘোষিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই গ্রীক অদৃষ্ট কোনো ঘটনা বিশেষের উপর নির্ভর করে না, গ্রীক কাব্যরসিক মধুসূদন তাহা জানিতেন। নতুবা রাবণ তাঁহার সীতাহরণগত পাপের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত অচেতন থাকিয়া গেলেন বা 'আত্মবঞ্চনা' করিয়া গেলেন, ইহা কি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়? চিতাশয্যায় শায়িত লঙ্কার পঙ্কজ-রবির মহাপ্রয়াণ-উৎসবের পূর্বে রাবণের সেই অবিস্মরণীয় আক্ষেপে যদি সামান্য পাপচেতনা থাকিত, তবে তাঁহার নিবিড় বেদনায় সংস্কারবদ্ধ পাঠকের চোখও সজল হইত না। কিন্তু রাবণের হাহাকারে যে দুর্জ্ঞেয় বিষণ্নতা—পাপের সূত্রসন্ধানে অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ানোর নিষ্ফল কাতরতা, তাহার দ্বারাই কাব্যের অন্তিম পটে নিয়তি-নির্যাতিত চরিত্রটি মহান হইয়া উঠিয়াছে—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।

…বৃথা আশা ! পূর্বজন্ম ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
………কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?

মেঘনাদবধ কাব্যের এই অদৃষ্টবাদ যে পাপের কর্মফল মাত্র নহে, ই গ্রীক কাব্য নাটকের মত মানবজীবনের উপর প্রসারিত বিধিবাহুর দুর্জ্ঞে এক বিধান, তাহা কেবল রাবণ নহে, অন্যান্য চরিত্রের দ্বারাও প্রমাণ ক যায়। সীতাহরণের পাপ কেবল মাত্র রাবণের, কিন্তু সত্য-পথচারী রামচ কেন বিধির দোহাই দিবেন ? মধুসূদনের রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়েই অদৃষ্টবাদী লক্ষ্মণের চণ্ডীমন্দির হইতে সার্থকভাবে প্রত্যাবর্তনের পরও গ্রহবিশ্বাসী রামচন্দ্রে আশঙ্কা ঘোচে না, স্নেহবিহ্বল করুণাছলছল চিত্তে তিনি লক্ষ্মণকে বলেন

রাজ্য ধন পিতামাতা স্ববন্ধুবান্ধবে
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি।

এই কাব্যে অদৃষ্ট সম্পর্কে চরম বাক্য আছে ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের মুখে। দুষ্প্রবে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে নিভৃতে উপাসনারত ইন্দ্রজিতের সম্মুখে অতর্কিতে কৃতান্তরূপী লক্ষ্মণের আবির্ভাবে ইন্দ্রজিৎ যখন বিস্মিত ও শিহরিত হইয়াছে তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিয়াছেন,

মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।

অদৃষ্ট সম্পর্কে এত সংক্ষিপ্ত অথচ অমোঘ উক্তি সফোক্লেসের নাটকেও নাই।

তাই মেঘনাদবধ কাব্যে অদৃষ্ট বা প্রাক্তনের বিধান হইতে দেবতারও নিস্তার নাই। দ্বিতীয় সর্গে মহাদেব পর্যন্ত পার্বতীর কাছে স্বীকার করিয়াছেন,

হায় দেবি, দেবে কি মানবে
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?

চতুর্থ সর্গে মূর্ছিতা সীতার নিকট আবির্ভূতা বসুন্ধরার উক্তি—

বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ—

কিংবা পঞ্চম সর্গে মায়াদেবীর মন্তব্য—

মায়াজালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র দুর্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?

ষষ্ঠ সর্গে রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী পর্যন্ত নিরুপায়ের মত এই বিশ্ববিধাতার অমোঘ বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—

হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রানী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তারে ? কিন্তু নিজ দোষে
মজে রক্ষঃ-কুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি !
তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?

কোনো কোনো সমালোচক মেঘনাদবধ কাব্যের অদৃষ্টতত্ত্বকে হিন্দু পৌরাণিক কর্মফলের সহিত যুক্ত করিতে চাহেন। ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই অদৃষ্টকে 'নৈতিক শক্তির অনতিক্রম্য প্রভাব' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধুসূদনের কাব্যে নৈতিক শক্তির প্রভাব কখনই বড় হইয়া দেখা দেয় নাই, যদিও রাবণের নারীহরণজনিত অপরাধকে তিনি লঘু করিতে পারেন নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার কারণ, নৈতিক শক্তির প্রতি কবির আনুগত্য নহে, রাবণ চরিত্র সম্পর্কে কবির মনঃস্থিরতার অভাব। কর্মফল এই কাব্যে অদৃষ্টকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু তাহা অষ্টম সর্গে নরক বর্ণনায়। নবম সর্গে কবি যে নরকের বর্ণনা করিয়াছেন, পাশ্চাত্য মহাকাব্য হইতে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিলেও এই নরকের সহিত ভারতীয় কর্মফলকে কবি বারবার যুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই আলোচ্য সর্গে অদৃষ্টের অনির্দেশ্য বিধানের জন্য করাঘাতকরুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। বিধির বিধান যেন একজাতীয় পাপীর দণ্ডদান এবং পুণ্যের সংকৃত ফল-প্রদানরূপ ব্যাপার, তাই নরকে 'অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা জ্বলে নিত্য' বলিয়া মায়াদেবী রামচন্দ্রের নিকট রৌরব নরকের বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহা গ্রীক অদৃষ্টতন্ত্র বা দৈব কর্মচক্রের বিরোধী। কারণ, পাপ-পুণ্যের নিরিখে জীবনকে সুস্পষ্ট সীমারেখায় ভাগ করার মধ্যে কোনো রহস্য নাই। প্রাক্তন যদি কেবল এই কর্মনির্ণায়ক ক্রিয়ায় পরিণত হয়, তবে সেই

প্রাক্তনের ফল কখনই গভীর ট্রাজিক বেদনার সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে, অদৃষ্ট এবং অষ্টম সর্গের নরক বর্ণনার কর্মফল এক নহে। কারণ অদৃষ্টের ক্রিয়া এই জীবৎকালেই—কোনো জন্মান্তরে তাহা সূচিত হইলেও হইতে পারে। আর কর্মফল মৃত্যুর পর প্রেতজীবনে সংঘটিত হয়। 'মরে পুত্র জনকের পাপে', 'মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে'—প্রভৃতি উক্তিগুলি যথার্থই গ্রীক অদৃষ্টবাদ বা এশিয়াটিক ফ্যাটালিজম-এর ভাষা। কর্মফলের দ্বারা এইগুলি ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই ভারতীয় কর্মফল ও অদৃষ্টকে এ কাব্যে মধুসূদন মিলাইতে পারেন নাই। অষ্টম সর্গে মায়াদেবী যে রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন,

বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে, বয়সে কাঙালী—

সে বিধি নিতান্তই হিন্দু পৌরাণিক কর্মফল মাত্র। সুতরাং মন্তব্যটি নীতিকথায় পর্যবসিত হইয়াছে, এই কাব্যে রাবণের অদৃষ্ট-বিপর্যস্ত বিলাপের সহিত তুলনীয় নহে।

নরকে যখন রামচন্দ্র দশরথের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তখন রাজর্ষি দশরথও রামকে বিধির নির্বন্ধের কথা বলিয়াছেন—

নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্মপথগামী তুই!

এখানে বিধাতার বিধান ও দশরথের কর্মদোষ ঠিক পার্থিব পাপের পরিণাম নহে—ইহা আবার গ্রীক অদৃষ্টবাদকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। কারণ দশরথ নরকে পাপীর শ্রেণীবিভাগ-স্বরূপ রৌরব-জাতীয় যন্ত্রণাদায়ক কোনো অংশে বাস করেন না, তিনি পুণ্যবানদিগের বিহারস্থল-বাসী—'যে পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি চন্দ্র-সূর্য-তারারূপে দীপে অহরহ উজ্জলে'। তথাপি তাঁহার আত্মগ্লানির অবসান হয় নাই, তাই রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি বলেন, রামচন্দ্রের অদৃষ্টেও সুখভোগ নাই। লক্ষ্মণ প্রাণ লাভ করিবে, ভারতব্যাপী রামচন্দ্রের যশঃসৌরভ পরিব্যাপ্ত হইবে, তথাপি এক দুর্জ্ঞেয় দুঃখে রামচন্দ্রের জীবন আচ্ছন্ন হইবে। ইহার কারণস্বরূপ দশরথ বলিয়াছেন—

মম পাপহেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।

এ বিধি যে নরকের কর্মফলদাতা নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই মধুসূদনের অদৃষ্টবাদ—এই অদৃষ্টবাদের বিলাপেই এ কাব্য আগাগোড়া আচ্ছন্ন বলিয়া ইহা করুণ-রসাশ্রিত মনে হয়। কিন্তু এ বিলাপ দুর্বলের অক্ষম আর্তনাদ নহে, ইহা ভাগ্যবিড়ম্বিত বীরের বিলাপ—দুর্নিরীক্ষ্য ভাগ্যবিধাতার বিধানে মহাশক্তিধর বীরের আর্তনাদ। তাই জীবনে যিনি কখনও ভাগ্যের লাঞ্ছনাকে স্বীকার করেন নাই, সেই মেঘনাদ পর্যন্ত নিরস্ত্র অবস্থায় রক্তাপ্লুত শরীরে ভূপতিত হওয়ার মুহূর্তে শেষবারের মত কপটসমরী মূঢ় লক্ষ্মণকে তিরস্কৃত করিয়া এই দুর্জ্ঞেয় বিধাতার বিধানের কথা স্মরণ করিয়া উঠিয়াছেন—

> দৈত্যকুলদম ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
> মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
> দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?

বিধাতার এই দুর্বোধ্য তাপদানের কারণ বা হেতু কি কবি মধুসূদনও তাঁহার জীবনে কোনোদিন বুঝিতে পারিয়াছেন?

ক্লাসিকাল রীতির কাব্য

ইংরাজি সাহিত্যে ক্লাসিকাল শব্দটি শিল্প-সাহিত্যের একটি বিশেষ রীতি বা ভঙ্গি বুঝাইতেই কেবল ব্যবহৃত হয় না। ইহা একজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষণ, যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকিলে জগৎ ও জীবনকে স্থির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিতে নিরীক্ষণ করা যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবন ক্রমশ এক প্রকার জটিল মনোভাবের বশীভূত হইতেছে—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, বস্তু হইতে ভাবের মধ্যে, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়াতীতের সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু জীবনকে তাহার স্ব-স্বরূপে দর্শন করিবার ও গ্রহণ করিবার এক আদিম বলিষ্ঠ রীতিকেই বলা হইয়া থাকে ক্লাসিকাল রীতি। এই অরুগ্ন বলিষ্ঠ জীবনের চিত্র আদিম সমাজের মহাকাব্যেই চিত্রিত আছে—পরবর্তীকালের কবিরা কেবল তাহার অনুকরণ মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু সে জীবন আর প্রত্যাবর্তন করিবে না। অথচ ইহাও সত্য যে, সেই জীবনের মধ্যেই একটি চিরন্তনতা আছে—তাহা শত শত বৎসরেও সমাজের সকল প্রকার অস্থির পরিবর্তনশীলতার ভিতর দিয়া আপনার এক প্রকার শাশ্বত প্রকৃতিকে মূর্তিমান করিয়া তোলে। এইজন্যই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাকাব্যের

যুগ চলিয়া গিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও মহাভারত সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে,—

"এ সেই মানবসমাজের চিরন্তন বিপ্লবের ইতিহাস—যাহা যুগ-যুগান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যাবর্তন করে ; যাহা সাগরগর্ভকে মালক্ষেত্রে উত্তোলিত করিয়া মালক্ষেত্রকে সাগরগর্ভে নিমগ্ন করে ; যাহা পর্বতচূড়ার সহিত পর্বত-চূড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া প্রলয়াগ্নির সৃষ্টি করে। সেই অগ্নিশিখায় অরণ্যানী মরুভূমিতে পরিণত হয়, জীবকুল ধরাপৃষ্ঠে অস্থিকঙ্কাল রাখিয়া কালের কুক্ষিতে অন্তর্হিত হয়। ইহা সেই সনাতন অধর্মের অভ্যুত্থান, যাহা দলিত পীড়িত ও সংকুচিত করিয়া ধর্মের পুনঃস্থাপনের জন্য মহেশ্বরের মহৈশ্বর্যের অবতারণা আবশ্যক হয়—ভীত বিস্মিত মানবচিত্ত যখন সেই ঐশ্বর্যের মহিমায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া তাহার চরণোপান্তে আপনাকে লুণ্ঠিত করে।"

সুতরাং যাহা কিছু মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই ক্লাসিকাল বলা যায়। এই দিক হইতে ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয় রামায়ণ ও মহাভারত অপেক্ষা ক্লাসিকাল আর কিছুই নহে। সংস্কৃত অভিধান-রচয়িতা মনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌ রামায়ণ সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন—

The classical purity, clearness and simplicity of its style, the exquisite touches of true poetical feeling with which it abounds, all entitle it to rank among the most beautiful compositions that have appeared at any period and in any country.

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতিকালে এই দুই গ্রন্থের মূল্য এই কারণেই গভীরভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং একাধিক কবি-সাহিত্যিক রামায়ণ মহাভারতের সম্পদ-ভাণ্ডার হইতে আপন কবি-কল্পনার প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহা ঐ ক্লাসিকাল আদর্শের অনুশীলনের নিমিত্তই। এই কারণেই উনিশ শতকে আমরা একটি নব-ক্লাসিকালের উদ্‌বর্তন দেখিতে পাইলাম—অর্থাৎ পুরাজগতের রীতি ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারপর্ব—revival of the forms and traditions of the ancient world—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যাহাকে বলিয়াছেন 'প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বর' (মধুসূদন-রচনা-সম্ভারের ভূমিকা)।

রামায়ণ কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের ক্লাসিকাল রীতির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

ইহার আঙ্গিকগত পূর্ণতা, মানবিকতাবাদী আদর্শ, জাতীয়তা-অতীত আবেদন পরবর্তীকালের কবিরা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একই সঙ্গে এই সবগুলি বৈশিষ্ট্য একই কবির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত কবিচিত্তের স্ববিরোধী প্রবণতা প্রসিদ্ধ প্রথার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে নাই। রঘুবংশম্ যে পরিমাণে ক্লাসিকাল রীতির, শকুন্তলা ততটা নহে, মধুসূদন শকুন্তলাকে রোমাণ্টিকই বলিয়াছেন। ভবভূতি বা ভর্তৃহরি আরও রোমাণ্টিক, কারণ বাল্মীকির পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁহারা কেহই পান নাই।

অতি আধুনিক উন্নাসিক যুগ বলিষ্ঠতাকে বর্বর বলিয়া পরিহার করিতে চাহে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত প্রাচীন মূল্যবোধগুলিকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া বিশ্বাস করে না। অনেকে জাতীয় ঐতিহ্যবিরোধী বলিয়াও প্রাচীন সাহিত্যকে বর্জন করেন। ইতালির নবজাগৃতি প্রধানত জাতীয় ঐতিহ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৎসত্ত্বেও গ্রীক ও রোমান ঐতিহ্য সেখানে প্রাণরস সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল। অবশ্য ফরাসী জার্মান বা ইংরাজি সাহিত্যে যেমন ক্লাসিকাল রীতির যুগাবির্ভাব ঘটিয়াছিল, বাঙলা সাহিত্যে ঠিক সেই অর্থে কখনই ক্লাসিসিজ্ম্-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে নাই—এমন কি যাহাকে রোমাণ্টিক যুগ বলে তাহাও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট কালপটে সূচিত হইয়াছিল এমন বলা যায় না। তাই উনিশ শতকের কবিরা একই সঙ্গে ক্লাসিকপন্থী ও রোমাণ্টিকধর্মী হইতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদনের ব্যক্তিগত প্রতিভায় এই দুই রীতির প্রতিই প্রবণতা ছিল—মিলটন যেমন এপিকের মধ্যে গীতিকবিতার ঝংকার তুলিয়াছিলেন বলিয়া অধ্যাপক সেণ্টস্‌বিউরি মন্তব্য করিয়াছেন। মধুসূদন যখন হোমার ভার্জিল দান্তের শিষ্য, টাস্‌সো অরিয়েস্টো মিলটনের 'হিরোইক কাপলেট' অনুসরণ করিতেছেন, ড্রাইডেন হইতে যখন তিনি মহাকাব্যের নায়কের আদর্শ নিরূপণ করিতেছেন, তখন তাঁহার রচনারীতি ক্লাসিকাল আদর্শের অনুবর্তন করিয়াছে। যখন তিনি মুর বায়রণ এমন কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অনুসারী তখন তিনি আংশিক রোমাণ্টিক রীতি মানিয়া লইয়াছেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে, এমন কি তিলোত্তমা বীরাঙ্গনা কাব্যেও কিছুটা, তিনি যথার্থই একটি ক্লাসিকাল ভাবভঙ্গির সার্থক প্রবর্তন করিতে পারিয়াছেন—একালের কোলাহল-বিক্ষুব্ধ জটিল ধূলিকলুষজড়িত

পরিবেশে একটি 'প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বর' ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ক্লাসিসিজম্-এর বাহ্যিক লক্ষণ স্বচ্ছ জীবনবোধ, সরল প্রত্যক্ষ বস্তুবর্ণনা, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার পরিবর্তে এক প্রকার স্বভাবসৌন্দর্য ও স্বভাবোক্তি, মানব-জীবনের মহত্ত্বের অনুকূল যে সকল বৃত্তি তাহার স্তাবকতা। অন্তত এই বাহ্যলক্ষণে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের দীনতা নাই। ইহার বিপুল-বিস্তৃত পটভূমিকা, স্বর্গমর্তপাতাল-প্রসারিত কার্যকলাপ, দেব-মানব-রক্ষ-যক্ষ-মিলিত কর্মচক্র, স্বর্গলোক ও স্বর্ণলঙ্কার প্রত্যক্ষবৎ সৌন্দর্য বর্ণনা, গাম্ভীর্য, মহত্ত্ব ও ভাবসমুন্নতি—এক কথায় উদাত্ত-স্বরিত বিষয়ের এমন স্বমহিম গরিমা রীতিমত বিস্ময়কর। সর্বোপরি ক্লাসিক বর্ণনাভঙ্গির মুখ্য গুণ যে সংযম ও পরিমিতিবোধ, তাহা মধুসূদনের মধ্যে যত পরিমাণ ছিল, তাহার অর্ধাংশও অন্য কোনো বাঙালী মহাকাব্য-রচয়িতার মধ্যে ছিল না। ভাষা কোথাও কূলপ্লাবী হয় নাই, বর্ণনা সর্বত্রই পরিমিত এবং একান্ত আবশ্যকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো প্রবৃত্তিকেই অশোভনভাবে প্রাধান্য দান করা হয় নাই—সব কিছুর মধ্যেই কঠিন সামঞ্জস্য ও বন্ধনের সুষম শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। এই সব কারণেই মধুসূদনকে অন্তত তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে ক্লাসিকাল কবি বলা অবান্তর নহে।

কাব্যের সর্গ আলোচনা করিয়া, কাহিনীর গতির সহিত মিলাইয়া বিশেষ বিশেষ পংক্তির মধ্য দিয়া এই কাব্যের ক্লাসিকাল উপাদান অন্বেষণ করা বর্তমান সমালোচনার কাজ নহে। তৎসত্ত্বেও আধুনিক কাব্যপাঠকের কাছে ইহার ক্লাসিকাল রীতির বৈশিষ্ট্য বিচার করিবার কয়েকটি সূত্র আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র-চিত্রণে, প্রকৃতি-বর্ণনায়, শোক-বীরত্ব-ক্রোধ-প্রেম প্রভৃতি বৃত্তি প্রকাশে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, নৈতিক চেতনায় ইহার ক্লাসিক সংহতি ও সংযমের কিরূপ সার্থক পরিস্ফুটন ঘটিয়াছে, দেখা যাইতে পারে। রোমান্টিক কবির নিকট চরিত্র-চিত্রণের কোনো আদর্শ থাকে না। বিশেষ করিয়া পৌরাণিক কোনো চরিত্রকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিবার সময় চরিত্রটি আধুনিক হইয়া উঠে—তাহার সূক্ষ্ম মনোবেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোমল হৃদয়বৃত্তি ও স্পর্শকাতরতা যাহা মহাকাব্যের কবির পক্ষে ছিল দুনিরীক্ষ্য, তাহাই একালের অনুভূতিসর্বস্ব কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়। 'কর্ণকুন্তী সংবাদে' মহাভারতের পৌরুষপরায়ণ দৈবনিপীড়িত ট্রাজিক চরিত্রটিকে

রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি অবিকৃতই রাখিয়াছেন—কর্ণের সকল আচার-আচরণ, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উপাদান মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতেই সংকলিত। কিন্তু রণক্ষেত্রের সীমান্তে দাঁড়াইয়া রাত্রির স্তব্ধনীরব অন্ধকারে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য কর্ণ-চরিত্রে কবি যে মাতৃস্নেহকাতরতা, অব্যক্ত বেদনা ও অবোধ মাতৃনাম-উচ্চারণের আতুর দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একান্তই রোমান্টিক, ইহা মহাকাব্যের ক্লাসিক চরিত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কুন্তী-চরিত্র সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ হইতে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বিভীষণ এমন কি সুগ্রীব-চরিত্রকে পর্যন্ত মধুসূদন রামায়ণ হইতে যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে চরিত্রগুলির বাহিরের রূপে পরিবর্তন ঘটিলেও অন্তরের সূক্ষ্মতম স্তরে কোনো নূতন হৃদবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। মহাকাব্যের চরিত্র হিসাবে তাহাদের জিগীষা, ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা, রণস্পর্ধিত্ব, উল্লাস বা নৈরাশ্য অবিকৃতই আছে। কবি যে পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন তাহা মূল্যায়নে, তাহা রাবণের সামগ্রিক অখ্যাতির প্রতি সামান্য সংস্কারসাধনের মনোভাবে—ইহা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। কিন্তু কোনো চরিত্রকেই আমরা কর্ণের মত নূতন করিয়া চকিতে আবিষ্কার করি না—সূক্ষ্ম জটিল অতি-আধুনিক কোনো রোমান্টিক অনুভূতির লূতাতন্তু তাহাদের হৃদয়ে রজত-রোমাঞ্চকর কোনো জাল বয়ন করে নাই। সংস্কৃত রামায়ণখানি পরিশ্রম করিয়া যাহাদের পড়া সম্ভব হইবে, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন, রামায়ণের চরিত্রগুলির সহিত তুলনায় মধুসূদনের চরিত্রগুলি কী পরিমাণে রক্ষণশীল, স্থিতিধর্মী ও ক্লাসিকাল। নবীনচন্দ্রের হাতে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন রোমান্টিক চরিত্র, কিন্তু মধুসূদনের কোনো চরিত্রই বিহ্বল-ভাবাবেশে দোলায়িত নহে। বাৎসল্যের পারবশ্য, স্নেহের আতিশয্য বা প্রেমের একনিষ্ঠতা ক্ষেত্রবিশেষে সংযত ও সংগত বলিয়াই তাহা ক্লাসিকাল কাব্যের উপযোগী হইয়াছে।

প্রকৃতি বর্ণনায় মেঘনাদবধ কাব্যের কবি বস্তুসৌন্দর্যের এক অতি-সংযমী স্বভাবতন্নিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। এই কাব্য রচনাকালে বাঙলা সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবান্দোলন প্রচারিত না হইলেও প্রতীচ্য কাব্যের রোমান্টিক গীতিকবিতার ভিতর দিয়া প্রকৃতির নিরুদ্দেশ রহস্যময় ইঙ্গিতধর্মী ও সাংকেতিকস্বরূপ অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু মধুসূদন সমগ্র কাব্যখানিতে বহুবার প্রকৃতি-বর্ণনার সুযোগ পাইলেও কোথাও প্রকৃতির দিকে আপন

হৃদয়ের তন্ময়তা দিয়া দেখেন নাই—প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন তিনি স্পষ্ট পাত্রপাত্রীর দৃষ্টিতে ও প্রয়োজনে এবং প্রয়োজনান্তে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেন নাই। প্রকৃতির মধ্যে তিনি কোনো রহস্যসুন্দরীর অশ্রুত চরণের লীলায়িত পদক্ষেপ দেখিতে পান নাই—কবির কোনো ব্যক্তিগত নিসর্গদর্শন-স্মৃতি মুহূর্তে বর্ণনীয় বিষয় বিস্মৃত করিয়া কবিকে তন্ময় করিয়া দেয় নাই। দ্বিতীয় সর্গের সূচনায় দিবসাবসান ও সন্ধ্যাগমের যে সংক্ষিপ্ত কয়েক চরণের চিত্র আছে তাহাও অতি স্বাভাবিক এবং সার্বভৌম—সর্বোপরি ইহা কেবল সন্ধ্যার বর্ণনা নহে, নিদ্রা নামক দেবীর ধীরসঞ্চারী আগমন ও বিশ্বজীবের তৎচরণে বিরামলাভের একটি 'প্যাগান' বর্ণনা। পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ হত্যার দিন অতি প্রত্যুষে যে আলোকাভাস ও কুঞ্জবনগীতের বর্ণনা আছে, তাহা এত সন্তর্পণে ও সতর্কভাবে যে, কোন্‌টি প্রকৃত ঊষাবির্ভাব ও কোন্‌টি চণ্ডীর দেউলে পূজাপ্রদায়ী লক্ষ্মণের প্রতি প্রসন্না সরস্বতীর আশীর্বাদবাক্যে জাগরিত বিহঙ্গকাকলি, তাহা সহজেই যেন বোধগম্য হয় না। প্রকৃতি কবিকে যে অকারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নাই, আপন হৃন্ময়তার দ্বারা যে তিনি প্রকৃতিকে অঙ্কিত করেন নাই, ইহাই তাঁহার ক্লাসিকাল কবি-স্বভাবের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্রগুলির মানবিক অনুভূতি ক্লাসিকাল কাব্যের সংযমে ঘনীভূত হইয়া আছে—কবি কোথাও কোনো আবেগপ্রবণতাকেই সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে দেন নাই। এই কাব্যে চরিত্রের সংখ্যা কম নহে এবং তাহাদের নানাবিধ মনোভাবই বিভিন্ন সময়ে বিবিধ প্রসঙ্গে ব্যক্ত হইয়াছে। অথচ কখনও কোনো চরিত্রের মুখে এমন ভাবাবেগ দৃষ্ট হয় না, যাহা সেই চরিত্রের পক্ষে অশোভন বা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে। প্রেম কিংবা শোক, ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা কিংবা শঙ্কিত অমঙ্গল, নিশ্চিত বিশ্বাস অথবা চঞ্চল দুর্ভাগ্য চরিত্রগুলিকে ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত করিয়াছে, অথচ তাহাদের প্রকাশ যথাসম্ভব সংবৃত ও গম্ভীর। মাত্র দুইটি চরিত্র লইয়া আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এই কাব্যের দুইটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র রাবণ ও রামচন্দ্র—দুইটি চরিত্র সম্পর্কেই একজাতীয় ভাবাতিরিক্ততার অভিযোগ আছে। বলা হইয়া থাকে যে মধুসূদনের রাবণ কাব্যের আগাগোড়াই শোককবলিত, বেদনায় মুহ্যমান, হতাশায় ভাঙিয়া-পড়া ক্রন্দন-বিলাসী চরিত্র। আর মহাকাব্যের মহানায়ক রামচন্দ্র মধুসূদনের

হাতে হইয়াছেন স্নেহদুর্বল শঙ্কাতুর বাৎসল্য-কাতর ও বলহীন চরিত্র। কিন্তু রাবণ ও রাম-চরিত্রের রূপায়ণে মধুসূদন বাল্মীকির মহাকাব্যিক আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, তাহা সংস্কৃত রামায়ণের সহিত তুলনা করিলেই প্রমাণিত হইবে। বাল্মীকির কাব্যেও বারবার মহাবীর রাম-চরিত্রের স্নেহবিহ্বলতা ও দুর্বলতার পরিচয় আছে; রাবণের বর্বরতা সত্ত্বেও তাঁহার মানবিক শোকপ্রকাশের প্রতি মহাকবি যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন। যুদ্ধ-কাণ্ডের ৬৮তম সর্গে দেখা যায়, কুম্ভকর্ণের মৃত্যুসংবাদে রাবণ শোকে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন এবং মূর্ছাভঙ্গে তাঁহার ক্রন্দমান পুত্রদের সহিত বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন, "হা শত্রুদর্পহারী মহাবল কুম্ভকর্ণ, তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করিয়াই যমালয়ে গিয়াছ! কুম্ভকর্ণবিহীন রাজ্যে এবং জীবনে আমার কী প্রয়োজন? আমি অজ্ঞানবশে বিভীষণের হিতবাক্য উপেক্ষা করিবার ফলভোগ করিতেছি।" পুনরায় প্রিয়পুত্র দেবান্তক ত্রিশিরা অতিকায় প্রভৃতির মৃত্যু-সংবাদে রাবণ শোককাতর হইয়া পড়িয়াছেন (৭৩তম সর্গ) এবং ইন্দ্রজিৎ পিতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহাকে শোকবিহ্বল না হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণেও রাবণ শোকে মূর্ছিত হইয়া পড়েন (যুদ্ধকাণ্ড ৯২তম সর্গ) ও সংজ্ঞালাভ করিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন, "হা বৎস বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি যখন গত হইয়াছ তখন আমারও মৃত্যু শ্রেয়। একমাত্র ইন্দ্রজিতের বিরহে সকাননা সমস্ত পৃথিবী ও ত্রিলোক আমার নিকট শূন্য মনে হইতেছে। হা শত্রুজয়ী বীর, তুমি যৌবরাজ্য লঙ্কা রাক্ষসসমূহ মাতা ভার্যা ও আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিলে?" এমন কি এই বিলাপও যেন এলায়িত, নিতান্তই রোদন—সেই তুলনায় মেঘনাদের চিতাশয্যার পার্শ্বে দাড়াইয়া অগ্নিপ্রদানের পূর্ব মুহূর্তে তুষারীভূত শোকের কী শীতল আর্তনাদ—

> ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
> এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—

সমুদ্রকে তিষ্ঠ বলিয়া স্তব্ধ করা যায় না; কিন্তু বিহ্বল বেদনার উদ্বেল তরঙ্গকে এত গম্ভীর অথচ মর্মভেদী, অভ্রবিদারক অথচ সংযত করিয়া প্রকাশ করা পৃথিবীর যে কোনো ক্লাসিক প্রতিভার পক্ষেই অগ্নিপরীক্ষা। সে

পরীক্ষায় মধুসূদন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।[১] বাল্মীকি যে রামচরিত্রকে মহাবীর্যবান করিয়া রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্নেহ-দুর্বলতাকে তিনিও গোপন করেন নাই। যুদ্ধকাণ্ডের প্রথম সর্গে অভাবনীয় লোকবল বন্ধুবল সৈন্য ও সম্পদ লাভ করিয়াও রামচন্দ্র যেরূপ আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাহাতে সুগ্রীব পর্যন্ত তাঁহাকে সামান্য মানুষের মত দুর্বল ও ব্যাকুল বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন। যুদ্ধকাণ্ডের ৮৩তম সর্গে দেখি সীতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইয়াছেন। রাবণ কর্তৃক শক্তিশেলে লক্ষ্মণের মৃত্যু ঘটিলে রামচন্দ্র শোকে বিষাদে কাঁদিতে লাগিলেন—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥
কিং নু রাজ্যেন দুর্ধর্ষ লক্ষ্মণেন বিনা মম
কথং বক্ষাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্ ॥
হা ভ্রাতর্মনুজশ্রেষ্ঠ শূরাণাং প্রবর প্রভো।
একাকী কিং নু মাং ত্যক্ত্বা পরলোকায় গচ্ছসি ॥

(যুদ্ধকাণ্ড ১০১তম সর্গ)

অর্থাৎ দেশে দেশে পত্নী, দেশে দেশে বান্ধবও পাওয়া যায় কিন্তু এইরূপ কোনও দেশ দেখি না যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়। দুর্ধর্ষ বীর লক্ষ্মণ ব্যতীত আমার রাজ্যে কী প্রয়োজন, পুত্রবৎসলা জননী সুমিত্রাকে আমি কী বলিব? হা নরশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রগণ্য ভ্রাতা, আমাকে ত্যাগ করিয়া কেন একাকী পরলোকে যাইতেছ?

মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে মধুসূদন এই সংস্কৃত শোককে প্রায় তর্জমা করিয়াই রামচন্দ্রের মুখে আরোপ করিয়াছেন। যথা

—তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা-জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে

১ অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মাইকেল-রচনা-সম্ভারের ভূমিকায় রাবণের এই সংহত নিস্তব্ধ-বজ্র শোকপ্রকাশের সহিত বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতির শোকোচ্ছ্বাসের তুলনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, মধুসূদন কত সংযত সতর্ক অনুচ্ছ্বসিত ভাবায় ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
ঊর্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে? ইত্যাদি

কিন্তু একজাতীয় সমালোচকের মতে, যেহেতু মধুসূদন রাবণকে মহৎ করিয়াছেন, রামচন্দ্রকে হীন করিয়াছেন, এই সূত্রে রামচন্দ্রের শোকপ্রকাশও তাঁহার চরিত্রের হীনতারই পরিচায়ক হইবে! অতএব যোগীন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করিয়াছেন—

"রামচন্দ্রের ন্যায় সত্ত্বগুণান্বিত মহাপুরুষের নিকট আমরা শোকের অবস্থাতেও সংযম ও দৃঢ়তা প্রত্যাশা করি।"

দুর্ভাগ্যবশত এই দৃঢ়তা স্বয়ং বাল্মীকিই যেখানে দেখাইতে পারেন নাই, সেখানে মধুসূদন কিরূপে দেখাইবেন? অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে পাত্রপাত্রীর অনুভূতির প্রকাশে মধুসূদন কত সংযমী ধীরপদসঞ্চারী অথচ নিপুণ। হেমচন্দ্র তাঁহার 'বৃত্রসংহার' কাব্যে রণজিঘাংসায় বৃত্রের নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের স্বরূপ বুঝাইতে একটি দীর্ঘ রোমান্টিক ভাববাষ্পের অবতারণা করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার কাব্যের ক্লাসিকাল গাম্ভীর্য নষ্ট হইয়াছে, যেমন ভক্তিনামকীর্তনের প্রবলতায় নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যের ক্লাসিকাল সংহতির ভরাডুবি ঘটিয়াছে। ইঁহাদের তুলনায় একমাত্র মধুসূদনই যথার্থ ক্লাসিকাল কবি, যিনি তাঁহার চরিত্রের মুখে কোথাও অপ্রয়োজনীয় অনুভূতির বা অতিরঞ্জিত ভাবাবেগের প্রশ্রয় দেন নাই, বাল্মীকির রামায়ণ অতিক্রম করিয়া নূতন কিছু রচনা করেন নাই। এইজন্যই ক্লাসিকাল কাব্যের সংযম ও বাঁধুনি, শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধ এখানে অক্ষুণ্ণ স্থাপত্যে শোভমান হইয়া উঠিয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে এক এক দেবতার এক একটি বাহনের উল্লেখ আছে,—যেমন মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী চণ্ডিকার বাহন সিংহ, কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর, সরস্বতীর বাহন শুভ্রপক্ষ মরাল, গণপতির বাহন মূষিক, মহাদেবের বাহন বৃষ। এই সকল বাহনের পরিকল্পনা গভীর উদ্দেশ্য-প্রসূত, কারণ বাহনের মধ্য দিয়া দেবদেবীর স্বভাবধর্ম ও বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে। দশপ্রহরণ-ধারিণী অসুর-নিধনকারিণী দেবী দুর্গাকে সিংহ ব্যতীত আর কে বহন

করিতে পারিত? তেমনি বাণীবিদ্যাদায়িনী শুক্লবসনার শ্বেতমরাল-বাহনটি যেন দেবীর শুভ্র রূপটিকে অভ্রান্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই বাহন যেমন দেবতার প্রতীক, ছন্দও সেইরূপ কাব্যের পক্ষে নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। ছন্দ কবিতার বাহ্যিক প্রসাধন মাত্র নহে, কবিতার বাণী-বিন্যাসরীতি ও চরিত্র-ধর্মের সঙ্গে ইহার নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে। মধ্যযুগের কাব্যে ধর্মপ্রচারের গতানুগতিকতার মধ্যে কোনো প্রকার বিদ্রোহ বা রীতি-অস্বীকারের দুঃসাহস ছিল না বলিয়া সেখানে কাব্যের রূপপদ্ধতি বা ছন্দোবিন্যাসে কোনো অভিনবত্ব দেখা যায় নাই—দীর্ঘ আট-নয় শত বৎসর ধরিয়া বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ধারা পয়ার-ত্রিপদীর সনাতন খাতেই স্তিমিত কল্লোলে প্রবাহিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত শক্তিমান কবির হাতে মাঝে মাঝে ইহাতে ঈষৎ বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের এবং ইহা ছন্দের মৌলিক প্রথাকে লঙ্ঘন করিয়া কোনো নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা জাগাইতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সকল বিভাগে যখন নবযুগের বাতাস বহিল, পাশ্চাত্য চিন্তার মেঘোদয়ে নববর্ষার বারিবর্ষণ হইল তখন স্বভাবতই সেই দীর্ঘকালের নিরাবেগ নদী তটলঙ্ঘনের স্বপ্নে তরঙ্গায়িত হইল, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলালের মত স্বভাবভীরু কবির দ্বারা সেই ভাগীরথীর গতিনির্দেশ সম্পন্ন হয় নাই। বাঙলা কবিতার ছন্দে সর্বপ্রথম যুগান্তর সাধন করিলেন মধুসূদন। এই যুগান্তরের নাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

মধুসূদন বাঙলা কাব্যের রীতি-প্রকৃতি চিন্তা-ভাবনা সবই আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা আচার-সংস্কৃতি বুদ্ধি ও প্রতিভায় আধুনিক বাঙালী জাতির যে নবধর্মে দীক্ষা ঘটিয়াছিল, সাহিত্যে, বিশেষত কাব্যসাহিত্যে তাহা আপনার প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। মধুসূদনই সর্বপ্রথম সেই নূতন জীবনের আকৃতিকে সার্থক স্বরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেন—এক মহাজাতির নূতন ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রনীতিকে, তাহার বিদ্রোহ ও দুঃসাহস, স্পর্ধা ও সংগ্রামবাসনাকে ভাষা দিলেন। নবীন কালের এই স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য রঙ্গলালের কাব্যবীণাতেই প্রথম বাজিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রঙ্গলাল সেই আগমনীর আলাপ মাত্র করিয়াছিলেন, তাহাকে উপযুক্ত মূর্তি দান করিতে পারেন নাই। মধুসূদন তাঁহার স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উপযুক্ত বাহন খুঁজিয়া পাইলেন—ইহার ভাষা ও ছন্দের স্বনির্মিত প্রকৃতি দেবতার উপযুক্ত বাহিকাশক্তিতে পরিণত

হইল বলিয়াই নূতন দেবতার মন্ত্ররচনা ও উপাসনা-পদ্ধতিতে ত্রুটি ঘটিল না। ইহার ভক্তমণ্ডলীও অবিলম্বে জুটিয়া গেল। বস্তুত অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কৃত না হইলে মধুসূদনের কবিধাতুর সকল মৌলিকত্বই আমাদের নিকট অননুভূত বা অদৃশ্য থাকিয়া যাইত। অমিত্রাক্ষরের সিংহশক্তির বদলে দেবীর পয়াররূপ ঘোটকে আবির্ভাব কবিতার ভাবধর্মের ক্ষেত্রে অনিবার্য মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের দুঃস্বপ্নরূপেই প্রতিভাত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মধুসূদন যে নূতন সাম্রাজ্য-বিজয় করিয়াছেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দই সেই সমুদ্র-যাত্রায় তাঁহার অজেয় সৈন্যবাহিনীর দুর্ভেদ্য নৌশক্তিরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের এক বিস্ময়কর মৌলিক আবিক্রিয়া—কেবলমাত্র এই একটি কীর্তির জন্যই মধুসূদন আধুনিক বাঙলা কাব্যের আদিগুরুরূপে স্মরণাতীত কাল পর্যন্ত প্রকীর্তিত হইতে পারিবেন। বাঙলা কাব্যের প্রায় সহস্রাব্দ-জীর্ণ ক্লান্ত-প্রবাহ সহসা রাত্রি-অবসানে মহাসমুদ্রের ঘোর নির্ঘোষে ও উদ্বেল জলতরঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে—নিছক স্তাবকতা ও একঘেয়ে বর্ণনার ছন্দ বিদ্রোহ-বিষাদ সুখ-দুঃখ ক্রোধ-ক্রূরতা প্রেম-ভালোবাসার বৈচিত্র্যে কলশব্দমুখর হইয়া উঠিয়াছে। কবিতার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মধুসূদন যেমন ভারতীয় কাহিনীর কাঠামোটুকু রক্ষা করিয়া তাহার সহিত বিশ্বসাহিত্যের অধ্যয়নজাত অভিজ্ঞতা যুক্ত করিয়া অভিনবত্ব সঞ্চার করিয়াছেন, কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রেও কবি সেইরূপ বাঙলা ছন্দের বাহ্যিক আকারটুকু রক্ষা করিয়া তাহার সহিত বিদেশীয় ছন্দের প্রচণ্ড গতি ও অশেষ সম্ভাবনাকে অলৌকিক কৌশলে সমীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল ভিত্তি আমাদের পুরাতন পয়ারই—চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত যে ছন্দে নিত্যকালের বাঙালীর মনোভাবনা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইহার অন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে প্রথাগত বাঙলা ছন্দের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই। কবি যেন এক অবিশ্বাস্য জাদুশক্তির প্রভাবে এক মুমূর্ষু শিশুর আয়ু হরণ করিয়া তাহাতে স্বর্গীয় অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। আবেগে-উল্লাসে, প্রণয়ে-সৌভাগ্যে, নৈরাশ্যে-ক্ষোভে-বিদ্রোহে পাঠকের চিত্তকে এমন করিয়া মুহুর্মুহু কম্পিত-শিহরিত মর্মরিত করিবার ক্ষমতা বিধাতা বহু শতাব্দীর মধ্যে একবার একজনকেই বোধ করি দিয়া থাকেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে গত এক শতাব্দীর মধ্যে বহুতর আলোচনা হইয়াছে—ছন্দোশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত হইতে সাধারণ অনধিকারী পাঠক পর্যন্ত এই ছন্দ সম্পর্কে এত অভিজ্ঞ বিশ্লেষণ ও পুলকিত-প্রশংসা করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে নূতন কোন চমকপ্রদ তত্ত্বাবিষ্কারের বোধ হয় কোনো সম্ভাবনা নাই। ইহার প্রেরণামূলে কবি মিলটনের Blank Verse কতখানি সক্রিয় ছিল এবং বাঙলার সনাতন পয়ার কতখানি সাহায্য করিয়াছে, এমন কি সংস্কৃত ছন্দের অন্ত্যমিলহীনতাই বা কবিকে কতখানি অনুপ্রাণিত করিয়াছে এই সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা যে-কোনও-মধুসূদন সমালোচনায় দেখা যাইবে। কিন্তু ইংরাজি বা সংস্কৃত ছন্দের লক্ষণাবলীর অনুকরণ করিয়া এক ভাষায় একটি অসাধারণ ছন্দের আবিষ্কার হইতে পারে না। যে জ্বলন্ত অগ্নিতাপে সম্পূর্ণ বিজাতীয় দুইটি ধাতু এক হইয়া নূতন এক পিণ্ডে পরিণত হইতে পারে তাহা মধুসূদনের প্রতিভায় ছিল--সেই প্রতিভার দিক হইতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ এখনও যেন সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা সংক্ষেপে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার-কাহিনী এবং ইহার মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের সূচনাপর্বেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল—তাঁহার প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব এই নূতন আবিষ্কৃত ছন্দেই রচিত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে মধুসূদন যখন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্য শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন, তখনই বাঙলা ভাষায় নবযুগের মহিমান্বিত কবিতা-রচনার প্রেরণা তাঁহার অন্তরে বেগবতী হইতেছিল এবং মহাসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বসিত অভ্যন্তরে দ্বীপ-সৃষ্টির মতই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সৃজিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে সম্ভবত কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম পরীক্ষা করেন[১]। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম ব্যবহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য না পদ্মাবতী নাটকে এই বিষয়ে মতভেদ আছে। শর্মিষ্ঠা নাটকের মহড়াকালেই পদ্মাবতী নাটক রচিত হইয়াছিল। পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকী-চরিত্রের স্বগত-উক্তিতে,

১ মধুস্মৃতি রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ সোম এই ঘটনাটিকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের 'মধ্যভাগে' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান আলোচনায় যে সকল পত্রের উল্লেখ আছে তাহা মধুস্মৃতি নামক কবিজীবনী ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর কবিজীবনী হইতে উল্লিখিত। যতীন্দ্রমোহনের পত্রাংশটি অনূদিত।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কলির স্বগত-উক্তিতে ও কলি-শচীর সংলাপে এই নূতন ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। উক্ত নাটকের পঞ্চম অঙ্ক শেষ গর্ভাঙ্কেও নারদের সংলাপে এই ছন্দের ব্যবহার ঘটিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, পদ্মাবতী নাটকের পূর্বে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সূচিত হইয়াছিল কিনা। পাইকপাড়ার অন্যতম ভূস্বামী মধুসূদনের গুণমুগ্ধ বিদ্যানুরাগী মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মধুসূদনকে লিখিত ৮ই মে (১৮৫৯) তারিখের পত্র হইতে জানা যায়, পদ্মাবতী নাটকের চতুর্থ অঙ্ক রচিত হইয়াছে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য তৃতীয় সর্গ পর্যন্ত প্রাপ্তির পর মধুসূদনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে নাটকে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে কিঞ্চিত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ আছে। ইহাতে তিনি লেখেন

"...ক্রমশ আমাদিগের নাট্যসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার দেখিলে আমি অতীব সন্তুষ্ট হইব। তবে আমার মনে হয়, ইহা যথেষ্ট সতর্কতা ও সুবিবেচনার সহিত করিতে হইবে। অনুভূতি যেখানে আবেগগর্ভ বা কোনো কাব্যিক ভাবের ক্ষেত্রে, সংক্ষিপ্ত এবং মসৃণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্তবক প্রবর্তিত করা যাইতে পারে—"

মনে হয়, যতীন্দ্রমোহনের এই উপদেশ অনুসারেই মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকের অংশবিশেষে এই নূতন ছন্দের প্রয়োগ পরীক্ষা ঘটান। সুতরাং ইহার পূর্বেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের হাতে ব্যবহার-যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার পূর্বে পদ্মাবতী নাটক রচনা করিয়া থাকিলে, তাহাতে উল্লিখিত এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ কেহ লক্ষ্য করেন নাই—ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমাদের অনুমান, শর্মিষ্ঠা নাটকের মহড়াকালে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার জন্য যতীন্দ্রমোহনের নিকট যে সদর্প-অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, (প্রৌঢ় বয়সে যোগীন্দ্রনাথ বসুকে ১লা ডিসেম্বর, ১৮৯১ তারিখে লিখিত একটি পত্রে যতীন্দ্রমোহন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং পত্রটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হইয়াছে) তাহার একমাত্র কারণ, মধুসূদন সেই সময়েই তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের কিয়দংশ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁহারও কোনো ধারণা ছিল না বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকার করেন নাই।

মহারাজ-কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি এই নমুনাটি উত্থাপিত করেন। প্রথমে এই কাব্যের দুই সর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার ৬ষ্ঠ পর্ব ৬৪।৬৫ খণ্ডে ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে (জুলাই-আগস্ট, ১৮৫৯) প্রকাশিত হয়। সুতরাং এপ্রিলের শেষে কিংবা মে মাসের সূচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম রচিত হইয়াছিল এবং প্রায় একই সময়ে পদ্মাবতী নাটকেও ইহার পরীক্ষা ঘটিয়াছিল। ঠিক এক বৎসর পরে ১৮৬০-এর মে মাসে তিলোত্তমসম্ভব কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ সালেব মধ্যেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যাপকভাবে নাটকে ব্যবহারের সংকল্প করেন এবং সুভদ্রা ও রিজিয়া নামক দুইটি নাটকের পরিকল্পনা করেন। কোন নাটকই অবশ্য শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। ১৮৫৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা যতীন্দ্রমোহনের পত্রে জানিতে পারি তিনি এই পরিকল্পিত নাটকদ্বয়ের অমিত্রাক্ষরে রচিত অংশবিশেষ পাইয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন এবং অমিত্রচ্ছন্দে নাটক রচনার ব্যাপারে পাইক-পাড়ার রাজাদের সহিত আলোচনার অঙ্গীকার করিতেছেন। অনেকে মনে করেন, রাজাদের উৎসাহহীনতাই অমিত্রচ্ছন্দে সম্পূর্ণ নাটক রচনায় মধুসূদনের নিরুদ্যম হইবার কারণ। বাহ্যিক কারণ যাহাই হউক না কেন, সম্ভবত মেঘনাদবধ কাব্য রচনার মধ্যে আত্মসমর্পিত হইবার জন্যই মধুসূদনের কবিপ্রাণ অন্য শাখা হইতে সাময়িকভাবে সরিয়া আসিয়াছিল। ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, একই ধরণের একাধিক রচনায় মনোনিবেশ করা মধু-প্রতিভার ধর্ম নহে। সম্পূর্ণ নূতন রীতির নূতন সৃষ্টিকর্মেই তাঁহার সৃজনশীলতা স্ফূর্তি অনুভব করিয়াছে এবং তাহা সমাপ্ত হইলে কবি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। অভিনবত্ব ও অদ্বিতীয় মৌলিকতাই মধুসূদনের প্রতিভার একক বৈশিষ্ট্য, পৌনঃপুনিকতায় তিনি কখনই আত্ম-সমর্পণ করেন নাই।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমালোচকবৃন্দ ও সাধারণ মধুসূদন-পাঠকের এই ধারণা আছে যে, মধুসূদন তাঁহার নব-প্রবর্তিত ছন্দের নাম দিয়াছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের এইরূপ নাম স্বয়ং কবি-কর্তৃক প্রদত্ত কিনা নিশ্চয়পূর্বক বলা যায় না। রচনাকালে ইহাকে বাঙলা Blank Verse রূপেই অভিহিত করা হইত—সম্ভবত প্রচলিত বাঙলা পয়ার ছন্দের সহিত ইহার দৃশ্যমান যে পার্থক্য অর্থাৎ মিলের বা মিত্রাক্ষরের অভাব, তাহাই কালক্রমে ইহার নাম

অমিত্রাক্ষর ছন্দ স্থিরীকৃত করিয়াছে।[১] বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রথম প্রকাশকালে রাজেন্দ্রলাল যে সম্পাদকীয় মন্তব্য যুক্ত করেন, তাহাতেও এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাম নাই, কেবল ইহাতে 'অন্ত্য যমকের পরিত্যাগ' করা হইয়াছে এইরূপ উল্লিখিত ছিল। যতীন্দ্রমোহনকে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য উৎসর্গ করিয়া মধুসূদন এই কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ যাহা লেখেন তাহাতেও ইহার ছন্দোগত বৈচিত্র্যের কথা আছে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর শব্দের সাক্ষাৎ নাই। কবি বলেন,

"যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল তদ্বিষয়ে আমার কোনো কথা বলাই বাহুল্য; কেননা, এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোনো সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষরস্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।"

কবিতার চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-রূপ শৃঙ্খল-মোচনই মধুসূদন-প্রবর্তিত এই নূতন ছন্দের প্রকৃতি—মধুসূদন-প্রদর্শিত এই সূত্র অনুসারেই অচিরকালের মধ্যে ইহার নূতন নামকরণ হইল অমিত্রাক্ষর ছন্দ। লক্ষ্য করিবার বিষয় কেবল কবিতা নহে, মিত্রাক্ষর স্বয়ং ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ-নিগড়, ইহা বলার মধ্যে কবিতা সম্পর্কে মধুসূদনের কী অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের প্রতি এই উদ্‌বেজিত নবপ্রবুদ্ধ শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব হইতেই মিত্রাক্ষর-হীন কবিতাকে অমিত্রাক্ষর বলা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদন স্বয়ং এই শব্দটি ব্যবহার করেন নাই, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

---

১ 'বাঙলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে ছন্দোবিদ্ অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য যে কেবল মিত্রাক্ষর-হীনতাই নহে, ইহা উপলব্ধি করিয়া এই ছন্দের গূঢ় প্রকৃতি অনুযায়ী ইহার নামকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন অমিতাক্ষর ছন্দ। ইহা কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারকে ক্রুদ্ধ করিয়াছে। তিনি 'শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই নামকরণের পক্ষে, সেই দুর্দান্ত ছন্দ-পণ্ডিত যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল ইহাই বোধগম্য হয় যে, মধুসূদন তো কেবল ছন্দটাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু ছন্দের যে নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই ছন্দোহীন, অর্থাৎ বেশ মোলায়েম নয়; অতএব ঐ নামটা আর একটু 'তানপ্রধান' করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।" মোহিতলালের এই কটূক্তি সত্ত্বেও প্রশ্ন, মধুসূদন স্বয়ং ইহার নাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ রাখেন, এই তথ্য মোহিতলাল কোথায় পাইলেন? অথচ একই গ্রন্থে তিনিই অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন, "অমিত্রাক্ষর" নামটিও এই ছন্দের একটি উপাধি মাত্র—চূড়ান্ত পরিচয় নয়।

তিলোত্তমাসম্ভব প্রথম দুই সর্গ প্রকাশ করিবার এক বৎসরকালের মধ্যেই এই নূতন ছন্দের বিস্তৃত আলোচনা ও বিশ্লেষণের সূচনা করিলেন রাজেন্দ্রলাল বিবিধার্থ-সংগ্রহের ৬ষ্ঠ পর্ব ৬৮তম খণ্ডে, ১৭৮২ শকাব্দ অগ্রহায়ণ মাসে। তাহাতেই 'অমিত্রাক্ষর' শব্দের প্রয়োগ দেখা গেল—

"এই অনুরোধেও অমিত্রাক্ষর কবিতার উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে··· কোনো কোনো সম্পাদকের বোধ হইয়াছে যে, অমিত্রাক্ষর কবিতারীতির ভেদ নাই···তিলোত্তমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পয়ার······" ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ইহার পূর্বেই ১২৬৭ সালের ২৩শে শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তিলোত্তমার ছন্দ সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন,

"বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে।···"

সুতরাং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয় যে, দ্বারকানাথই হয়ত সর্বপ্রথম 'অমিত্রাক্ষর' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন অথবা ইহাও হইতে পারে, সমসাময়িক পত্রিকায় অন্য কেহ এই বিশেষ নাম প্রয়োগ করেন। সে যাহাই হউক, মধুসূদন যে এইরূপ শব্দ প্রথম ব্যবহার করেন তাহার লিখিত প্রমাণ নাই।

এখন অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য কী এবং এই ছন্দের অভিনবত্ব সম্পর্কে সমালোচকবৃন্দ কী বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশিষ্টতা তাঁহার সমকালীন পাঠকদের কানে অনভ্যস্ত ঠেকিয়া ছিল এবং সমগ্র দেশে কবি ইহার জন্য বহুতর বিদ্রূপ-সমালোচনা-কটাক্ষ সহ্য করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলেও মধুসূদনের গুণগ্রাহী সাহিত্যরসিক কয়েকজন পাঠক-সমালোচকের নিকট ইহার সৌন্দর্য ও স্বতন্ত্রতা যথাযথই অনুভূত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহে অমিত্রাক্ষরের যে পরিচায়িকা লিখিয়াছিলেন, এই ছন্দ সম্পর্কে তাহার পর নতুন কিছু বলিবার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তব্য সংক্ষেপে এইগুলি—

১। কবিতায় ছন্দের প্রয়োজনীয়তা—"সাহিত্যিকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করেন; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে তাঁহাদের রসাত্মক বাক্যসকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবন্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে, রচনাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ বা

চরণে বিভক্ত করিয়া ঐ চরণে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়।...বর্ণ, যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলংকার-স্বরূপে কোন কোন ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়; কিন্তু তাহা ছন্দের অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত। অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই।"

২। অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগের স্বপক্ষে—"অনেক সহৃদয় ব্যক্তিরা দীর্ঘ-কাব্যপাঠে প্রতি চতুর্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণ-সুখকর না বলিয়া নিয়ত স্বর-সমানতা প্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন...অধিকন্তু পয়ার ছন্দে প্রতি চতুর্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সংকোচ হইয়া উঠে, কল্পনাশক্তি শব্দাভাবে ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয় এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারেন; যেস্থানে ইচ্ছা সেইস্থানে বাক্য শেষ করিতে পারেন; যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহারই গ্রহণ করিতে পারেন; কদাপি পাদ-পূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ, দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে, মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়।"

(৩) অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতিলক্ষণ—(ক) "কোনো কোনো সম্পাদকের বোধ হইয়াছে যে অমিত্রাক্ষর কবিতার যতির ভেদ নাই;... কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি; আমাদিগের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন"। (খ) "পরন্তু যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য"। (গ) "সামান্য পয়ারের ন্যায় ইহা পাঠ করিলে অর্থেরও অনুভব হইবেক না এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। যাঁহারা ইংরাজি ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা যে প্রকারে মিলটন কবিকৃত প্যারাডাইস লস্ট নামক কাব্যপাঠ করেন তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন"। (ঘ) "অন্যের

প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক্ যতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে সুখী হইতে পারিবেন।”

প্রসঙ্গত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুসূদনের মন্তব্যগুলিও স্মরণীয়। কবি একাধিকবার বলিয়াছেন যে, বারবার পড়িতে পড়িতে ইহার ছন্দ কর্ণে অনুভূত হইবে। বাঙলা সাহিত্যে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দই একদা প্রাধান্য লাভ করিবে এই বিষয়ে কবির কোনো সন্দেহ ছিল না। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মন্তব্য করেন যে, “দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস-দোষে হউক, আমাদের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ার-আদি ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক, কিন্তু পয়ার-আদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে উহার শোভা এককালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্যসৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যরচয়িতা তাহা নবাবতার করিলেন।”

মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই অমিত্রচ্ছন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইয়াছেন, যদিও রাজেন্দ্রলালের পর তাঁহার আলোচনায় কোনো অভিনবত্ব নাই এবং হেমচন্দ্র এই ছন্দের মর্মরহস্য অনুধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি বিরাম-যতি-সংস্থাপনের দোষ হিসাবে যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন সেইগুলি শ্রুতিদুষ্ট,[১]

১। হেমচন্দ্রের মন্তব্য—“বিরাম-যতি-সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে।”
যথা— “কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে
নীরবে—”
“নাচিছে নর্তকীবৃন্দ গাহিছে সুতানে
গায়ক—”
“হেনকালে হনূসহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে—”

অর্থাৎ ৮+৬ পয়ার-নির্দিষ্ট যতি রক্ষা করিয়াও অনিয়মিত ভাবযতি স্থাপনের যে অভিনবত্বে অমিত্রাক্ষরের নবজন্ম, তাহাই হেমচন্দ্রের নিকট শ্রুতিদুষ্ট। বস্তুত ইহার বৈশিষ্ট্য যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই, বৃত্রসংহারের অমিত্রাক্ষরের সহিত মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষরের তুলনা করিলেই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এইরূপ যুক্তি হাস্যকর মনে হইবে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বিরামযতি অনুসারে পদবিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদিচ্ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার ত্রিপদী চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্বত্রই একরূপ বিরামযতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙিয়া সকলের বিরামযতির নিয়ম একত্র নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোনো পংক্তিতে পয়ার ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দশ মাত্রার পরে, কোনোটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং কখনও বা এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে।"

এই শেষ চরণটির অন্তঃসারশূন্যতাই এই ছন্দ সম্পর্কে হেমচন্দ্রের গভীর অজ্ঞতার পরিচায়ক।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাফল্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিষ্ঠা বাঙলার আবহমানকাল-প্রচলিত পয়ার ছন্দের উপরই। পয়ারের চতুর্দশ অক্ষরে যে আট মাত্রা ও ছয় মাত্রার যতি-স্থাপনের রীতি তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মধুসূদনের সূক্ষ্ম শ্রুতি অমিত্রাক্ষরের বিপুল সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত মধ্যযুগীয় কাব্যের বাঁধাধরা পয়ারের এই অনিবার্য লক্ষণের মধ্যে নিহিত কাব্যের বৈজ্ঞানিক পর্ব-বিভাগকে মধুসূদন অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই পয়ারকে তিনি দুইটি ক্ষেত্রে মুক্তি দান করিলেন। প্রথমত, চরণের শেষে মিত্রাক্ষর বা অন্ত্য মিলের ব্যবহারকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং দ্বিতীয়ত, একই পংক্তিতে কাব্য সমাপ্ত না করিয়া ভাবস্বাধীনতা অনুযায়ী সেই বাক্যকে পরবর্তী পংক্তি পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। ইহাতে বিপ্লব ঘটিল অভাবনীয়। বাক্যের সম্প্রসারণে অর্থানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশের আগমন ঘটাতে এক প্রকার অর্থযতির অনিবার্যতা দেখা দিল এবং সেই নূতন অর্থযতি প্রচলিত আট-ছয়ের বৈজ্ঞানিক ছেদকে রক্ষা করিয়াও নূতন এক প্রকার ছন্দস্পন্দ বাজাইয়া তুলিল। ইহাতে চরণান্ত মিলের প্রত্যাশার অভাব পূর্ণ হইল, বাক্যের স্বাভাবিকতায় কবিতায়

নাটকীয়তা আসিল—তরঙ্গের উত্থান-পতনের মত চরণগুলি হৃৎস্পন্দনে দ্রুততর হইল। অথচ পংক্তির মোট অক্ষরসংখ্যা কোথাও সনাতন রীতি লঙ্ঘন করিল না, অন্তর্নিহিত পর্ববন্ধনকে কোথাও অস্বীকার করিল না। প্রচলিত মিত্রাক্ষরই যেন চরণকে এতকাল শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই নিগড় খুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা ময়ূরের মত কলাপ বিস্তার করিল—নৃত্যে সংগীতে উল্লাসে কল্লোলিত হইল। তিলোত্তমাসম্ভবের প্রথম কয়েক চরণের উদাহরণ দেওয়া যাক—

ধবল নামেতে গিরি/হিমাদ্রির শিরে—+
অভ্রভেদী,+দেবআত্মা,+/ভীষণ-দর্শন ;+
সতত ধবলাকৃতি,+/অচল,+অটল ;+
যেন ঊর্ধ্ববাহু সদা,+/শুভ্র বেশ-ধারী,+
নিমগ্ন তপঃসাগরে/ব্যোমকেশ শূলী—+
যোগীকুলধ্যেয় যোগী !/

এই চরণগুলির প্রথম 'ধবল' শব্দ হইতে ষষ্ঠ পংক্তির 'যোগী' পর্যন্ত একটিই বাক্য ভাবানুযায়ী প্রসারিত—কোথাও চরণের সীমাবদ্ধতায় খণ্ডিত হইবার প্রয়োজন ঘটে নাই। প্রচলিত আট-ছয়ের পর্ব-যতি ব্যতীত অর্থের দিক দিয়া পাঠককে একাধিকবার বিরাম-শ্বাস গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে + চিহ্নিত অংশে। তথাপি ইহার চরণগুলি এক হিসাবে পূর্ববর্তী পয়ার-চরণের মতই সীমাবদ্ধ—যেন এখনও এখানে কবির সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটে নাই। সে মুক্তি ঘটিল পরিপূর্ণভাবে মেঘনাদবধ কাব্যে—

সম্মুখ-সমরে পড়ি/বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু,+চলি যবে/গেলা যমপুরে
অকালে,+কহ,+হে দেবি/অমৃতভাষিণি,+
কোন্ বীরবরে বরি/সেনাপতি পদে,+
পাঠাইলা রণে পুনঃ/রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?+/

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তি পয়ার—অর্থাৎ পয়ারের প্রচলিত আট-ছয় মাত্রা বিভাগ এখানে বজায় থাকিবে। কিন্তু বাক্যের স্বাভাবিক প্রবণতায়, অর্থ-যতির যত্র তত্র স্থাপনে সেই আট-ছয়কে বিস্মৃত করিয়া তোলাই যেন এই

ছন্দের একমাত্র সার্থকতা—ইহাতেই এই ছন্দের দীর্ঘায়ুত্ব, ইহাই অমিত্রাক্ষরের দুরন্ত দুঃসাহস। তাই শ্রুতির নিকট ইহার আবেদন হইল এইরূপ—

সম্মুখ-সমরে পড়ি
বীর-চূড়ামণি বীরবাহু,
চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে,
কহ,
হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে
পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি ?

পাঠের বৈচিত্র্যে অন্য কাহারও নিকট ইহার ইতস্তত পার্থক্য ঘটিতে পারে, কিন্তু মোটামুটি এই হইল বাহিরের দিক হইতে অমিত্রাক্ষরের প্রকৃতি। মিত্রাক্ষর এই জাতীয় ছন্দে কত অবান্তর তাহার প্রমাণ দীননাথ সান্যাল দিয়াছেন; তিনি এই বক্ষ্যমাণ চরণগুলিকে মিত্রাক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া দেখাইয়াছেন, অন্ত্যানুপ্রাসই চরণকে বন্দী করিয়া রাখে, উহার অবসানেই চরণ চরণান্তরে ইচ্ছামত প্রবাহিত হইয়া ভাব-অভীপ্সাকে দীর্ঘতর ও অনন্ত করিয়া তোলে।[১]

দীননাথ সান্যাল অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাফল্য বিষয়ে চারিটি সূত্র নির্দেশ

---

১ সম্মুখসমরে পড়ি বীরবাহু ধীর
অকালেতে যবে গেলা যমের মন্দির,
কহ, দেবী অমৃতভাষিণী সরস্বতী—
কোন্ রক্ষোবীরবরে করি সেনাপতি
রাক্ষসাধিপতি পুনঃ পাঠাইলা রণে,
অমর ব্রহ্মার বরে হেন পুত্র-ধনে—
কহ, কি কৌশলে তারে মারিয়া লক্ষ্মণ,
নিঃশঙ্কিলা দেবেন্দ্রের সশঙ্কিত মন ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি,
আবার ডাকিছে তোমা, হে মাতঃ ভারতি—
বাল্মীকি মুনিরে দয়া করিলা যেমতি,
রসনায় বসি তাঁর পদ্মাসন পাতি,
—যবে ক্রৌঞ্চবধূ সহ তমসার তীরে,
ত্যজিলা পরাণ ক্রৌঞ্চ নিষাদের তীরে,
তেমতি দাসের প্রতি দয়া কর সতী,
তব পদাম্বুজ-যুগে এ মম মিনতি ॥

দ্রঃ দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা।

করিয়াছিলেন। প্রথম, যতির খাতিরে কবি কোথাও বাক্যের সংকোচ করেন নাই। দ্বিতীয়, অদ্বিতীয় শব্দ-সম্পদে নামধাতুর অকৃপণ ব্যবহারে রসোপযোগী শব্দ-প্রয়োগে ইহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়, ইহার বাক্য-বিন্যাস গদ্যের মতই এবং চতুর্থ, কবি সংযতভাবে অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া এই ছন্দের আভ্যন্তর সৌন্দর্য পরিস্ফুট করিয়াছেন।

কবি মোহিতলাল অমিত্রাক্ষরের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে এই ছন্দের বাহ্য লক্ষণ তিনটি—

(ক) চরণ হিসাবে উহা সেই পুরাতন পয়ার

(খ) উহাতে মিল নাই এবং

(গ) ৮+৬-এর সেই যতি ছাড়াও ইহার নিজস্ব এক প্রকার যতি আছে। কিন্তু এইগুলি বাহিরের স্বরূপ মাত্র—এই ছন্দের অন্তর্নিহিত প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য মোহিতলালের মতে rhythm বা ছন্দস্পন্দ তাহার পর 'ছন্দ-যতি'। লঘু-গুরু হ্রস্ব-দীর্ঘ অক্ষর-সমাবেশে, অনুপ্রাসে-গাম্ভীর্যে এই পদের মধ্যে যে এক প্রকার হিল্লোল শ্রুতিগোচর ও অনুভূত হয় তাহাই মোহিতলাল-প্রচারিত ছন্দস্পন্দ, কিন্তু ইহা ঠিক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায় না। বিরাম-যতি ছাড়াও মধুসূদন যে নানাভাবে 'ছন্দ-যতি'র পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাও সত্য।[১] মোহিতলাল অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে আর একটি বিশেষত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন, verse paragraph, ইহা সুচিন্তিত। তাঁহার মতে, "এই verse paragraph-এর আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে; কিন্তু ইহা তিনটি বা চারিটি পংক্তির ব্যাপার নয়। স্বল্প ও দীর্ঘ-বিরামযুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার—বা সংগীত-সংগতির সহায়ে, একটি ভাব, একটি চিত্র, বা একটি ব্যাখ্যান যে পূর্ণ ছন্দোরূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের পংক্তিব্যূহ। এ যেন ছন্দের এক একটি সৌরমণ্ডল—প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গতি যেমন আছে, তেমনি সকলে এক একটি এক-কেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সংগতি রক্ষা করিয়া থাকে।"

অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে সর্বপ্রধান কথা, ইহা মহাকাব্যের উপযোগী ছন্দ।

১ "So many fellows have of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 10th, 11th and 12th."—মধুসূদনের পত্রাংশ।

এরিস্টটল বলিয়াছিলেন, Nature herself teaches the choice of the proper measure অর্থাৎ প্রকৃতির নিজস্ব প্রয়োজনেই উপযুক্ত ছন্দ উদ্‌ভাবিত হয়। তাই ট্রোকাইক বা আয়াম্বিক নৃত্য বা ক্রিয়াদ্যোতক ছন্দের বদলে মহাকাব্যে heroic measure-এর গাম্ভীর্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মধুসূদন-প্রবর্তিত এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম সেই ধ্রুপদী কাব্যরীতির যথাযথ বাহন হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদন যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া সেই ছন্দই সমিল প্রবাহমান পয়ারে পরিণত হইয়াছে—কালক্রমে গাম্ভীর্যপূর্ণ মহাকাব্যিক রীতি হইতে ললিত-মধুর কবিতাতেও তাহা সার্থকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক উভয়বিধ কাব্যাদর্শের পক্ষেই এই ছন্দ তাহার অসীম গ্রহণ-যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের গম্ভীর রণকোলাহল, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য-বর্ণনা, বীরাঙ্গনা কাব্যের মনস্তাত্ত্বিক নাটকীয়তা এই একটি মাত্র ছন্দে বিচিত্রভাবে উৎসারিত হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই সাফল্যের মূলে মিত্রাক্ষরহীনতা বা ভাব-যতি-স্থাপনের বৈশিষ্ট্য—যাহাই বলা হউক না কেন, আমাদের মনে হয়, বাগ্‌ভঙ্গির স্বাভাবিকত্ব-রক্ষাই এই ছন্দের মূল রহস্য—ইহাই মধুসূদন মিলটনের 'ব্ল্যাংক ভার্স' হইতে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ব্যবহারিক বা সাহিত্যিক গদ্যরীতিকে কবিতার ছন্দে সমর্পিত করিয়া কবি ছন্দে যে বিস্ময়কর প্রসারণশীলতা ঘটাইয়াছেন, তাহা সর্ববিধ ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে—মঞ্জরীর কানে অলির মৃদু গুঞ্জরণ হইতে স্তনিত সমুদ্রের কল্লোল এই ছন্দে আপন ভাষা পাইয়াছে। চরণে চরণে অলংকার লতাইয়া উঠিয়াছে, নিসর্গ-সৌন্দর্য-বর্ণনায়, সংলাপ-প্রয়োগে কবি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন একমাত্র ঐ বাগ্‌ভঙ্গির স্বাভাবিকতার জন্যই। ইহার সহিত অনুপ্রাস-যমক-নামধাতুর মুহুর্মুহু প্রয়োগ, যুক্তাক্ষর-বহুল তৎসম শব্দের প্রভূত ব্যবহার, স্তবক-সম্পর্কে বিধিনিষেধের অভাব—ইহারাও অমিত্রাক্ষরকে আশ্চর্য গতিদান করিয়াছে।

সংক্ষেপে ইহাই মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে বিস্তৃত কাব্য-সমালোচনার খশড়া। বাকি আলোচনা কাব্যশেষে সাধারণ আলোচনা-অংশে পাওয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী কলেজ
জন্মাষ্টমী, ১৩৭৩

শ্রীঅরুণকুমার বসু

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,

বরি—বরণ করিয়া। রাঘবারি—রাবণ।

রাক্ষসভরসা—রাক্ষসদিগের ত্রাণকর্তা ও প্রতিপালক অর্থে মেঘনাদের [বি]শেষণ, হোমারের Hope of Troy-এর অনুরূপ ব্যবহার।

ঊর্মিলাবিলাসী—ঊর্মিলার প্রিয়জন অর্থাৎ লক্ষ্মণ।

নিঃশঙ্কিলা—ভয়শূন্য করিলেন।

বাল্মীকির রসনায়—সরস্বতী বাগ্দেবী বলিয়া কবির রসনাই তাঁহার বাগ্‌যন্ত্র।

যেমতি মাতঃ…বিধিলা—রামায়ণে বাল্মীকির কবিত্বলাভের যে ঘটনা [আ]ছে, এখানে তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তমসা তীরে একদিন [বন]ান্তরালস্থিত কূজনরত ক্রৌঞ্চের প্রতি জনৈক ব্যাধের শরসন্ধানে যথন রক্তাক্ত [ক্রৌঞ্]চ বিহঙ্গ ভূতলে পতিত হইল এবং শোকার্ত ক্রৌঞ্চী আর্তকণ্ঠে চক্রাকারে [উ]ড়িতে লাগিল, তখন স্নানান্তে সেই করুণ দৃশ্য দেখিয়া বাল্মীকি ব্যথিত চিত্তে [স]হসা 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। ইহাকেই [বা]ল্মীকির কণ্ঠে সরস্বতীর আবির্ভাব বলিয়া কবিরা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি!
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
২০ হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
৩০ কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা

নরাধম···চৌর্যে রত—কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনী অনুযায়ী বাল্মীকি পূর্বজীবনে দস্যুবৃত্তি করিতেন।

রত্নাকর—বাল্মীকির পূর্বনাম, দ্বিতীয় অর্থ সমুদ্র।

উর—আবির্ভূতা হও, অবতীর্ণা হও।

মধুকরী কল্পনা—ভ্রমরের মত কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু-আহরণকারিণী বলি কল্পনা মধুকরী।

মধুচক্র—মৌচাক, কাব্যসুধাসংগ্রহ; মধুসূদনের নামের ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা এখানে স্মরণীয়। বলী—বলশালী। হেমকূট—পর্বতের নাম।

তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
৪০ শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে !
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
৫০ চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা,
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে !
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি ! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলীলহরী, মরি ! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে !
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি

:—নাগরাজ বাসুকি। ঝলি—ঝলমল করিয়া।
ব্রতালয়ে—উৎসবালয়ে। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।
রতনসম্ভবা বিভা—রত্নসমূহ হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতি।
দৌবারিক—দ্বাররক্ষক। শূলপাণি—শূলধারী মহাদেব।

৬০ ময়, মণিময় সভা; ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে ?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
৭০ ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
এক মাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল-তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয় ! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে ! কতক্ষণে চেতনা পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ,—
৮০ "নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে

ময়—এক মায়াবী দানব, পৌরব অর্থাৎ পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণকারী।

তিতিয়া—সিক্ত করিয়া।

ভগ্নদূত—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রক্ষা পাইয়া যে পরাজয় সংবাদ জানায়।

যক্ষপতি—কুবের।

নৈকষেয়—সুমালী রাক্ষসের কন্যা নিকষার পুত্র বলিয়া রাবণ নৈকষেয়।

ঘন—মেঘ। অমরবৃন্দ—দেবকুল।

কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল-কুল-মান এ কাল-সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে

শাল্মলী—শিমুল। কাল—মৃত্যুরূপী। কালকূট—বিষ। ভুজগ—সর্প।

১১০ শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ ; হায় রে, মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
১২০ কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে,—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে।
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
১৩০ উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি,—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ

দেউটী—প্রদীপ। রবাব—বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। মুরজ—মৃদঙ্গ।
সঞ্জয়—সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করিতেন।
সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ—বিজ্ঞপ্রধান মন্ত্রী।
অভ্রভেদী—গগনস্পর্শী। ভূধর—পর্বত

অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
১৪০ আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত,—"হায় লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুংকারে!
১৫০ শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে;
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টংকারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ংকর!—

কুবলয়ধন—নীলপদ্মরূপ অমূল্য রত্ন অর্থাৎ রাবণের পুত্রকে বুঝানো হইতেছে।

অমর-ত্রাস—যে দেবগণ মৃত্যুঞ্জয়, তাহাদের নিকটও ভীতিপ্রদ অর্থাৎ রাক্ষস; এখানে বীরবাহু।

মদকল—প্রাপ্তবয়স্ক হস্তীর মত্ততাজনিত স্বেদই 'মদ', সেই মদ-নির্গমে অস্ফুট-শব্দকারীকে বলে মদকল। করী—হস্তী। বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ।

অরিদল—শত্রুদল। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। জলধি—সমুদ্র।

কোদণ্ড-টংকারে—ধনুকের জ্যা-আকর্ষণের শব্দে।

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
১৬০ গগনে; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা, বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এই রূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত",—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
১৭০ ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর,—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে
১৮০ কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে

যূথনাথ—দলপতি। ঘনাকারে—মেঘসম। কলম্বকুল—তীরবৃন্দ।
অম্বর—আকাশ। যুঝিলা—যুদ্ধ করিল। বাসবের চাপ যথা—ইন্দ্রধনুর ন্যায়।
সন্দেশবহ—দূত। বিলাপী—বিলাপকারী। আত্মজ—পুত্র। হর্যক্ষ—সিংহ।

কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
১৯০ কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলংকার বীরবাহুসহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।”
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে-বিষাদে
কহিলা,—“সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল-ফণী,
২০০ কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল- দেখি জুড়াই নয়নে।”
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন

দ্বন্দ্বি—যুদ্ধ করিয়া। চর্ম—ঢাল। কম্বু—শঙ্খ।
অম্বুরাশি—সমুদ্র। রিপু-প্রহরণে—শত্রুর অস্ত্রাঘাতে।
পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা—পৃষ্ঠে অস্ত্রচিহ্নের অভাব সম্মুখযুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শনের নিশ্চিত প্রমাণ, পলায়নের সাক্ষ্য নহে। সাবাসি—বীরত্বের প্রশংসা করি।

অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে
২১০ কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা,
তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষুঃ-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ-রতন-পূর্ণ, এ জগতে যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
২২০ বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে

অংশুমালী—কিরণভূষিত।

কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চচূড় প্রাসাদগুলি যে লঙ্কার শিরোভূষণ।

হেমহর্ম্ম্য—স্বর্ণ-অট্টালিকা। উৎস রজঃছটা—জলনিঃসরণ যন্ত্র হইতে রৌপ্যধারা তুল্য বারি নির্গত হইতেছে। রজঃ মূল অর্থ ধূলিকণা।

বিপণি—পণ্যগৃহ। অচল—পর্বত। শৃঙ্গধর—পর্বত।

বৈদেহীহর—সীতাপহারক রাবণ।

থানা দিয়া—প্রহরারত থাকিয়া।

বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
২৩০ কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ ! দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনূ,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
২৪০ গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে।

নীল—বানর সেনাপতি, অগ্নির অংশে ইহার জন্ম।
অঙ্গদ—বালির পুত্র, কিষ্কিন্ধার যুবরাজ। করভ—হস্তীর শাবক।
কঞ্চুক—সাপের খোলস। হিমান্তে—শীতের শেষে।
অহি—সর্প। লুলি—সঞ্চালন করিয়া।
অবলেপে—সদর্পে। দাশরথি—রামচন্দ্র। কৌমুদী—জ্যোৎস্না।
প্রসরণে—বেষ্টনে। কেশরিকামিনী—স্ত্রীসিংহ। শিবাকুল—শৃগালসমূহ।
পাকশাট মারি—পক্ষ-আস্ফোটন-পূর্বক আঘাত করিয়া

২৫০ পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে ! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ-দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
২৬০ পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে !
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়

কুঞ্জরপুঞ্জ—হস্তিবৃন্দ। নিষাদী—গজারোহী সেনাবাহিনী।
সাদী—অশ্বারোহী সৈন্যদল।
শূলী—শূলধারী সৈনিক, পদাতিক গোষ্ঠীভুক্ত।
ভিন্দিপাল—ক্ষেপনাস্ত্র বিশেষ, কুন্তক।
মুদ্গর—গদা বা মুগুর জাতীয় অস্ত্র।
পরশু—কুঠার। শীর্ষক—উষ্ণীষ, মস্তকাবরণ বিশেষ।
বীর-আভরণ—যে সকল যুদ্ধাস্ত্র রণকুশলীর দেহে অলংকরণ স্বরূপ শোভা পায়।
যন্ত্রিদল—জয়সূচক রণদামামা দুন্দুভি ইত্যাদি বাদ্যভাণ্ড সমারোহে যাহারা যোদ্ধপক্ষের পুরোভাগে যায়।
হৈমধ্বজ—বিজয়-প্রতিষ্ঠাসূচক স্বুবর্ণ-নির্মিত পতাকা।
যম-দণ্ডাঘাতে—অর্থাৎ মৃত্যুরাজ্যের চরম নির্দেশে।
ধ্বজবহ—পতাকাধারী। রিপুচয়—শত্রুদল।

ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ,—
২৭০ "যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
২৮০ পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরি!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,

কালপৃষ্ঠধারী—কালপৃষ্ঠ নামক ধনুর অধিকারী অর্থাৎ কর্ণ।
এড়িলা—ত্যাগ করিলেন।
একঘ্নী—ইন্দ্রপ্রদত্ত কর্ণের সেই মারাত্মক অস্ত্র, যাহা অর্জুনের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট ছিল কিন্তু দুর্যোধনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।
দলিয়া—দলন করিয়া।
মকরালয়—মকরাদি জলজন্তুর আশ্রয় অর্থাৎ সমুদ্র।

২৯০ ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে
অপূর্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধুপানে চাহি,—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
৩০০ তুমি ? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ; এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
৩১০ কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,

বীরকুলর্ষভ—বীরকুল-শ্রেষ্ঠ। প্রচেতঃ—সমুদ্রের সম্বোধন।
প্রভঞ্জনবৈরী—সমুদ্রকে পবনের শত্রুরূপে গণ্য করা গ্রীক পুরাণানুমোদিত।
নিগড়—শৃঙ্খল। কেশরীর—সিংহের
বীতংস—মৃগ বা পক্ষী-বন্ধনের রজ্জু।
কৌস্তুভ—কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ। জাঙাল— সেতু, বাঁধ

ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
৩২০ মহামতি পাত্রমিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন সুশোভিনী
৩৩০ লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল-ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।

বারীন্দ্র—জলপতি, সমুদ্র
সুর-সুন্দরী—বিদ্যুৎ। আসার—বৃষ্টিধারা।
জীমূত-মন্দ্র—মেঘধ্বনি।

৩৪০ ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্রমিত্র সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে,—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
৩৫০ তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখি। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা, তবে দশানন বলী,—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষা জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
৩৬০ আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা

তিতি—ভিজিয়া। কিঙ্করী—দাসী। নিষ্কোষিলা—কোষমুক্ত করিল।

গ্রহদোষে…নিন্দে—রাবণের অশেষ দুর্দশা ও সর্বনাশ কোনো স্বকৃত অপরাধের ফল নহে, ইহা কোনও দুর্জ্ঞেয় দুরদৃষ্টজনিত প্রতিক্রিয়া বলিয়া রাবণের মনে হইয়াছে।

নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল। বরজ—পানের ক্ষেত। বারুই—বারুজীবী।

মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
৮৭০ প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ, শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি,—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
৮৮০ দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা,—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।

শিমুলশিম্বী—শিম্বী শিম গাছ, এখানে শিমুল ফল অর্থে শিমুলশিম্বী প্রযুক্ত
নীরবিলা—নীরব হইল।
বীরপ্রসূন—বীরবৃন্দের মধ্যে পুষ্পসদৃশ।
প্রসূ—জননী।

৩৯০ কিন্তু ভেবে দেখ নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
৪০০ কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ! হায় নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !”
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সু-কনকাসন, উঠিলা গর্জিয়া
৪১০ রাঘবারি। “এতদিনে”, কহিলা ভূপতি,
“বীরশূন্য লঙ্কা মম ! এ কাল-সমরে
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !

দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত—দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রও যাহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত।

প্রহারয়ে—প্রহার করে।

কাকোদর—সর্প।

দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
৩২০ সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পুরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক-শিরে, ভাস্বর-পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।

অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি—রাবণ অথবা রামচন্দ্র, ইহাদের যে-কোনও একজনের অস্তিত্ব অথবা বিলুপ্তির দ্বারা সংগ্রামের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। মন্তব্যটি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রামচন্দ্রের মুখে ব্যবহৃত 'অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ'-র অনুরূপ।

দুন্দুভি—সমর-প্রস্তুতি-সূচক রণবাদ্য। কর্ব্বুরবৃন্দ—রাক্ষসগণ।

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস—দেবতা দৈত্য মনুষ্য তিন লোকের অধিবাসী সকলের নিকটই ভীতিস্বরূপ যে রাক্ষসগণ।

বারী—হস্তী-বন্ধন স্থল, হস্তিশালা। বারণযূথ—গজ-সমূহ।

মন্দুরা—অশ্বশালা। বাজিরাজী—অশ্বসমূহ। মুখস্—অশ্বের মুখবন্ধনী।

রড়ে—দ্রুতবেগে। পদাতিকব্রজ—পদাতিক সৈন্যবাহিনী।

কনক-শিরস্ক—স্বর্ণনির্মিত শিরস্ত্রাণ।

ভাস্বর-পিধানে অসিবর—দীপ্তিময় কোষে তরবারি। চর্ম—লৌহাবরণ।

আয়সী-আবৃত—লৌহবর্মাচ্ছাদিত।

আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
৪৪০ রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হ্রেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;
কোদণ্ড-টংকার সহ অসির ঝঞ্ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে !
টলিল কনক-লঙ্কা বীরপদভরে ;—
গর্জিলা বারীশ রোষে ! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
৪৫০ কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি

নিষাদী - হস্তিচালক।
যথা মেঘবরাসনে বজ্রপাণি—বৃহৎ মেঘবাহনে আরূঢ় ইন্দ্রের ন্যায়।
সাদী—অশ্বারোহী। ভিন্দিপাল—ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ। পরশু—কুঠার।
ধ্বজধর—পতাকাবাহী। কেতনবর—সুদৃশ্য পতাকা।
হয়ব্যূহ—সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী।
হ্রেষিল—অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করিল।
কোদণ্ড-টংকার—ধনুর জ্যানির্ঘোষের শব্দ। বারীশ—সমুদ্র।
বারুণী—বরুণ অর্থাৎ জলাধিপতির স্ত্রী, মধুসূদনের মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি।
আরাব—ধ্বনি।

মধুস্বরে ;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
৬০ বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব,—'অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা' ;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে,—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
৭০ তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ,—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।

জলেশ পাশী—পাশ-অস্ত্রযুক্ত জলদলপতি সমুদ্র। প্রভঞ্জন—ঝড়।
লাঘবিতে—হ্রাস করিতে। বৈদেহী—সীতা। বিগ্রহ—যুদ্ধ।

এই স্বর্ণ কমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
৪৮০ রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
৪৯০ জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণ পাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ-উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
৫০০ দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!

চটুলা—চঞ্চলা। সফরী—মৎস্য বিশেষ।
বিভাবসু—সূর্য। উতরিলা—উপনীত হইল।
কেশব-বাসনা—বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীদেবী।
ধনদ—কুবের। দেউল—দেবকুল, মন্দির।
খদ্যোতিকাদ্যোতি—জোনাকির দীপ্তি।

ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা।
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে ?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
৫১০ মুরলা, প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা,—
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব ? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম ? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে ?
রমার আশার বাস হরির উরসে ;—
৫২০ হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে !
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী ?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী,—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটী, সতি, ফুটেছিল সুখে

ইন্দিরা—লক্ষ্মী।
প্রভাতয়ে—প্রভাত হয়
উরসে—বক্ষঃস্থলে।

যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
৫৩০ বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না,—"হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
৫৪০ অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী।"
স্বধিলা মুরলা,—"কহ শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী,—
"না জানি কে সাজে আজি। চল, লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
৫৫০ এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে

পাশি-প্রণয়িনী—বারুণী।
যাদঃ-পতি-রোধঃ—সমুদ্রের তট।
চলোর্মি—চঞ্চল তরঙ্গ।
ভূধর—পর্বত। অকম্পন—অন্যতম রক্ষঃ-সেনাপতি।
অতিকায়—রাবণের এক পুত্র।

দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগর-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
৫৬০ অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কালদণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্বণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে,—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
৫৭০ আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না,—
"হায়, সখি, বীরশূন্য স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী!

দুকূল-বসনা—পট্টবস্ত্র-পরিহিতা। কাঞ্চী—মেখলা, কটিভূষণ।
চক্রনেমি—চক্রপরিধি। দন্তী—হস্তী।
দণ্ডধর—যম। বরিষয়ে—বর্ষণ করে।
কুসুম-আসার—পুষ্পবৃষ্টি। স্বরীশ্বর—ইন্দ্র।

মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
৫৮০ ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর, দুর্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত, কত আর কব?
৫৯০ শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী,—"কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল-সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী,—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
৬০০ যুবরাজ, নাহি জানে হত আজি রণে
বীরবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে,

প্রক্ষেড়নধারী—লৌহময় ক্ষেপণাস্ত্রধারী।
কালনেমি—রাবণের মাতুল। তালজঙ্ঘা—রাক্ষসবিশেষ।
বৈশ্বানর—অগ্নি। তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ—সুউচ্চ বৃক্ষসমূহ।
হর্যক্ষ—সিংহ।

মুরলে! কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণ-লঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল আসনে যথা বসেন বারুণী
৬১০ মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।”
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জুকুঞ্জবনে!
উতরি জলধি-কূলে পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বুরাশি। হেথা কেশব-বাসনা
৬২০ পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃকুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কতক্ষণে উতরিলা হৃষিকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী

সমলা—মালিন্যযুক্ত।
প্রাক্তন—পূর্বজন্মকৃত কর্মফল, অদৃষ্ট বা নিয়তি অর্থে মধুসূদন কর্তৃক ব্যবহৃত।
শিখণ্ডিনী—ময়ূরী। আখণ্ডল-ধনু—ইন্দ্রের ধনু।
কেশব-বাসনা—লক্ষ্মীদেবী যিনি নারায়ণের প্রিয়া।
হৃষিকেশ প্রিয়া—হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি বলিয়া বিষ্ণুর অন্যতম নাম হৃষিকেশ, তাঁহার প্রিয়া অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী।

ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
৬৩০ বিকশিছে ফুলকুল; মর্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী স্বর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা স্বর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে!
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে
রত্নরাজী, তূণে শর, মনিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি স্বর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
৬৪০ তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন-যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা

বৈজয়ন্ত—স্বর্গস্থ ইন্দ্রধাম। অলিন্দ—চত্বর। বাসন্তানিল—বসন্তকালের বায়ু। শরাসন—ধনুঃ। হীরাচূড়—হীরকখচিত শীর্ষ। নিষঙ্গ—তূণীর। উচ্চ কুচ-যুগোপরি স্বর্ণ কবচ—রাক্ষস যুবতীগণের সুপুষ্ট বক্ষের উপর দোদুল্যমান কবচতুল্য স্বর্ণালংকার।

কিন্তু খরতর আয়ত-লোচনে শর—রাক্ষসবালাদের শৌরপরাক্রমের সহিত অনিন্দ্য যৌবনের পুনঃপুনঃ উল্লেখ লক্ষণীয়। তাহাদের পৃষ্ঠসংলগ্ন তূণে নিহিত বাণের তীক্ষ্ণতা অবিসংবাদিত, কিন্তু তাহাদের বিকচ দৃষ্টির রমণীয় কটাক্ষ আরও তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেও তাহাদের যৌবন-সৌন্দর্যের আভাই কবিকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছে।

নবীন যৌবন-মদে মত্ত—রম্যলঙ্কার পুরসুন্দরীগণ সকলেই নবযৌবন-প্রাপ্ত, তাহাদের গতি ও চাঞ্চল্যে ইহা সহজেই অনুভূত হইতেছে।

মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে ; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী ;
সংগীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারিদিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর-সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
৬৫০ দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারুকূলে !
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
৬৬০ এ ভবনে ? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা,—"হায় ! পুত্র. কি আর কহিব,
কনক-লঙ্কার দশা ! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী !

কাঞ্চী—ধাতব কটিবন্ধ। শিঞ্জিত—অলংকার ধ্বনি।

রজনীনাথ বিহারেন···দলে লয়ে—নক্ষত্রসমূহ লইয়া চন্দ্রের আকাশ পরিক্রমার ন্যায়। অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্র দক্ষ প্রজাপতির কন্যা।

ভানুসুত—যমুনার বিশেষণ ; সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে যমী বা যমুনা যমের সহিত যমজরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

বিশদ-বসনা—শ্বেত-বস্ত্র-পরিহিতা।

অম্বুরাশি-সুতা—লক্ষ্মীদেবী যিনি সমুদ্র-মন্থনে উত্থিতা।

তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া,—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
৬৭০ রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা,—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল-সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
৬৮০ মেঘনাদ; ফেলাইয়া কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণ-লঙ্কা, হেথা আমি বামাদল-মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ! আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে!"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,

বৈরিদলে—শত্রুবাহিনীর প্রতি।

রত্নাকর-রত্নোত্তমা—সমুদ্র-মন্থনে যে সকল রত্ন উত্থিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী। বেড়ে—বেষ্টন করে।

রথীন্দ্রর্ষভ—রথিবরশ্রেষ্ঠ। বীর আভরণে—যোদ্ধসুলভ সজ্জা ও অলংকারে।

৬৯০ হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর; কিংবা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরংগম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে),
৭০০ কহিলা কাঁদিয়া ধনী,—"কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
৭১০ বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"

হৈমবতীসুত—কার্তিকেয়। কিরীটী—অর্জুন।
ইন্দ্রচাপ—ইন্দ্রধনু। তুরংগম বেগে—অশ্বের গতিতে।
আশুগতি—দ্রুতবেগে, বায়ুর ন্যায়। তরু-কুলেশ্বর—বৃহৎ বৃক্ষ।
ব্রততী—লতা। করি-পদ—হস্তীর চরণ।
কিঙ্করী—দাসী

উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক শৈল, অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টংকারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘমাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি।
১২০ সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;—
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হ্রেষে অশ্ব; হুংকারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌষিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা! হেনকালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিল কর্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা,—"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
১৩০ রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি।
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

মৈনাক—হিমাবত ও মেনকার পুত্র, পক্ষযুক্ত পর্বত। ইন্দ্র একদা সক্রোধে ইহার পক্ষচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে পবনদেবের সাহায্যে সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া মৈনাক পরিত্রাণ লাভ করেন।

শিঞ্জিনী—ধনুর্গুণ। আকর্ষি—আকর্ষণ করিয়া।

পক্ষীন্দ্র—পক্ষীশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ গরুড়।

কৌষিক-ধ্বজ—রেশমনির্মিত পতাকা, স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যসূচক।

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা—স্বর্ণনির্মিত বর্মের দীপ্তি।

কর্বুরদল—রাক্ষসবৃন্দ। পামর—নরাধম।

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি,—
রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস ; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু,—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
৫০ দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে !"
কহিলা রক্ষসপতি,—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি !
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ;

অসুরারি-রিপু—অসুরের অরি অর্থাৎ শত্রু ইন্দ্র, ইন্দ্রের শত্রু মেঘনাদ।
ডরাও—ভয় কর। ঘুষিবে—ঘোষিত হইবে।
মেঘবাহন—ইন্দ্র। রুষিবেন—রুষ্ট হইবেন।
দেখ অস্তাচলগামী দিননাথ এবে—রামবিজয়-উদ্যোগী মেঘনাদকে রাবণের [অভি]ষেক-ক্রিয়ার মধ্যে যে আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত এই দিনাবসানটি তাহারই [স]ংকেত-সূচক।

১৬০ প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে,
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে,—"নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
১৭০ প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী !
উঠ রাণি, দেখ ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল ! দেখ, তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম !
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র-কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে !
ধন্য রানী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয় ! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি !
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
১৮০ কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে

গঙ্গোদক—লঙ্কায় গঙ্গা প্রবাহিত নহে, তথাপি অভিষেক-কর্মে পবিত্র গঙ্গাবারির ব্যবহার নির্দেশ করায় হিন্দুর শাস্ত্রীয় পুণ্যকর্মে মধুসূদনের সশ্রদ্ধ মনোভাবই প্রকাশিত। বন্দী—রাজপুরীর বন্দনাকারীগণ।

মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি—রাজপুরীর বন্দনাকারীগণ লঙ্কাপুরীর স্তবগান গাহিতেছে। অতুল ঐশ্বর্যসম্পদে বিভূষিতা হইলেও বীরপুত্রনিধনে জননীরূপিণী লঙ্কা আজ শোকমূর্ছিতা, তাই তাঁহার কেশরাজি শোকপ্রভাবে আলুলায়িত।

কোদণ্ড—ধনুক।

রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্য-চর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দণ্ডক-অরণ্য-চর ক্ষুদ্র প্রাণী যত—দণ্ডকবনে বিচরণকারী বানরকুল।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী ; কূজনি পাখি পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হম্বা-রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
১০ আইলেন নিদ্রা-দেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জল চর-আদি
দেবীর চরণাশ্রয়ে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা হরিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা-মাঝে
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে ! রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি ঢুলায় চামরী।
২০ আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্তিমতী

ত্রিদশ-আলয়ে—দেবালয়ে। দেবতাদের কেবল বাল্য কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি দশা।

পুলোম-নন্দিনী—শচীদেবী। পুলোমা দানবকে বধ করিয়া ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করেন।

ত্রিদিব-বাদিত্র—স্বর্গীয় বাদ্যবৃন্দ।

ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সংগীত। উর্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারস।
কেহ বা দেব-ওদন; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
৩০ সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুরপুরী,
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা, "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
৪০ উত্তর করিলা ইন্দ্র, "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্যফলে,

শিঞ্জিতে—নূপুর প্রভৃতি অলংকার ধ্বনিতে।
রঞ্জি—মনোহরণ করিয়া। দেব-ওদন—দেবতাদের উপযুক্ত আহার্য
মন্দার-দাম—স্বর্গীয় মন্দার ফুলের মালা। কেশর—পুষ্পরেণু
বৈজয়ন্ত-ধাম—স্বর্গীয় ইন্দ্রপ্রাসাদ। আশীষিয়া—আশীর্বাদপূর্বক
পুণ্ডরীকাক্ষ—বিষ্ণু।
বারীন্দ্র-সুতে—সমুদ্র-উত্থিতা লক্ষ্মীদেবীকে সম্বোধন।

লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে ?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,
পুজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এতদিনে
৫০ বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কা-ধামে
এবে; আর বীর যত হত এ সমরে।
৬০ বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সংকটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
৭০ এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি

বাম—অপ্রসন্ন। মজিছে—নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।
বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়।

বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে !
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম , বসন্তকালে পাখিকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি !
  কহিলেন স্বরীশ্বর, "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে ? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।
৮০ পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি ! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার ! সর্বশুচি-বরে,
সর্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
  কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী,—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
৯০ নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার ; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে !

স্বরীশ্বর—স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র।
পন্নগ-অশন—সর্পাদি যাহার আহার অর্থাৎ গরুড়। দম্ভোলি—বজ্র।
বিমুখয়ে—বিমুখ অর্থাৎ প্রতিহত করে।
সর্বশুচি-বরে—অগ্নিদেবতার কৃপায়। অগ্নি মেঘনাদের ইষ্টদেব।
উপেন্দ্রপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী।
অনন্ত ক্লান্ত এবে—রাবণের পাপহেতু অনন্ত নাগ বাসুকি পৃথিবী ধারণে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে।

বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কা-পুরে। কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
১০০ কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা”—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোণার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী-পানে
১১০ কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে, “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি।
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।”
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর-নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে

বিরূপাক্ষ—শিব। জটাধর—মহাদেব। ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন মহাদেব।
অনম্বর-পথ—আকাশপথ।
অধোদেশে—মর্তে অর্থাৎ লঙ্কায়। মাতলি—ইন্দ্র-সারথি।
মৃণালের রুচি—মৃণালের সৌন্দর্য। বিকচ—প্রস্ফুটিত।

১২০ দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে
উদিলা ! ডাকিল ফিঙা ; আর পাখি যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে !
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে !
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
১৩০ শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন !
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ !
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া ;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের, কবি বর্ণিবে বিভব ?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে !

দেবযান—ইন্দ্রের রথবাহন।

বাসরে কুসুম-শয্যা…উঠিলা সাধিতে—পুষ্পাভরণ-ভূষিত বিবাহশয্যা পরিত্যাগপূর্বক প্রভাতোদয়ের ভ্রান্তিবশত নববধূ লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রাত্যহিক গৃহকর্মে রত হইল।

মানস-সকাশে—মানস-সরোবরের নিকটস্থ।

কৈলাসশিখরী—কৈলাসপর্বত।

শৃঙ্গধর—পর্বত। বিশদ—শুভ্র। স্বরীশ্বরী—শচীদেবী।

হায় রে, কেমনে…মনে মনে—কৈলাস পর্বত-শিখরে স্থাপিত শিবভবনের সৌন্দর্য অনির্বচনীয় বলিয়া কবি পাঠকের কল্পনায় তাহা উপভোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বর্ণিবে—বর্ণনা করিবে।

১৪০ পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা,—"কহ দেব, কুশলবারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে ?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী,—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে। কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
১৫০ পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে ;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কা-পুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে !
১৬০ দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে ?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে !
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি

দম্ভোলি-নিক্ষেপী—বজ্র-নিক্ষেপকারী ইন্দ্র। বিগ্রহে—যুদ্ধে।
পরন্তপ—শত্রুনিপীড়ক। বিশ্বধর—মস্তকে পৃথিবীধারণকারী।
শেষ—অনন্ত নাগ। কুলিশ—বজ্র। নিস্তেজে—তেজোহীন করে।

অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"
উত্তরিলা কাত্যায়নী,—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহাস্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা,—
"পরম-অধর্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃসত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ ভোগ ত্যজি
১৮০ পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতন মাত্র তাহার আছিল
অমূল্য; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ জ্ঞান করে দেবগণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?"
১৯০ নীরবিলা স্বরীশ্বর; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর-সুস্বরে,—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে

ত্রিশূলী—ত্রিশূলধারী মহাদেব। সুরেন্দ্র—দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র।
তেঁই—সেই কারণে। পর-দার—পরস্ত্রী। পামর—দুরাত্মা।
বীণাবাণী—যাহার কণ্ঠস্বর বীণাধ্বনির ন্যায় সুমিষ্ট।
বিদরে—বিদীর্ণ হয়।

হৃদয়? অশোক বনে বসি দিবনিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখি পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
২০০ দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা,—"রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে!
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা! মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
২১০ রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়ংকর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র! কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?

দাসীর কলঙ্ক—ইন্দ্রজিতের নিকট ইন্দ্রের পরাজয়ের গ্লানি কেবল পরাজিতের নহে, তাহা স্ত্রী শচীরও কলঙ্ক!

জিষ্ণু—বিজয়ী।

মঞ্জুনাশিনী—অপর রমণীর সৌন্দর্য পরাস্ত হয় যাহার রূপশোভায়, সেই শচী। মঞ্জুনাশীই স্ত্রী বাচক শব্দ, মঞ্জুনাশিনী নিষ্প্রয়োজন।

বৃষধ্বজ—শিব।

ঘন ঘনাবৃত—ঘন মেঘে আবৃত।

পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম।"
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন,—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনী
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
২২০ ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্মের মহিমা;
হ্রাস বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পুরিল
পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গলনিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর-কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
২৩০ সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা,—"লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী, "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কা-পুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গগনে।
অভয় প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।

পক্ষীন্দ্র⋯অক্ষম—যাহার নিকট দুর্গম স্থান নাই সেই পক্ষীরাজ গরুড়ের পক্ষেও তথায় গমন সম্ভব নহে।

ভবেশ-ভাবিনী—ভবেশ অর্থাৎ মহাদেবের প্রিয়তমা দুর্গা।

স্তুতিলা—স্তব করিল। মঙ্গলনিক্কণ—মঙ্গলধ্বনি।

বারি-সংঘটিত—জলপূর্ণ।

২৪০ পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারিণি !"
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী,—
"দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে। যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর !) এবে বসেন ধূর্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈমগেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
২৫০ স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা ; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী, বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল !
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন !
২৬০ নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে ! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগিব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা !

তার—পরিত্রাণ কর। ধূর্জটি—মহাদেব।
দ্বিরদ-গামিনী—হস্তীর ন্যায় মন্দগমনা।
চিররুচি—চিরদিন যে পুষ্পের শ্রী বিরাজমান।
তারাকারা—তারার আকারবিশিষ্ট। যোগিব্রজ—যাহারা যোগসাধনায় রত।

প্রবেশি স্বর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে ?"
ক্ষণকাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
২৭০ তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু তরঙ্গিণী-রূপে, বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ু-পথে কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা,—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে,
২৮০ কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি ?" উত্তরিলা, নমি
সুকেশিনী,—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর-বপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা !"
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,

ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব। ত্বিষাম্পতি-দূতী—সূর্যের দূতী অর্থাৎ উষা
বর-বপুঃ—সুন্দর তনু।
পিনাকী—পিনাক-নামক ধনুক বা ত্রিশূলধারী, অর্থাৎ শিব।
বিনানিলা—কেশ বেণীবদ্ধ করিল।

২৯০ হীরক, মুকুতা, মণি-খচিত ; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুস্কুম, কস্তুরী ;
রত্ন-সংকলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা ; রসানে মাজ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল !
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল-সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
৩০০ চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে !)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সংগীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে !
কহিলা শৈলেশসুতা,—"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা ; চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
৩১০ মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে,—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ?
স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি, মা, তরাসে !
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,

কৌষেয় বসন—রেশমী বস্ত্র।
রসান—অলংকার উজ্জ্বল করিবার শাণ-পালিশ পাথর। লাক্ষারস—অলক্তক।
স্মর-হর-প্রিয়া—মদন-ভস্মকারী শিবের পত্নী। স্মর-প্রিয়া—মদনপত্নী রতি।
মদন-বাঞ্ছা—রতি। ফুল-ধনুঃ—মদন।

তোমার বিরহ শোকে বিশ্ব ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ হানিনু কুক্ষণে
৩২০ ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
কেহ না আইল, ভস্ম হইনু সত্বরে !—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে ;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমংকরি! এ মিনতি পদে।”
৩৩০ আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শংকরী,—
“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নিভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজ,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ নাশ কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে !”
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা,—“অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
৩৪০ কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?

বামদেব—মহাদেব। বিভাবসু—অগ্নি। অনঙ্গ—কামদেব।

মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
৩৫০ ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে, ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ, বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ-বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
৩৬০ মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী। কিংবা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিংবা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেক দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে।

শ্রীপতি—বিষ্ণু। মন্দর—পর্বতের নাম।

মলম্বা—আরবী মুলম্বা অর্থাৎ সোনার পাত। অম্বর—বসন, আবরণ।

মলম্বা-অম্বরে···মনোহর—স্বর্ণপত্রে আবৃত তাম্র যদি এত শোভাময় হয় তবে বিশুদ্ধ স্বর্ণের দীপ্তি কতই মনোহর!

চক্র-প্রসরণে—বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের দ্বারা। শক্র—ইন্দ্র।

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
৩৭০ পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী!
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উতরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে!
৩৮০ দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারু-হাসিনী,-
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে!
শিহরিলা শূলপাণি। নড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
৩৯০ ঘোর মড় মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত—হস্তিদন্ত দ্বারা নির্মিত।
ভৃগুমান্—উচ্চশিখরযুক্ত। কপর্দী—জটাজূটধারী মহাদেব।
শম্বর-অরি—শম্বর নামক অসুর নিধনের জন্য কামদেবের এই নাম।
মীনধ্বজ—কামদেব। শিঞ্জিনী—ধনুর্গুণ।

চিত্রভানু, ধক্‌ধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।

৪০০ মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি,—"কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্র-জননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শংকরি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা,—"এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
৪১০ একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;

চিত্রভানু—অগ্নি। কেশরি-কিশোর—সিংহশাবক।
কেশরিণী-কোলে—সিংহীর ক্রোড়ে। মৃগেন্দ্র—সিংহ, দুর্গার বাহন।
গণেন্দ্র-জননী—গণেশ-জননী অর্থাৎ দুর্গা।
অজিন—মৃগচর্ম। মকরন্দ—মধু। শিলীমুখ—ভ্রমর।

নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
৪২০ ইহা হতে?) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা কুসুম-ধনুঃ টংকারি কৌতুকে
শর-জাল, প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী।
লজ্জা বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাস ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু।
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব,—"জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব যে হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস সদনে,
কেন না অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
৪৩০ পরম ভকত মম, নিকষানন্দন,
কিন্তু নিজ কর্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায় দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেষি,
মায়া দেবী নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেল মীনধ্বজ, নীড় ত্যজি উড়ে
৪৪০ বিহংগম বাল যথা, মুক্তপক্ষঃ চলি
সে সুখ সদন পানে। ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন

কুসুম-আসার—পুষ্পবৃষ্টি। উরসে—বক্ষে। মনসিজ—কামদেব। কুসুমেষু—কামদেব। ঘন রাশি রাশি—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ বাস শ্বাসি ঘন—নিশ্বাসরূপ বায়ু-প্রবাহ ছড়াইয়া।

বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
৪৫০ হেনকালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুকাইল অশ্রু-বিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে,—"বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
৪৬০ কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব-নামে নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্বকথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে,
উত্তরিলা পঞ্চশর,—"ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ আসনে যথা বসেন বাসব,

প্রসূনাসার—পুষ্পবৃষ্টি। মধু-সখা—বসন্তসখা অর্থাৎ মদন।
তুষিলা—তুষ্ট করিল। হিংসক—ঘাতক।
কিরে—দিব্য, শপথ। সহসা এই জাতীয় নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ-ব্যবহার শ্রুতিকটু লাগে।

উতরি মন্মথ তথা নিবেদিলা নমি
৪৭০ বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কতক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথিবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সংকলিত
৪৮০ আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা,—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা দেবী,—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি,—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
৪৯০ নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণকাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে,—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,

-অশ্ব। সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র
সৌর-খরতর-কর-জাল—সূর্যের প্রচণ্ড কিরণমালা।
আশীষ—আশীর্বাদ কর। সৌমিত্রি—সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ
কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ-সেনানী—কার্তিকেয়। বৃষভ ধ্বজ—শিব

পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
৫০০ আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ংকর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা !
ওই দেখ ধনুঃ, দেব !" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময় ! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে !
অগ্নি-শিখা-সম অসি মহাতেজস্কর !
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?"
৫১০ "শুন দেব", (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী),
"ওই সব অস্ত্র-বলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্র-বলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কা-পুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
৫২০ ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে

ফলক—ঢাল। কৃতান্ত—যম।

সুনাসীর—ইহা ইন্দ্রকে সম্বোধন। নাসীর অর্থ সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ ভাগ। ইন্দ্র যুদ্ধে সর্বদা অগ্রগণ্য বলিয়া এই সম্বোধন। প্রের—প্রেরণ কর।

পূর্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্র-কেশরী
ইন্দ্রজিৎ-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে,—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
৫৩০ স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার ; পার্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি !
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী-সতীরে
৫৪০ বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া

পূর্বাশার—পূর্বদিকের।

ইন্দ্রজিৎ-ত্রাস-হীন করিবে—কেননা লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিবে।

মেঘদলে আমি পূরিব জগতে—রাবণপুত্র মেঘনাদকে হত্যা ও রামচন্দ্রকে জীবিত রাখার দৈব-উদ্বেগ প্রাণ-সংহারের হীন ষড়যন্ত্রেই নিঃশেষ হয় নাই, সমগ্র প্রকৃতিকেও সেই হত্যাকাণ্ডের আনুকূল্যে নিয়োগ করা হইয়াছে।

প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্যে চিত্ররথ রথী।
৫০০ তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা,—"প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কা-পুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ;
দ্বন্দ্ব ক্ষণকাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
৫৬০ অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুংকারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে,
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী ; গর্জিল জলধি!
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণ-রঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত ; হাসিল

চপলা—বিদ্যুৎ। দম্ভোলি—বজ্র।
লম্ফী—লম্ফপ্রদায়ী।
কোলাহলে—কোলাহল করিতেছে। লড়িছে—কম্পিত হইতেছে।
অন্তরিত পরাক্রমে—অন্তর্নিহিত বেগে। তরঙ্গ-আবলী—ঢেউসমূহ।
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্বতাকারে। জীমূত—মেঘ।

ক্ষণপ্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
৫৭০ পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে ; মহা ঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির-মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
৫৮০ রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝলঝল ঝলে!
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম, বর্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে ;
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা,—"হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
৫৯০ এ হেন মহিমা, রূপে?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।
পাবক উগরি—অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া। বৃষ্টিল শিলা—শিলাবৃষ্টি হইল
দিবাকর যেন অংশুমালী—কিরণমালা বিভূষিত সূর্যের ন্যায়।
সারসন—কটিভূষণ।

পাদ্য, অর্ঘ লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায়!" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে,—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে: গন্ধর্বকুল আমার অধীনে।
৬০০ আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!"
কহিলা রঘুনন্দন,—"আনন্দ-সাগরে
৬১০ ভাসিনু গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ-সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত,—"শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্মপথে সদা গতি;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
৬২০ প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী

আবির্ভাবি—আবির্ভূত হইয়া। কৌষিক বস্ত্র—ক্ষৌম বস্ত্র।
বলি—পূজোপকরণ।

চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
৬৩০ ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

শান্তিলা—শান্ত হইল।

তরল সলিলে…রজোময়—রৌপ্যবর্ণ জ্যোৎস্না ঝড়শান্ত সরোবরের নিস্তরঙ্গ ও স্বচ্ছ জলে এমনভাবে অবলিপ্ত হইল যে মনে হইল, জ্যোৎস্না যেন সরোবরে স্নান করিয়া উঠিল।

ভীম-প্রহরণধারী—ভয়ংকর অস্ত্রধারী।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে
১০ একদৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারিদিকে সখী-দল যত,
বিরস বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
১৫ কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা
২০ তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা,—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির-যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,

প্রমোদ-উদ্যান—লঙ্কার বহির্দেশে স্থাপিত মেঘনাদ-প্রমীলার এই উদ্যানের পরিকল্পনা বিদেশী কাব্যের প্রভাব সূচিত করিতেছে।

পীতধড়া—হরিদ্রাবর্ণ বসন; পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বসনবর্ণ-রূপে পুরাণ ও কাব্য-প্রসিদ্ধ। বসন্ত-সৌরভা—বসন্ত ঋতুর গুণবিশিষ্টা।

অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্ত-সখা,—"কেমনে কহিব,
৩০ কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি !
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে ? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
৪০ এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;
কুহরিছে পিকবর ; কুসুম ফুটিছে ;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সীঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি ;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি

ব্যাজ—বিলম্ব। সীমন্তিনী- বসন্ত-সখা—কোকিল।
বিলম্বেন—বিলম্ব করেন। আঁটিবে—রোধ করিবে।
চিকণিয়া—চিকণ অর্থাৎ সুশ্রী সুন্দর করিয়া। দাম—মালা।
সরসী—পুষ্করিণী। পাঁতি—পংক্তি, শ্রেণী।

মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে ?
৫০ কত দূরে হেরি বামা সূর্যমুখী দুঃখী,
মলিন বদনা, মরি, মিহির বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে,—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশাকালে,
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দাহছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
৬০ পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?"
অবচয়ি ফুলচয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী,- "এই তো তুলিনু
ফুলরাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা , কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কা-পুরে যাই মোরা সবে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, "কেমনে পশিবে
৭০ লঙ্কা-পুরে আজ তুমি ? অলঙ্ঘ্য-সাগর-

মুক্তিল—মুক্তাফল রচনা করিল, মোচন করিল।

শিশির-নীরে—এখানে অশ্রুবিন্দু।

মিহির-বিরহে—অর্থাৎ সূর্য অবসিত হইলে।

ভানুপ্রিয়ে সূর্যমুখী সূর্যের প্রেয়সী এই কবিপ্রসিদ্ধি আছে, ইহা সেই সূর্যমুখীর প্রতি সম্বোধন।

অস্তাচলে আচ্ছন্ন—এক্ষেত্রে দৃষ্টিবহির্ভূত বলিয়া অস্তগমিত সূর্যের সহিত ইন্দ্রজিতের তুলনা করা হইয়াছে।

অবচয়ি—চয়ন করিয়া। চিকণিয়া—বাছিয়া বাছিয়া।

সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।”
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী !
“কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
৮০ আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?”
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেব-দত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
৯০ বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ! ঝক্ ঝক্ ঝকি

চমূ—সৈন্যবাহিনী।
রক্ষঃ-অরি—অর্থাৎ রামচন্দ্রের বাহিনী।
দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা—শাস্তি-নির্দেশক দণ্ড হস্তে স্বয়ং যমের ন্যায়।
বাহিরায়—বহির্গত হয়। ডরাই—ত্রস্ত হই। নিবারে—নিবারণ করে।
গজ-পতি-গতি—হস্তীর মত গমনে।
পরন্তপ—শত্রুঘাতক। তুরঙ্গ—ঘোড়া। দেবদত্ত—অর্জুনের শঙ্খের নাম।
উলঙ্গিয়া—নিষ্কোষিত করিয়া। কার্মুক—ধনুক। ফলকপুঞ্জ—ঢালসমূহ।

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, ঊর্ধ্ব-কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝনঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল-ফণী!
বারিমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
১০০ নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃমুণ্ডমালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া একশত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝঞ্ঝনি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে,
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
১১০ মৃণাল। হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমর-বাদ্য; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজ-ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা—স্বর্ণোজ্জ্বল দেহবর্মের জ্যোতি। বোলী—ধ্বনি।
বারিমাঝে—হস্তিশালায়। ঘনপতি—ঘনকৃষ্ণ মেঘ।
মন্দুরা—অশ্বশালা। বিদরি—বিদীর্ণ করিয়া।
কন্দরে—পর্বত-গহ্বরে। অলিন্দ—বারান্দা।
শীর্ষক-চূড়া—উষ্ণীষের অগ্রভাগ। দানবদলনী—কালী।
তূণীর—শরাধার। বিরূপাক্ষ—শিব। দিবে—স্বর্গে।

প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বরী-শিরে,
ইন্দ্রচাপ। লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
১২০ শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক তুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝক্‌ঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
১৩০ নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিংবা শুম্ভ-নিশুম্ভ, উন্মদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে,—"লঙ্কা-পুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা

কবচে—বর্মে। নিষঙ্গ—তূণীর। ফলক—ঢাল। বর্তুল—সুডৌল।
খরশান—তীক্ষ্ণ। আভরণ—অলংকার। উন্মদ—উন্মত্ত।
হৈমবতী—দুর্গা। বামী—অশ্বী।
বাড়বাগ্নি-শিখা—সমুদ্রজলের উপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে অগ্নিশিখা নির্গত হয়। কাদম্বিনী—মেঘমালা।

১৪০ প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
১৫০ চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!"
নাদিল দানব-বালা হুহুংকার রবে,
মাতঙ্গিনী-যূথ যথা—মত্ত মধু-কালে!
১৬০ যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনকলঙ্কা, গর্জিল জলধি
ঘন ঘনাকারে রেণু উঠিল চৌদিকে;—

কটক—সেনাদল।

দ্বিষৎ-শোণিত-নদে—শত্রুদেহ-নির্গত রক্তস্রোতে।

অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে—কণ্ঠে নারীজনসুলভ সুধাময় বাকস্ফূর্তি কিন্তু প্রয়োজন হইলে বিষদৃষ্টির সাহায্যে ভস্মীভূত করিবার ক্ষমতা।

মধু-কালে—বসন্তে।

কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা টংকারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
১৭০ স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরংগমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহংগম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্বত-গহ্বরে সিংহ; বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা,—
"কে তোরা এ নিশাকালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি
১৮০ থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্মতি?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)

মাতঙ্গে নিষাদী—হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণকারী সৈন্য।
তুরংগমে সাদীবর—অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণকারী সৈন্য।
অবরোধে—অন্তঃপুরে। কোদণ্ড—ধনুক।
অঙ্গনা-বেশ—নারী-বেশ।

কোদণ্ড টংকারি রোষে কহিলা হুংকারে,—
১৯০ "শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
২০০ লঙ্কা-পুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী!
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনূ, অগ্রসরি, শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা-মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণপ্রভা সম বিভা খেলিছে কিরীটে;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!
বিস্ময় মানিয়া হনূ ভাবে মনে মনে,—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
২১০ লঙ্কা-পুরে, ভয়ংকরী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি

যোধ—যোদ্ধা। বলীন্দ্র—বলশ্রেষ্ঠ। পাবনি—পবনপুত্র হনূমান্।
ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। বরাঙ্গে—সুন্দর দেহে।
সৌর-অংশু-রাশি—সূর্যদীপ্তি।
উতরিনু—অবতীর্ণ হইলাম।
খর্পর খণ্ডা—নরকরোটি-রূপ পাত্র ও খড়্গ।

রাবণের প্রণয়িনী দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরে ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
২২০ ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন-স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে,
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনূমান্ আমি
২৩০ রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কাণে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা !—"রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,

অঞ্জনা-নন্দন—হনূমান। প্রভঞ্জন-স্বনে—ঝড়ের গম্ভীর ধ্বনির মত। বিবাদি—বিবাদ করি, শত্রুভাব পোষণ করি।

২৪০ নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কিবা যাজ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।"
নৃমুণ্ডমালিনী দূতী, নৃমুণ্ডমালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
২৫০ নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরী,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিল বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে। হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
২৬০ ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,

রমে—মুগ্ধ করে।

যে বিদ্যুৎ ছটা…পরশে—নিরাপদ দূরত্বে বিদ্যুৎ দৃষ্টিবিমোহন, কিন্তু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইলে মৃত্যু অনিবার্য। বিবরিয়া—বিবৃত করিয়া।

গরুত্মতী—পালতোলা নৌকা। ভামিনী—রমণী।

দড়ে রড়ে—দ্রুত পদসঞ্চারে, সন্ত্রস্ত হইয়া।

শীর্ষকের চূড়া—শিরস্ত্রাণ বা মুকুটের চূড়া।

চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে ;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর ! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে !
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
২৭০ কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে !
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
করপুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব-মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ, শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে ;
সারি সারি চারিদিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
২৮০ কেহ বাখানেন খড়্গ ; চর্ম্ম-বর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ ; তূণীর কেহ বা ;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি ! আপনি সুমতি

চন্দ্রক-কলাপময়—চন্দ্রচিহ্নিত ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত। পীবর—স্থূল।

কৌমুদী যেমতি, কুমুদিনী-সখী—সরোবরস্থ রক্তপদ্মের প্রিয়বান্ধবী জ্যোৎস্নাকিরণের ন্যায়। অথবা কুমুদিনী-সখী কৌমুদীরই বিশেষণরূপে গৃহীতব্য। পিঠোপরি—বেদীর উপর।

রঞ্জিত রঞ্জনরাগে—রক্ত চন্দনানুলিপ্ত ; দৈবাস্ত্রগুলি ইতিমধ্যে রামচন্দ্র কর্তৃক পুষ্পচন্দনাদির দ্বারা পূজিত হইয়াছে।

ধূমি—ধূমায়িত করিয়া। দেউটী—প্রদীপবর্তিকা।

বাখানেন—প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিতেছেন।

ধরি ধনুর্ব্বরে করে কহিলা রাঘব;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোমাইবে এরে ?"
সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
২৯০ সাগর-কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী,—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে।
নিশীথে কি ঊষা আসি উতরিলা হেথা ?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির-বাহিরে।
"ভৈরবী-রূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্রজালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
৩০০ শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি ! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে !"

ঠাট—সৈন্যবাহিনী। রক্ষোরথী—বিভীষণই এখানে কবির উদ্দিষ্ট।

কামরূপী তবাগ্রজ—ইন্দ্রজাল-সাহায্যে মায়াহরিণের ভ্রান্তি উৎপন্ন করিয়া রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিলেন। এইজন্য রামচন্দ্র বিভীষণের নিকট তাঁহার অগ্রজ রাবণকে জাদুকর বলিয়া মন্তব্য করিতেছেন।

শুভক্ষণে রক্ষোবর···এ বিপত্তি-কালে—বাহুবলে রামচন্দ্র পরনির্ভরশীল নহেন, কিন্তু এই ঐন্দ্রজালিক পুরীতে রাক্ষস-প্রদর্শিত ছলনা ও মায়ার বশীভূত হইয়া রামচন্দ্রের যে অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্যই বিভীষণকে তিনি কাতরভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

ঠাট—সৈন্যদলাক।

হেনকালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে !)
কহিলা ; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃমুণ্ডমালিনী
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা-সুন্দরী,
৩১০ বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা, "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী, "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণ-লঙ্কা-পুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
৩২০ রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত !
যথারুচি কর, দেব , বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,

বিশেষিয়া—যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করিয়া।

ভর্ত্রিণী—কর্ত্রী।

যথারুচি কর—ধনুর্ব্বাণ তরবারি গদা বা মল্লযুদ্ধ, প্রমীলার নারীবাহিনী সর্ব্বপ্রকার রণপদ্ধতিতেই প্রস্তুত বলিয়া রামচন্দ্র ইহার যে-কোনও একটি পদ্ধতি ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারেন।

চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ংকরী—হেরি মৃগপালে।"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
৩৩০ প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশির-মণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ-সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি, "শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমরা সকলে
কুলবালা; কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
৩৪০ তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে!
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে;

চিত্রবাঘিনীরে·· মৃগ-পালে—হরিণদলের দর্শন পাইলে চিতাবাঘিনী দুর্মর বেগে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়, তখন ব্যাধপত্নীর পক্ষে সেই ব্যাঘ্রগতি রোধ করা দুঃসাধ্য! অলংকারের অর্থ এখানে স্পষ্ট নহে।

নোমাইলা—সম্ভ্রমে অবনমিত করিল।

বন্দে—বন্দনা করে।

সুকেশিনী—দূতির বিশেষণ, উত্তম কেশবিশিষ্টা নারী।

বৈরিভাব আচরিব—শত্রুভাবাপন্ন হইব।

প্রবেশ—প্রবেশ কর। বাখানি—প্রশংসা করি।

বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে—সেই বীরাঙ্গনা রমণীর নিকট শক্তি পরীক্ষা অথবা যুদ্ধবাসনা প্রত্যাহার করিতেছি।

বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে;
কি প্রসাদ সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি।"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে;
৩৫০ "দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
শিষ্ট-আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ, "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি। দেখ, দেব, অপূর্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?" কহিলা রাঘব,
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
৩৬০ রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি

চামুণ্ডা—দেবী দুর্গা যে রূপে চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলেন।

রক্তবীজ-কুল-অরি—দুর্গা দেবী, যিনি রক্তবীজ নামক দৈত্যকুলের শত্রু। রক্তবীজ শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতি অসুর, ইহার রক্তবিন্দু মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেই তদাকার অসুর উৎপন্ন হইত।

বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে—দাবানলের শিখার মত দীপ্তোজ্জ্বল প্রমীলা ও সহসেনা-বাহিনীর অঙ্গকান্তি অন্ধকার আকাশ আলোকিত করিয়া তুলিল, কেবল দাবানলের মত এই শিখা ছিল ধূমশূন্য

সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে—রাত্রির মেঘমালাকে সুবর্ণরঞ্জিত করিয়া।

কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুংকার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
৩৭০ ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সংকলিত-আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে!
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ দণ্ড করে
৩৮০ হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত! বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্বণে!
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণপ্রভা-সম।

কোদণ্ড-ঘর্ঘর—ধনুর্গুণের ঘোর টংকার-ধ্বনি।
দড়বড়ি—দ্রুত অশ্বধ্বনি।
আস্কন্দিতে—অশ্বগমনের ছন্দে। বাজি-রাজি—অশ্ববাহিনী।
বোলিছে – ধ্বনিত হইতেছে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট—পর্বত-শিখরের মত দণ্ডায়মান পুরুষ সৈন্যদল।
ক্ষিতি—ভূমি। কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণকারিণী।
ধনী—গর্বিতা রমণী। বিদ্যাধরী—স্বর্গীয় গায়িকা-সম্প্রদায়।
নিক্বণে—শব্দে। ক্ষণপ্রভা-সম—বিদ্যুতের ন্যায়।

অন্তরীক্ষে সঙ্গে সঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
৩৯০ অব্যর্থ কুসুম-শরে! সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে!
ধীরে ধীরে, বৈরিদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টংকারিলা
শিঞ্জিনী; হুংকারি কেহ উলঙ্গিলা অসি;
আস্ফালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিট্‌কারি; কেহ বা নাদিলা,
৪০০ গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কামমদে, উন্মাদ ভৈরবী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব,
"কি আশ্চর্য নৈকষেয়! কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্নোত্তম।

অন্তরীক্ষে—নভোমণ্ডলে। রতিপতি—মদন।

অন্তরীক্ষে·· কুসুম শরে—রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়া বীর-বিক্রমে ধাবমানা প্রমীলার প্রতি শূন্যলোক হইতে সহযাত্রী কামদেব প্রতিক্ষণ তাঁহার পুষ্পশর নিক্ষেপ করিয়া প্রমীলার স্বামী-মিলনাকাঙ্ক্ষাকে অক্ষুণ্ণ ও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছেন। টাস্‌সোর জেরুজালেম উদ্ধার কাব্য হইতে এইরূপ নায়িকার অলক্ষ্যে সক্রিয় কামদেবের সহগমনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী—বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী যেরূপ পক্ষিরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে। লক্ষ্মীদেবী পুরাণমতে গরুড়বাহিনী।

বামী-ঈশ্বরী—ঘোটকীকুলের মতে শ্রেষ্ঠা। অর্থাৎ প্রমীলার বড়বা নামে বাহিকা। শিঞ্জিনী—ধনুর্গুণ।

কেশরিণী—সিংহিনী, অবশ্য স্ত্রীসিংহের কেশর নাই।

না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথী মুখে শুনিনু বারতা,
৪১০ উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কা-পুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ?”
উত্তরিলা বিভীষণ,—“নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে ; কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে ? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
৪২০ সহস্রাক্ষে যে হর্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী ! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,

প্রপঞ্চ—মায়া, ছলনাময় কার্যকলাপ। বঞ্চো না—বঞ্চনা করিও না।

উরিবেন—আবির্ভূত হইবেন।

দাসের সহায়ে—এই অধম দেবানুগৃহীত আমাকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত। বুধ—জ্ঞানী। সুরারি—দেবশত্রু।

হর্যক্ষ—সিংহ, এখানে ইন্দ্রজিৎকে বুঝানো হইতেছে।

দম্ভোলি-নিক্ষেপী…সংগ্রামে—সিংহপরাক্রমী যে বীর মেঘনাদ বজ্রপাণি ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেন। নিগড়ে—শৃঙ্খলে।

যথা বারিধারা…দাবানলে—অরণ্য-ধ্বংসকারী দাবানলকে যেরূপ বৃষ্টিধারা প্রশমিত করে।

নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল-ফণী, দুরন্ত দংশক!
৪৩০ সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে!"
কহিলেন, রঘুপতি ; "সত্য, যা কহিলে,
মিত্রবর, রথিশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহসহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
৪৪০ কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া,
উথলিছে চারিদিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল-সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষদন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে,
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
৪৫০ এ কনকলঙ্কা-পুরে, কহিনু তোমারে।"
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া

কালাগ্নি—কালস্বরূপ অগ্নি, অর্থাৎ মেঘনাদ। দংশক—সর্প।
ভৃগুরামে—পরশুরামকে। ভৃগুমান্—শিখরবিশিষ্ট।
নিস্তারিণী-মনোহর—দুর্গাদেবীর মনোহরণকারী অর্থাৎ শিব।
নিস্তারিলে—ত্রাণ করিলেন।

ভ্রাতৃপদে, "কেন আর ডরিব রাক্ষসে
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার.
কি ভয় তাহার, প্রভু এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম কোথা কবে জয় লাভে?
অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
৪৬০ লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"
  উত্তরিলা বিভীষণ, "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি!
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃমুণ্ডমালিনী, যথা নৃমুণ্ডমালিনী,
৪৭০ রণ-প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।
  কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে;
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহুসহ রণে। দেখ চারিদিকে—
৪৮০ কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী;

অঙ্গদ—বালির পুত্র। নীল—জনৈক বানরসেনা

কোথা বা সুগ্রীব মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে !"
"যে আজ্ঞা", বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
উর্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।—
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
৩৯০ প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা !
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ গদা-ধারী,
ভীমমূর্তি প্রমত্ত ! হ্রেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুম্ভে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে;
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয়-গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
৪০০ নিশীথে ! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।—
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী,
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,

তারক-সূদন—তারক-নামক অসুর-নিধনকারী অর্থাৎ কার্তিকেয়।

ত্বিষাম্পতিসহ ইন্দু সুধানিধি—অমৃতাধার চন্দ্র যেন সূর্যসহ শোভা পাইতে লাগিল।

প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহময় বাণ।

কৌন্তিক কুল—কুন্ত বা কুন্তকজাতীয় অর্থাৎ বর্শাজাতীয় অস্ত্রধারী সৈনিকবৃন্দ। নারাচ—লৌহময় বাণবিশেষ, প্রক্ষ্বেড়ন।

খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে!" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হুড় হুড় হুড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নিশিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
৫১০ পৌরজন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হ্রেষি আস্কন্দিল
হয়বৃন্দ; ঝঞ্চনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
৫২০ প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিলা কৌতুকে,—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদতলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি কহিলা ললনা,

হুড়ুকা—অর্গল। পতঙ্গ-আবলী—পতঙ্গবৃন্দ।
হুলাহুলি—মঙ্গলজনক উলুধ্বনি। কুসুমাসার—ফুলবৃষ্টি।
বন্দী—বন্দনাকারী। বিদ্যাধরী—স্বর্গীয় নৃত্যগীতকুশলা নারী।
হ্রেষি আস্কন্দিল হয়বৃন্দ—অশ্বগুলি ধ্বনিসহকারে নাচিয়া উঠিল।
কৃপাণ—তরবারি। পিধানে—কোষে। বাখানিলা—প্রশংসা করিল।

"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
৫৩০ অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে !
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি,
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি,
৫৪০ অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়ামণি
মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।

ও পদ-প্রসাদে···দাসী—কেবল প্রেমময় স্বামীর আশীর্বাদে প্রমীলা বিশ্ব জয় করিতে পারে।

অবহেলি শরানলে—শত্রুনিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণতীরের দাহ উপেক্ষা করি।

মনমথে না পারি জিনিতে—কেবল মদনের পুষ্পশরের অলক্ষ্য প্রভাব নারীর প্রিয়-বিরহিত জীবনে যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে, তাহাই দুর্নিবার !

পরিলা দুকূলে—ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিলেন।

আঁটিয়া কাঁচলি—বক্ষ আবরণী পিনদ্ধ করিয়া। পীন-স্তনী—ঘনকুচযুগ্মা।

শ্রোণিদেশে—নিতম্বদেশে। ভাতিল—শোভা পাইল। উরসে—বক্ষে।

জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি—সীমন্তে গোধূলিস্থ তারকার ন্যায় অলংকার শোভা পাইল।

অলকে—কপোলস্পর্শী চূর্ণ-কুন্তলে। কুণ্ডল শ্রবণে—কর্ণে কর্ণাভরণ।

পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী—ইতিপূর্বে যে প্রমীলাসুন্দরী সর্বাঙ্গে যোদ্ধসাজ পরিধান করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্তে এখন যৌবনভারাবনতা রমণীর উপযুক্ত অলংকারে সর্বাঙ্গ সুশোভিত করিলেন।

গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্ত্তকী ;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখি ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু স্পর্শে যথা অম্বুরাশি।—
বহিল বাসন্তানিল মধুব সুস্বনে,—
৫৫০ যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিল উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে !
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি ;
বৃথা নিদ্রাদেবী তথা সাধিছেন তারে !
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
৫৬০ কিম্বা নন্দী শূলপাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারিধারে বীরব্যূহ জাগে ; যথা যবে,
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্যকুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে ! জাগে বীরব্যূহ,

উথলিল উৎস—ফোয়ারাগুলির বারিমুখ উদ্‌বারিত হইল।
মধু মধুকালে—মনোহর বসন্তে। ক্ষুধাতুর হরি যথা—ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মত।
বীরব্যূহ—বীর সৈন্যদিগের বাহিনী।
বারিদ-প্রসাদে—মেঘের বৃষ্টিধারা-বর্ষণরূপ কৃপায়। কৃষী—কৃষক।

৫৭০ রাক্ষস কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুইজন চলিল ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে।
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
৫৮০ বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্যযুগে। ওই শোন ভয়ংকর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টংকারিছে বামা
হুংকারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরংগম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী, "সত্য যা কহিলে,
৫৯০ হৈমবতী, হেন রূপ কার নর-লোকে?
জানি আমি বীর্যবতী দানব নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী, কিন্তু ভাব মনে,
কি রূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগৎজয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নিশিখা সে বায়ুর-সহ!

সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা—স্বর্ণবর্মের দীপ্তি। বিকট ঠাট—প্রচণ্ড সৈন্যদল।
তুরংগম আস্কন্দিতে- দ্রুতগামী অশ্বের তুলকি চালে।

কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?"
ক্ষণকাল চিন্তি তবে কহিলা শংকরী,
৬০০ "মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি,
আভাহীন হয় সে লো দিবা-অবসানে ;
তেমনি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে! পতি-সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
৬১০ মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ;
লভিলা কৈলাসবাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশিকলা,
উজলিল সুখ ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

তুষিব—তুষ্ট করিব। ভবের ভালে—শিবের ললাটে
দীপি—আলোক বিকিরণ করিয়া।
রজোময় তেজে—রৌপ্যতুল্য জ্যোতিতে।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সংগমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
১০ ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি

কবি-গুরু—রামায়ণ রচনার দ্বারাই মহর্ষি বাল্মীকি মানব-ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' এই পাদবদ্ধ-অক্ষরযুক্ত বাক্স্পন্দই প্রথম শ্লোক বা কবিতা। এই নবাবিষ্কৃত ছন্দে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন বলিয়া বাল্মীকি ভারতীয় কবিকুলের আদিগুরু।

শিরঃচূড়ামণি—শিরোভূষণ।

রাজেন্দ্র-সংগমে……তীর্থ দরশনে—তীর্থযাত্রার ব্যয়বাহুল্যহেতু দরিদ্র পুণ্যার্থী যেমন বিত্তশালীর সাহায্যে তীর্থযাত্রা করে।

তব পদ-চিহ্ন……অমর—বাল্মীকির পন্থা অনুসরণ করিয়া যে সকল কবি যশের অক্ষয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। ভর্তৃহরি, ভবভূতি, কালিদাস প্রমুখ সাহিত্যিকের অধিকাংশ রচনার বিষয়ই বাল্মীকির রামায়ণ কাব্য হইতে আহৃত। শ্রীভর্তৃহরি—ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। সূরী—পণ্ডিত।

ভবভূতি—মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত নাটকদ্বয়ের রচয়িতা, শ্রীকণ্ঠ তাঁহার উপাধি।

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি সদৃশ—যাঁহার কাব্যগীত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মধুস্বরা বংশী-ধ্বনির সহিত তুলনীয়।

মুরারি—অনর্ঘরাঘবম্ নাটকের স্রষ্টা।

মনোহর; কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলংকার!—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কূলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে,
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
২০ রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।—
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
৩০ জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পুরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,

কীর্তিবাস কীর্তিবাস কবি—যশস্বী কবি কৃত্তিবাস; রামায়ণ অনুবাদক কৃত্তিবাসের বানান মধুসূদন অন্যরূপ লিখিয়াছেন।

সুবর্ণ-দীপ-মালিনী—সুবর্ণ দীপাবলী যাহার মালিকা।

কেলিছে—কেলি করিতেছে। নায়কী—'নায়িকা' হওয়া উচিত।

সুরতে—কামক্রীড়ায়। শীধু—মধু বা মদ্য।

জনস্রোতঃ......কল্লোলে—ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য অভিষেকের উৎসব

কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর-প্রার্থনে!—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরি-দলে সিন্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া
৪০ বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে"; আশা, মায়াবিনী,
পথে ঘাটে ঘরে দ্বারে দেউলে কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?
 একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
৫০ হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!

কেহ নাহি সাধে······প্রার্থনে—শ্রান্তি-ক্লান্তি হইতে বিরত হইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগের জন্য কাহারও আগ্রহ নাই।

আশা, মায়াবিনী···রক্ষঃপুরে—ইন্দ্রজিতের সমর-প্রস্তুতি যে লক্ষ্মণের নিকট নিহত হইবার জন্যই, ইহা কাহারও জ্ঞাত নহে। তাই অন্যরূপ প্রত্যাশায় জনসাধারণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। নিয়তির নির্মম পরিহাস সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কত কম বলিয়াই আশাকে মায়াবিনী বলা হইয়াছে।

রাঘব-বাঞ্ছা—রামচন্দ্রের বাসনারূপিণী অর্থাৎ সীতা দেবী।

বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে—সমুদ্রতলে লক্ষ্মীদেবী যেরূপ আভাহীনা।

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখি ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
৬০ তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী !
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল-সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব-রূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
৭০ সতীর চরণ-তলে, সরমা-সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে,—"দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;

স্বনিছে—মর্ম্মরিত হইতেছে। বিলাপী—বিলাপকারী। অরবে—নিঃশব্দে।

যেন তরু…খুলি সাজ—বৃক্ষতলে ঝরিয়া-পড়া ফুলগুলি যেন সীতার প্রতি সমবেদনায় অশ্রুমোচনের ছদ্মরূপ।

বীচি-রবে—তরঙ্গশব্দে। বারীশ—সমুদ্র।

দূরে প্রবাহিণী…কাহিনী—বাতাসের মর্মরধ্বনি, বৃক্ষের পুষ্পমোচন, নদীর কলশব্দ যেন সকলই সীতার দুঃখের প্রতি সমবেদনাতুর।

প্রভা…ধামে যেন—আলোকহীন পুরীতে উজ্জ্বল শিখার মত।

রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে—বিভীষণ-পত্নী সরমাকে দেখিয়া মনে হয় যেন স্বয়ং রক্ষঃকুল-লক্ষ্মী রাক্ষসবধূর বেশে উপস্থিত হইয়াছেন।

এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
৮০ এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলংকার, বুঝিতে না পারি?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
৯০ পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ! মৃদু-স্বরে কহিলা মৈথিলী,—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কা-পুরে—ধীর রঘুনাথে!

এয়ো—সধবা।

কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ—বনজ পুষ্পের পর্ণ ছিন্ন করা যেন বিশ্বসৌন্দর্য ও বিশ্বনীতি লঙ্ঘনের ন্যায় অপরাধজনক।

সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—অপহৃতা হইবার কালে সীতা আপন অলংকারগুলি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; সেই চিহ্ন অনুসরণ করিয়াই রামচন্দ্র সীতার সংবাদ পাইয়াছেন।

মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
১০০ যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে ?"
কহিলা সরমা,—"দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
১১০ এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুর-ভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—'হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
১২০ বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি

মণি, মুক্তা…এ ধনে—স্বামীই নারীর শ্রেষ্ঠতম অলংকার, সুতরাং স্বামীর সহিত মিলনের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য অলংকার সীতার নিকট অবহেলার সামগ্রী।

গোমুখী—গঙ্গা-নির্গমন-পথ।

নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু : কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !
"ভুলিনু পূর্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
১৩০ রঘু-কুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !
কুটিরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ ! কোন্ রানী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্তক, নর্তকী,
১৪০ এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহংগম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,

পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি—মধু বা বসন্তঋতু পঞ্চবটী বনে সর্বদাই বিরাজমান ছিল।

বৈতালিক—স্তুতিগায়ক। করভ—হস্তিশাবক।

যথা বাসবের···শিরে—মেঘের উপরে ইন্দ্রধনু ন্যায় বিচিত্র বর্ণের পক্ষীর উল্লেখ।

পালিতাম·· বারিদ-প্রসাদে—মেঘজল-পুষ্ট নদীর দ্বারা মরুতৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পিপাসা নিবারণের ন্যায় সীতাও রামচন্দ্র-আনীত শস্যভাণ্ডারের দ্বারা আরণ্যক জীবজন্তুর পরিতোষ বিধান করিতেন।

মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি-সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
১৫০ (অমূল-রতন-সম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
১৬০ কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে,—
"স্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা!),—"এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
১৭০ কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ

সরসী আরসি মোর—স্বচ্ছ সরোবরই সীতার মুকুরস্বরূপ ব্যবহৃত হইত।
কুবলয়—নীলপদ্ম। অমূল—অমূল্য।
আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরে পদ্মের ন্যায় যে রামচন্দ্র।
প্রিয়ম্বদা—মিষ্টভাষিণী। কাদম্বা—কলহংসী।

দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে!
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে! হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
১৮০ সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটিরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার-ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
১৯০ তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,

অরক্ষ-পুরে—রাক্ষসপুরে।

কান্তার-কান্তি—নিবিড় বনরাজির অপূর্ব শোভা।

সৌর-কর-রাশি…পদ্মবনে—পদ্মবনে সৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্যকিরণসমূহ দেখিয়া দেবকন্যার লীলা বলিয়া বোধ হইত। অজিন—মৃগচর্ম।

কুরঙ্গিণী-সঙ্গে……বনে—অরণ্যের মৃগীদের সহিত আনন্দে সীতা নৃত্য করিতেন।

গুঞ্জরিলে……বরিতাম তারে—সীতা যে নবলতিকার বিবাহ দিয়াছেন, তাহার সদ্যোজাত মঞ্জরীতে পুনরায় ভ্রমর সমাগম ঘটিলে সীতা ইহাদের সহিত পৌত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিতেন। মধুসূদনের অন্যতম সুহৃৎ সমালোচক এরূপ উদ্‌ভট কল্পনার জন্য মধুসূদনকে তিরস্কৃত করিয়াছিলেন।

নাতিনী-জামাই বলি বন্দিতাম তারে
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
২০০ বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও, এ বিজন-বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর-বাণী !—
২১০ সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সংগীত ?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,—
"শুনিলে তোমার কথা,—রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে। ইচ্ছা করে ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
২২০ মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,

জগৎ-আনন্দ তুমি ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
২৩০ মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখি যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"

কহিলা রাঘব-প্রিয়া "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা শূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
২৪০ তার কথা! ধিক্ তারে! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে!
সভয়ে পশিনু আমি কুটির-মাঝারে।
কোদণ্ড-টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,

দেখ চেয়ে নীলাম্বরে……কহিনু তোমারে—সীতার কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সংগীততুল্য কাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য স্বয়ং ঊর্ধ্বাকাশের চন্দ্রও উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, কোকিলেরা সীতার মুখের কথা শুনিবার জন্য গান বন্ধ করিয়াছে। চন্দ্রের ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ ও কোকিলের ক্ষান্তগীতি হওয়া পরোক্ষে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রমের ঘোষণা করিতেছে।

কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
২৫০ অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কতক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত, 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি'?—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
২৬০ মূর্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা!
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখির ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে!
কতক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি, "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
২৭০ মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা,—
"কি দোষ তোমার, সখি, শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্বকথা। মারীচ কি ছলে

যথা যবে ঘোর বনে ·····সরমার কোলে—অদৃশ্যভাবে আত্মগুপ্ত ব্যাধের কুশলী শরে যেরূপ বিহঙ্গ ভূপতিত হয়, সেইরূপ রামচন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠের স্মৃতি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় সীতাকে মূর্ছিত করিয়া ফেলিল।

(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি !)
ছলিল, শুনেছ তুমি শূর্পণখা-মুখে।
হায় লো কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি ! ধনুর্বাণ ধরি
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
২৮০ বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী !
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?
মরি আমি !' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী !
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;
'যাও বীর ; বায়ুগতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন রথি !'
২৯০ কহিলা সৌমিত্রি, 'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন-বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?'—আবার শুনিনু

মাগিনু কুরঙ্গে আমি—স্বর্ণমৃগ কামনা করিয়াছিলাম।

বারণারিগতি—সিংহগতি।

কে পারে হিংসিতে……গুরু বলে—পরশুরামের শক্তি অপেক্ষাও যিনি শক্তিমান, রঘুবংশের যিনি অলংকারস্বরূপ, সেই রামচন্দ্র—কে তাঁহার শত্রুতা সাধন করিতে পারে ?

আর্তনাদ, 'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
৩০০ ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে,—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্মতি!
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি;
দেখিব করুণ-স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে?' ক্রোধ-ভরে আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
৩১০ পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা,—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা!
যাই আমি; গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,
৩২০ কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি, মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ, করভী

ঘোর বনে…দুর্মতি—লক্ষ্মণের নিষ্ঠুরতায় তাহার মনুষ্যজন্ম সম্পর্কে সীতা সন্দেহ পোষণ করিতেছেন। যেন লক্ষ্মণ বাল্যাবস্থায় জননী-ক্রোড়চ্যুত হইয়া সিংহীর স্তন্যদুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়াছেন, তাই তাহার স্বভাবে এইরূপ পাশবিক হৃদয়হীনতা দৃষ্ট হইতেছে। সদাব্রত—অন্ন বা খাদ্য-বিতরণ-ব্রত।

আসি উত্তরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প বেশে,
বিমল-সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
কহিল মায়াবী, 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
৩৩০ (অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত অতিথে।'
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা, নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
৩৪০ জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?

বৈশ্বানর-সম—অগ্নিতুল্য। বিভূতি—ভস্ম।

কমণ্ডলু—যোগীদের পাত্রবিশেষ।

ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প বেশে—আরণ্যক পশুপক্ষী নির্দোষ জীব প্রভৃতির মধ্যে সর্বনাশের মত রাবণের অনুপ্রবেশ যেন শুভ্রকায় পুষ্পপল্লবে আত্মগোপনকারী সর্প। রাবণের তপস্বীরূপ, বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ, কমণ্ডলু-ধারণ, জটাজূট—এইগুলির অন্তরালে তাঁহার কুটিল দুষ্টপ্রকৃতিকেও পুষ্পান্তরালস্থিত কালসর্প বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

অজিনাসনে—হরিণচর্মের আসনে। প্রতারিত রোষ—কৃত্রিম ক্রোধ।

দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাস্থর তব আমায় তখনি!

"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
৩৫০ ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর-গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দূলে
মুহূর্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
৩৬০ এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পুরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি,
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?

দুরন্ত রাক্ষস···মোর শাপে—ইহাই অপরাধপ্রবণ রাবণের চরিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। সীতা ভিক্ষা না দিলে রাবণের তথাকথিত ব্রহ্মশাপে দুরন্ত রাক্ষস সীতাকান্ত রামচন্দ্রের শত্রুতে পরিণত হইবে, ইহা তাঁহার বাসনার কথা। সীতা ভিক্ষা দিলেও রাক্ষস রামচন্দ্রের শত্রুতে পরিণত হইয়াছে।

ইরম্মদাকৃতি—বজ্রাগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল অতর্কিত।

বারি-ধারা দমে কি তাহারে?—অর্থাৎ অশ্রুসিঞ্চনের দ্বারা কঠিন রাবণ-চিত্ত বিগলিত হইল না।

অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া ?
"দূরে গেল জটাজুট ; কমণ্ডলু দূরে !
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
৩৭০ কভু রোষে গর্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা। স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্তনাদ ! প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
৩৮০ কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ; ছড়াইনু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি ;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার !" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দুনিভাননা,—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে !

রাজরথী-বেশে—জটাজুট ও তপস্বীবেশ দূরে নিক্ষেপ করিতেই রাবণের রাজকীয় রূপ প্রকাশ পাইল।

কাল-সর্প-মুখে কাঁদে যথা ভেকী—সর্পের মরণকামড়ে স্ত্রী-ব্যাঙ যেরূপ আর্তরব করিয়া থাকে।

ফাঁফর—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইন্দুনিভাননা—চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার।

৩৯০ বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে ?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখি
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখি যথা কাঁদে ছট্‌ফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি !
" 'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন বিজয়ী !
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
৪০০ বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু ! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে !
হে ভ্রমর মধুলোভী, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল ! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে !'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
"চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
৪১০ অভ্রভেদী গিরিচূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিয়া ?—
"কতক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ংকর ! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজি-রাজী, স্বর্ণ-রথ চলিল অস্থিরে !

দূত-পদে…আমি—আকাশ ও সমীরের শব্দ ও গন্ধ-বহন-ক্ষমতার জন্য সীতা কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকট সীতার দুর্ভাগ্যের সংবাদ বহন করিবার দৌত্য-দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত করা হইল।

বারিদ—বারিবর্ষণকারী অর্থাৎ মেঘ।

দেখিনু মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ। 'চিনি তোরে', কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
৪২০ কোন্ কুল-বধূ আজি হরিলি, দুর্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্যকর্ম, জানি।
অস্ত্রি-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ন শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে, রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জিলা শূরেন্দ্র।
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু, রয়েছি
৪৩০ ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুংকার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সংকটে
দাসীরে। উঠিনু ভাবি, পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!

গিরি-পৃষ্ঠে বীর—রামায়ণে বর্ণিত জটায়ু।

এই তোর নিত্যকর্ম—জটায়ুর মুখে নারীহরণ-ব্যাপারকে রাবণের নিয়মিত অপরাধরূপে ঘোষণা করিয়া কবি রামায়ণের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ চরিত্রের আনুপূর্বিক সংগতি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

অস্ত্রি-দল-অপবাদ—বীরকুল-কলঙ্ক। পামর—নরাধম। স্যন্দনে—যুদ্ধরথে।

অবলা-রসনা—নারীর স্বভাবকুণ্ঠিত বাক্‌শক্তি। বিপিনে—কাননে।

৪৪০ আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি!
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি!
কাঁপিল বসুধা, দেশ পূরিল আরাবে।
৪৫০ অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মন দিয়া শুন, সই, অপূর্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি, বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী,—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম। এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!

আরাধিনু—স্তব করিলাম। তরাও—ত্রাণ কর। আরাবে—ঘোরধ্বনিতে।

এ ভার আমি সহিতে না পারি—রাবণের পাপের ভারে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বসুন্ধরার পক্ষে তাহা দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা দ্বিতীয় সর্গে রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠে প্রথম কথিত হইয়াছিল। এখন সীতার নিকট সীতা-জননী বসুন্ধরার মুখে তাহা পুনরুক্ত হইয়াছে।

ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে—সীতাহরণের পাপেই যদি রাবণের সর্বনাশ ঘটে, তবে রাবণ ও লঙ্কাপুরীকে বিনষ্ট করিবার জন্যই সীতার জন্ম, এই জাতীয় পৌরাণিক কল্পনা অবান্তর। সীতাহরণই রাবণের অমানবিক অপরাধ—সুতরাং সীতাহরণের পূর্বে তাঁহার সম্পর্কে শাস্তিবিধানের প্রশ্ন কেন উঠিবে? ইহা রাবণচরিত্র সম্পর্কে কবির মনঃস্থিরতার অভাবের উদাহরণ।

যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্মতি
৪৬০ রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে !
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি !—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি ; দেখ চেয়ে।'
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;
পঞ্চ জন বীর তথা, নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন ! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
৪৭০ কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্র পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে,
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে !
সভয়ে মুদিনু আঁখি ! কহিলা হাসিয়া

অভ্রভেদী গিরি – অর্থাৎ রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যমূক পর্বত।

পঞ্চ জন বীর—কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালি কর্তৃক নির্যাতিত নল, নীল, হনুমান, জাম্বুবান ও সুগ্রীব।

সুন্দর নগরে—অর্থাৎ কিষ্কিন্ধ্যায়।

মারি সে দেশের রাজা– অর্থাৎ বালি বধ করিয়া।

বসাইলা……পঞ্চ জন মাঝে—সুগ্রীবকেই সিংহাসনে বসানো হইল।

ধাইল চৌদিকে দূত—সীতার সংবাদ-সংগ্রহার্থে সুগ্রীব চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন।

৪৮০ মা আমার, 'কারে ভয় করিস্‌; জানকি?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর! বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলি-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্‌ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল, জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুংকারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে,
৪৯০ পুরিল জগৎ, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
"উত্তরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা! শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম-পরাক্রমে
উপাড়ি ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে

নির্ঘোষে—শব্দে।

ভাসিল সলিলে শিলা—সমুদ্রে সেতুবন্ধনের জন্য রামচন্দ্র ও বানর।সৈন্যদল কর্তৃক সমুদ্রে প্রস্তর প্রদান করিলে তাহা ভাসমান রহিল। এই অসম্ভব ব্যাপার যে রাবণের প্রতি ভাগ্যবিমুখতার প্রমাণ, তাহা প্রথম সর্গে রাবণ কর্তৃক আক্ষেপসহকারে উক্ত হইয়াছে।

শৃঙ্গধরে—অর্থাৎ পর্বতকে।

আপনি বারীশ•• পায়ে—রামচন্দ্রের অনুরোধে সমুদ্রাধিপতি যে আপনার অলঙ্ঘনীয়তাকে খর্ব করিয়া আপন চরণে সেতুরূপ শৃঙ্খল পরিধান করিয়াছেন, দুস্তর মহাসমুদ্র সম্পর্কে ইহাও প্রথম সর্গে রাবণের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের মধ্য দিয়া উক্ত হইয়াছিল। তবে সীতা ইহাকে রামচন্দ্রের আদেশে সমুদ্রের শৃঙ্খলধারণ বলিয়াছেন, রাবণ আদেশের বদলে অনুরোধ বলিয়াছিলেন।

লজ্জি, বীর-মদে পার হইল কটক !
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরি-পদ-চাপে,—
৫০০ 'জয়, রঘুপতি, জয় !' ধ্বনিল সকলে !
কাঁদিনু হরষে, সখি ! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃকুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্মসম
বীর এক ; কহিল সে 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি ; নতুবা মরিবে
সবংশে !' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী !
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
৫১০ "হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?"
"জানি আমি", উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী-মম
পরম ! সরমা সখি, তুমিও তেমনি !
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়াগুণে !
৫২০ কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব স্বপন ;—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে ?

কটক—সৈন্যদল। ধীর ধর্মসম বীর এক—সত্যনিষ্ঠ বিভীষণ।
বীর-কুঞ্জর—বীর-শ্রেষ্ঠ। হুতাশন-সম—অগ্নিসম।

বহিল শোণিত-নদী ! পর্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ংকর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব;
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহংগম ; পালে পালে শৃগাল ; আইল
৫৩০ অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
"দেখিনু কর্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই ! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে ?'
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা
৫৪০ ঘোর রোলে ; নারী-দল দিল হুলাহুলি।
বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিলা তাহার শির ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। 'জয় রাম' ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই ! কাঁদিল রাবণ !
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে !
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন ! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
৫৫০ 'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার !

কবন্ধ—মস্তকরহিত প্রেত দেহ।
কর্বুর-নাথে—রাক্ষসাধিপতি রাবণকে।
লাঘব-গরব—হৃতগর্ব।

পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম, মা, মোরে !' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি !
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
৫৬০ দুরন্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে, 'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে !'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি,
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙালিনী সীতা,
কাঙালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি !'
৫৭০ "উত্তরিলা সুর-বালা, 'শুন লো মৈথিলি !
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা !'

পরেরে কাতর...... দাসী—সীতা মধুসূদনের ভাষায় 'ভবতলে মূর্তিমতী দয়া'—দয়াপরায়ণতা পরদুঃখকাতরতা কোমলতাই তাহার স্বভাব। প্রমীলা মধুসূদনের প্রেয়সী কবিকল্পনা, সীতা জননী কবিকল্পনা।

সুর-বালা-দলে—দেবকন্যাগণকে।

মন্দারের—স্বর্গীয় নন্দনকাননের দুর্লভ একপ্রকার পুষ্পের।

অবগাহ...আভরণ—দীর্ঘকাল অযত্ন-রক্ষিত বিমলিন দেহ ধৌত করিয়া এখন স্বর্ণালংকারে ভূষিত কর অর্থাৎ বাঞ্ছিত স্বামীমিলনের জন্য শুচিসুন্দর বেশে প্রস্তুত হও।

"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালা!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটী,
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
৫৮০ আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি। কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা, "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
৫৯০ সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে?
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে,—

কাঁদিয়া হাসিয়া—দীর্ঘ বিরহদুঃখের স্মৃতিতে এবং আসন্ন দুঃখাবসানের সম্ভাবনায় শোক ও উল্লাসের মিশ্রিত অনুভূতি।

দেব অংশুমালী—সূর্যদেবতা।

আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে—সীতাহরণকালে জটায়ুর সহিত রাবণের সংঘর্ষকালে সীতাকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাইবার উদ্দেশ্য, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় সীতার নৈরাশ্যকে তীব্র করা মাত্র।

জিষ্ণু—জয়শীল। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ।

"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !
"কহিল রাঘব-রিপু, 'ইন্দীবর আঁখি
৬০০ উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দুনিভাননে,
রাবণের পরাক্রম ! জগৎ-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে !
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন।
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্বরে ?'
" 'ধর্ম-কর্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ' ;—কহিলা শূর অতি মৃদুস্বরে—
'সম্মুখ-সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া ?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে !
৬১০ কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি সংকটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে !'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা !
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লংকাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,

তুঙ্গ—উন্নত শিখরবিশিষ্ট। উন্মীলি—খুলিয়া।
হীনায়ু—মুমূর্ষু।

ধর্ম-কর্ম সাধিবারে—নির্যাতিত নারীকে রক্ষা-করা বা মুক্ত-করা-রূপ বীরধর্ম পালনে।

শৃগাল হইয়া……সিংহীরে—সীতার পরিচয় জটায়ুর বিদিত ছিল না, কেবল নারীহরণজনিত অপরাধই তাঁহার ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াছিল। রাবণ যেরূপ মহাবীর হউন না কেন, নারীহরণরূপ গর্হিতকর্ম শৃগালের পক্ষে সিংহীর প্রতি লোলুপ হওয়ার মত ব্যাপার বলিয়া জটায়ু মৃত্যুপূর্বে রাবণকে ভৎর্সনা করিয়াছেন।

কৃতাঞ্জলি-পুটে—করজোড়ে।

বীরবরে, 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
৬২০ শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্মিময়! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কা-পুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
৬৩০ রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখি? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী,

বীরবরে—অর্থাৎ সেই মৃতপ্রায় জটায়ুকে।
নীলোর্মিময়—সুনীল তরঙ্গমুখর। বারীশে—সমুদ্রদেবতাকে।
অনম্বর-পথে—শূন্য পথে।
মনোরথ-গতি—মনের ইচ্ছাশক্তির ন্যায় দ্রুতবেগে।
রঞ্জনের রেখা—চন্দনতিলক।

৪০ সরমার গলা ধরি; কাঁদিলা সরমা।
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা, "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
৬৫০ শব-রাশি! কাণ দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা-বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্বরী তব। ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
৬৬০ সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে!
কিন্তু নহে দোষী দাসী?" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী, "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী

বিধির নির্বন্ধ—বিধির বিধান।
বীরযোনি—বীরপুত্র-জন্মদায়িনী লঙ্কাপুরী। ভুঞ্জিছে—ভক্ষণ করিতেছে।
আশু—শীঘ্র। বিদ্যাধরী-দল—স্বর্গীয় নৃত্যগীত-পরায়ণা নারীবৃন্দ।
মন্দারের দামে—মন্দার পুষ্পমাল্যে। ভেটিবে—মিলিত হইবে।
সরস বসন্তে…মধুরে—মধুর বসন্তকালকে পৃথিবী যেরূপ অভ্যর্থনা করে।
কৌমুদিনী-ধনে—জ্যোৎস্না-রূপ সম্পদকে।

তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে !
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে !
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনী-রূপী
৬৭০ এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি !
আর কি কহিব, সখি ? কাঙালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন ! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা,
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি !
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
৬৮০ রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সংকটে !"
কহিলা মৈথিলী, "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

ভুজঙ্গিনী-রূপী শিরোমণি—বিষাক্ত সর্পের মস্তকস্থিত মণির ন্যায় এই ভয়ংকর লঙ্কাপুরীর ঊর্ধ্বে স্থাপিত রত্নতুল্য নারী।

মহার্হ—দুর্মূল্য। কুরঙ্গী—হরিণী।

মেঘনাদবধ কাব্য

সাধারণ আলোচনা

মধুসূদনের কাব্যকীর্তি

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা দেশ ও বাঙলা সাহিত্য পুরাতন যুগের সকল সংস্কার ও বিশ্বাস, রীতি ও প্রকৃতির প্রাচীরলিখন সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া দিয়া বিজয়ী শাসকজাতির দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা ও সভ্যতার মন্ত্রে দ্বিজত্ব লাভ করিল। আধুনিক বাঙলা কবিতার নূতন যাত্রাপথ খনিত হইল, ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈদ্যুতিক লক্ষণগুলিকে আত্মসমীকৃত করিয়া আধুনিক কবিগোষ্ঠী বঙ্গভারতীর বীণার সকল তন্ত্রীগুলিকেই একেবারে নূতন করিয়া যোজনা করিতে সচেষ্ট হইলেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিধর্মের শাণিত প্রয়োগে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন, নবযুগের মূল্যবোধের দ্বারা পুরাতন বিশ্বাস ও সংস্কারগুলিকে বাজাইয়া লইবার প্রবণতা, মনুষ্যত্ব-মহিমা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিনব আত্মবিশ্বাস, অপ্রাকৃত দৈবানুগত্য পরিহারপূর্বক আত্মস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ববোধের প্রতিষ্ঠা এইগুলিই নতুন কালের সাহিত্য-চিন্তায় প্রাধান্য লাভ করিল। "মধুসূদনের পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরবর্তী অধ্যায়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই আধুনিক কাব্যের বৈজয়ন্তীটি সুপবনে উড্ডীন হইয়াছিল। রঙ্গলালের ইংরাজি-শিক্ষা গুরু ঈশ্বরচন্দ্র অপেক্ষা প্রবীণ ছিল এবং মার্জিত মন ও শিষ্ট অনুশীলনের দ্বারা কবিতায় প্রাচীনত্বের শেষ মুদ্রাচিহ্নটি তিনি লুপ্ত করিয়া দিলেন। ইতিহাস-চেতনার সহিত দেশ-প্রেমের বার্তা বহন করিয়া যুগচিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিল তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। অন্তঃপুরিকা নারীকে তিনি নূতন কালের বীরাঙ্গনারূপে দেখিলেন। বীরত্বব্যঞ্জক উপকথা, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, উত্তেজক ভাষা ও ছন্দ, জীবন-ইতিহাসের স্বপ্নকল্পনা—ইহাই রঙ্গলালের কাব্যসাধনা। রঙ্গলালের খনিত পথে সমুদ্রকল্লোলে আবির্ভূত হইলেন মধুসূদন দত্ত। ইউরোপীয় কাব্যসাধনায় তাঁহার কবিধর্ম পরিপুষ্ট হইয়াছিল। নতুন কালের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তিবাদ, কাব্যকলার অভিনব সংস্কার, নবীন সমাজের ব্যক্তিত্বপ্রধান পুরুষ ও নারী-চরিত্র, দেশগৌরব ও মনুষ্যচেতনা মধুসূদনের কাব্যকে দেশজ সংস্কারের সংকীর্ণতা হইতে বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থাপিত করিয়াছে। গ্রীক-রোমক সাহিত্যের জীবনাদর্শ, ইতালীয় নবজাগৃতির মানবতাবাদ, মিলটনের জলদ-গম্ভীর ছন্দধ্বনি, ইহার সহিত বাল্মীকি-বেদব্যাসের কাব্যাদর্শ, কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ—এই সাধনার ধারা মধুসূদনের খেয়ালে মিলিত

হইয়াছে। পয়ার-ত্রিপদীর আড়ষ্টতার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বীর্যবান প্রবাহ বাঙলা কাব্যকে বহু শতকের জড়তা হইতে মুক্ত করিল। পাশ্চাত্য মনীষী এনার্সন বলিয়াছেন, The greatest genius is the most indebted man, ইহা মধুসূদন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য আত্মসাৎ করিয়াই বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যশোহর সাগরদাঁড়ি গ্রামে তাঁহার বাল্যজীবন, কলিকাতায় কৈশোর-যৌবন কাটাইয়া এবং মাদ্রাজে কিছুকাল অবস্থান করিয়া মধুসূদন জীবনে ও জীবিকায় আত্মপ্রকাশের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের ফলে বিদেশযাত্রায় সুবিধা হইবে মনে করিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভব হয় নাই। অথচ শিক্ষাদীক্ষায় তিনি ছিলেন ত্রুটিহীন আধুনিক যুগের প্রতিনিধি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং ১৮৫৮ হইতে ১৮৬২-র মধ্যেই বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক কবি ও নাট্যকারের মর্যাদা লাভ করেন। ইহার পর ১৮৬৫ সালে ফরাসীদেশে অবস্থানকালে তাঁহার কাব্যপ্রতিভার অন্তিম স্ফুরণ ঘটে। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার রচনার পরিমাণে নয়, অভিনবত্ব মৌলিকতা ও প্রান্তরের মধ্য দিয়া প্রশস্ত পন্থা নির্মাণে। তাঁহার প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'—বাঙলা ভাষায় লেখা প্রথম পৌরাণিক বিষয়-অবলম্বিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত রোমান্টিক আখ্যানকাব্য। 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা, বীররসাত্মক মহাকাব্য। 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা'য়ও পৌরাণিক অনুবৃত্তি, তবে, আঙ্গিক গীতিকবিতাধর্মী। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পত্রকাব্য। সর্বশেষ কাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম সনেট, মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের ও তাঁহার মনোলোকের বিবিধার্থ-সংগ্রহ। ইহা ব্যতীত 'শর্মিষ্ঠা' 'পদ্মাবতী' 'কৃষ্ণকুমারী' 'মায়াকানন' ইত্যাদি নাটক, 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক দুইটি প্রহসনও তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তির উপযুক্ত পরিচয়। আটশত বৎসরের পয়ার ত্রিপদীর সংকীর্ণ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অমিত্রাক্ষরের স্বাধীনতা দান, সনেটের মত গীতিকবিতার আঙ্গিকসৃষ্টি তাঁহার কবিজীবনের মহত্তম কীর্তি।"

সংখ্যার দিক দিয়া মধুসূদনের সমকালীন ও ঈষৎ পরবর্তী কবিরাও কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন, কিন্তু প্রতিটি সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া এরূপ কোনো যুগান্তকারী মৌলিকত্ব অন্য কোনো কবির মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

মধুসূদনের প্রতিভা কেবল কাব্যকলা-সংস্কারেই তৃপ্ত হয় নাই, সর্বপ্রকারে নূতন যুগ ও ভাবধারার ধ্রুবপদটিকে ধ্বনিত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতার সহিত রোমান্টিক ভাবধারার প্রণয় ঘটিয়াছে, মেঘনাদবধ কাব্যে নিয়তি ও দৈবনির্যাতিত শক্তিধর পুরুষের ব্যর্থ সংগ্রামে মনুষ্যত্বের অপরাজেয় মহিমা সকল হীন লাঞ্ছনার মধ্য হইতেও অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে। গীতিরসোদ্বেল বাঙালী জীবনে মহাকাব্যের এই বিপুল ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেই মধুসূদনের প্রতিভা মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া থাকিবে। পৌরাণিক নীতিবোধকে চূর্ণ করিয়া মধুসূদন রামের দৈব-মাহাত্ম্যের পাশে পুরুষকার জাতীয়তা ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও ইহার কাহিনী মধুসূদনের আপন অদৃষ্ট-নির্যাতিত জীবনের সহিত ঐকরূপ্য লাভ করিয়া রাবণকে মধুসূদনের মতই ভাগ্যহত অথচ অনমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বীরত্বের গগনচুম্বী শিখরেই দুরদৃষ্টের বজ্রপাত সর্বাধিক বাজিয়াছে বলিয়া ইহার প্রচণ্ড আস্ফালনের মধ্যে ট্র্যাজেডির গভীর ক্রন্দন ইহাকে শুষ্ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহাকাব্য না করিয়া নবজীবনের আত্মচরিত করিয়া তুলিয়াছে। সমুদ্রবারির বিশাল তরঙ্গগর্জন স্তিমিত হইয়া নদীখাতে প্রবেশ করিলে কলস্বনা তটিনীতে পরিণত হয়। মেঘনাদবধের জলদগম্ভীর কণ্ঠ ব্রজাঙ্গনায় অনুপস্থিত। এখানে বৈষ্ণব কবির রাধিকা মধুসূদনের কাব্যনায়িকা, তাহার করুণ কোমল কণ্ঠস্বরে রোমান্টিক প্রেমের গীতিমূর্ছনা. প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্য ও ঋতুর পুষ্পপল্লব তাহাকে সাতরঙে রাঙাইয়া যায়। অন্তঃপুরচারিণী অবরুদ্ধা নারীর জন্য মধুসূদনের একটি আজন্ম সহানুভূতি ছিল। ইহার সহিত নবকালের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও সংস্কারহীন প্রেমচেতনা মিলিত হইয়া ব্রজাঙ্গনা কাব্যের জন্ম দিয়াছে। নারীর প্রতি আকর্ষণ, নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, নারীর সৌন্দর্য-কোমলতা ও বীর্যশালিতার যুগপৎ চিত্রণে তাঁহার আগ্রহ, তিলোত্তমা সীতা প্রমীলা ও রাধাচরিত্রেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। রোমক পত্রকাব্যের আঙ্গিক-সাদৃশ্যে একাদশটি পৌরাণিক নারীর আত্মবিবৃতি সংগ্রহ করিয়া মধুসূদন নবীনচিত্তের নূতন নারীবন্দনা রচনা করিলেন বীরাঙ্গনা কাব্যে। কুলাচার, শাস্ত্রীয় বাধা, সামাজিক অবরোধ কিংবা চিত্তের সংস্কার হইতেও প্রেম বড়, স্বাধীন হৃদয়ের নির্বাচন বড়, দুই নয়নের কিরণ-সম্পাতে অপরের নয়ন-বরণের আদর্শ বড়, এই বলিষ্ঠ ঘোষণাই বীরাঙ্গনা কাব্যের মর্মবাণী।

ইহার পর ফরাসী দেশে অবস্থানকালে মধুসূদন তাঁহার সারস্বত জীবনের শেষ নৈবেদ্য চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। সনেট নামক কলাকৃতির প্রবর্তন করিয়া বাঙলা গীতিকাব্যে তিনি যেমন নূতন উপনিবেশের সৃষ্টি করিলেন, সেইরূপ এই খণ্ড কবিতাবলীর ভিতর দিয়া মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবনের অশ্রুবেদনা প্রেমব্যর্থতা দেশপ্রীতি ও সাহিত্য-চেতনা, স্মৃতি ও সৌহার্দ্যের ফলে এক অপরূপ চলচ্চিত্র রূপায়িত হইয়াছে। কাব্যসৃষ্টি ছাড়া নাট্যরচনায় তাঁহার প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু নাট্যরচনা অপেক্ষা কাব্যসৃজনেই মধুসূদনের অবিস্মরণীয় গৌরব। পুরাতন ছন্দের ভগ্ন গৃহভিত্তির উপর তিনি অমিত্রাক্ষরের সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন, বাঙলা কাব্যের বাকৃপ্রতিমাকে নূতন সাজে অলংকারে জগন্মোহিনী করিয়া তুলিয়াছেন। গীতিকবিতা ও মহাকাব্য, বলিষ্ঠতা ও কোমলতা, বীররস ও করুণরস—এই দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শ সৃষ্টিতে তাঁহার অনায়াস-নৈপুণ্য বাঙলা কাব্যকে ভাবালুতা ও অশ্রুপ্লাবন হইতে চিরকালের মত বাঁচাইয়া দিয়াছে।”

মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা

মেঘনাদবধ কাব্য মধুসূদনের কবিকর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। “এই কাব্যে মধুসূদনের বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার তূর্যনিনাদ ধ্বনিত হইয়াছে। হোমার-ভার্জিল টাস্সো, দান্তে-মিলটন, ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-কৃত্তিবাস, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তির গৌরব আত্মসাৎ করিয়া মধুসূদন জাতীয় জীবনের এই অমর মহাকাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। রামায়ণের মেঘনাদবধ ইহার কাহিনী হইলেও রামায়ণের সংস্কার কবি গ্রহণ করেন নাই। ইহার বিষয় কেবল রামরাবণের সংঘর্ষের কাহিনী নয়, পৌরাণিক আধারে পরিবেশিত নবযুগের সঞ্জীবনী সুধা। অপ্রতিবিধেয় দৈবের সহিত অনমনীয় পুরুষকারের এক রক্তাক্ত কাহিনী মেঘনাদবধের প্রচ্ছদপটের অন্তরালে গোপন রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এই পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও

শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের মধ্যেই মেঘনাদবধ কাব্যের সত্যপরিচয় সংক্ষেপে স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য নয় সর্গে রচিত, ইহার সূচনা বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদে রাবণের বিলাপ এবং সেনাপতিপদে ইন্দ্রজিতের অভিষেকের দ্বারা। দ্বিতীয় সর্গে দেখা যায়, দেবলোকে ইন্দ্রজিৎ-বধের ষড়যন্ত্র চলিয়াছে এবং ইন্দ্রের প্ররোচনায় মহাদেবকে কামোন্মত্ত করিয়া পার্বতী তাঁহার নিকট হইতে মেঘনাদবধের উপায় জানিয়া লইলেন। যুদ্ধায়োজনের জন্য মেঘনাদ যখন লঙ্কায় কর্তব্যরত, প্রমোদকানন হইতে বিরহকাতরা প্রমীলা তখন বীরাঙ্গনা সাজে রামচন্দ্রের সৈন্যাবরোধ ভেদ করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন, ইহাই তৃতীয় সর্গের বিষয়। সমগ্র লঙ্কায় মেঘনাদের অভিষেকে উৎসববাদ্য বাজিতেছে, এদিকে অশোককাননে অবনতমুখী বিষণ্নহৃদয়া সীতা বিভীষণ-পত্নী সরমার নিকট আপন মনোবেদনা ব্যক্ত করিতেছে, ইহাই চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধের আয়োজনের চিন্তায় স্বর্গীয় দেবতাগণ বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন; স্বপ্নের সহায়তায় মায়াদেবী লক্ষ্মণকে দিয়া মহাদেব-রক্ষিত রাবণের অভয়ামন্দিরে পূজার্ঘ্য নিবেদন করাইলেন, অন্যদিকে মাতৃবন্দনা করিয়া মেঘনাদ যজ্ঞগৃহের দিকে গমন করিলেন। চণ্ডীর আশীর্বাদে অব্যর্থ দেবঅস্ত্র সংগ্রহ করিয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কর্তৃক নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা ষষ্ঠ সর্গের বিষয়বস্তু। পরবর্তী সর্গে পুত্রশোকাতুর প্রতিহিংসাপরায়ণ রাবণের সহিত রামলক্ষ্মণ ও দেবসৈন্যের তুমুল রণ ও লক্ষ্মণের প্রতি রাবণের শক্তিশেল-প্রয়োগকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম সর্গে শক্তিশেলে অচৈতন্য লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের সন্ধান লাভের জন্য মায়াদেবীর সহিত রামচন্দ্র প্রেতপুরীতে গমন করিয়াছেন এবং দশরথের নিকট বিশল্যকরণীর সন্ধান পাইয়াছেন। সর্বশেষে সর্গে শোকাভিভূত

লঙ্কাবাসীর সহিত বজ্রাহত রাবণ সিন্ধুতীরের চিতাশয্যায় 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি'র অস্তাচল-গমনের আয়োজন করিয়াছেন, সতী প্রমীলা ও প্রিয়পুত্র মেঘনাদকে শ্মশানের অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করিয়া বিশদবস্ত্র ভাগ্যাহত রাবণ শূন্যগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অভিষেক, অস্ত্রলাভ, সমাগম, অশোকবন, উদ্যোগ, বধ, শক্তিনির্ভেদ, প্রেতপুরী ও সংক্রিয়া—এইগুলি নয়টি সর্গের কবিপ্রদত্ত নামকরণ।"

প্রথম সর্গের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

মহাকবি-বন্দিত কাব্যলক্ষ্মী সরস্বতীর বিনীত বন্দনা করিয়া, মধুকরী কল্পনাকে আহ্বান জানাইয়া মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ সূচনা করিয়াছেন। বহুমূল্য রত্নমাণিক্যশোভিত 'ভূতলে অতুল সভায়' স্বর্ণসিংহাসনে সপাত্রপরিষদ আসীন লঙ্কাবিপতি রাবণ। কিন্তু এই বৈভব-বিলাসের মধ্যবর্তী ব্যক্তিটি আজ রণক্ষেত্রে প্রিয় বীরপুত্র বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদে গভীর শোকে মুহ্যমান—যুদ্ধ-প্রত্যাবৃত্ত মকরাক্ষ নামক রাক্ষসের নিকট প্রাপ্ত এই তথ্যে রাবণ অবিশ্বাসে নৈরাশ্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। সামান্য মানুষ রামচন্দ্র এমন কী শক্তির অধিকারী হইল যে দেবত্রাস বীরবাহুকে বধ করিল, অপরাজেয় কুম্ভকর্ণ নিহত হইল, ইহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। যেন কোনও অলঙ্ঘনীয় নিয়তির করাল বাহু তাঁহার আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদে সর্বনাশের কলিমাময় বাহু প্রসারিত করিতেছে। রাজমন্ত্রী সারণ সাংসারিক জীবনের ক্ষয়ক্ষতি মৃত্যুদৈন্য সম্পর্কে রাবণকে শোকার্ত না হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রিয়পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য পিতৃহৃদয়ের শোক কোনও যুক্তি বা সান্ত্বনা মানিতে চাহে না, ইহাও সত্য। রাবণ ইহার পর বীরবাহুর মৃত্যুপূর্ব বীর্যবত্তার কথা প্রত্যক্ষদর্শী দূতমুখে শ্রবণের ইচ্ছা করিলে মকরাক্ষ বীরবাহুর অবিস্মরণীয় পরাক্রম ও প্রশংসনীয় যোদ্ধবলের বিস্তারিত বিবরণ দান করিল। এই বীরত্ব, ও পরিণামে রামচন্দ্রের হস্তে তরুণ বীরবাহুর শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী শ্রবণ করিয়া সভাজনের নয়নও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

মৃতপুত্রের বাহুগরিমায় ক্ষণিকের জন্য গর্বানুভব করিয়া রাবণ সভাসদ্‌বর্গের সহিত প্রাসাদশীর্ষে আরোহণপূর্বক বীরবাহুর রণক্ষেত্রে মহান্ পতনের দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করিতে চলিলেন। সৌধকিরীটিনী কনকলঙ্কা তাহার সুবিন্যস্ত দৃশ্যপট লইয়া রাবণের সম্মুখে প্রসারিত হইল, অন্যপার্শ্বে শত শত সৈন্য-বেষ্টিত যুদ্ধভূমি ও বহির্নগরীর শত্রুসৈন্যবাহিনীও দেখিতে পাইলেন। রণক্লান্ত

যুদ্ধভূমি তখন মৃত বীরদেহে স্তূপায়িত, মাংসভুক্ জীবজন্তু-সমাকীর্ণ। চারিদিকে ইতস্তত যুদ্ধসাজ ছড়াইয়া আছে। অন্তিমশয্যায় শায়িত বীরবাহুর জন্য রাবণের পিতৃহৃদয় পুনরায় হাহাকার করিয়া উঠিল। দূরবর্তী লঙ্কাভূমির প্রান্তস্পর্শী নীলাম্বুরাশির উপর রামচন্দ্র-রচিত বালুকাসেতুর দিকে দৃষ্টি পড়িতে রাবণের চিত্ত শ্লেষে পূর্ণ হইয়া গেল। মহাশক্তি দুর্জয় অলঙ্ঘনীয় দুরবগাহ জলধি আজ ক্ষুদ্র মানুষ রামচন্দ্রের অনুরোধে চরণে শৃঙ্খল পরিয়াছে—রাবণের অদৃষ্টগতিকে ইহাও সম্ভব হইয়াছে।

সভাস্থলে পুনরাগমনের পর বীরবাহুজননী রাবণমহিষী চিত্রাঙ্গদা শোকসন্তপ্ত উন্মাদবেশে সখীজনসঙ্গে প্রবেশ করিলেন। পুত্রহারা জননীর মর্মন্তুদ হাহাকারে সভাস্থলে সকলেই নিষ্ফল বেদনায় বিদীর্ণবক্ষ হইলেন, ছত্রধরের ছত্র ভূপতিত হইল, নিরুপায় করুণ ক্রোধে দৌবারিক অসি নিষ্কোষিত করিল। হাহাকাররূপ মেঘগর্জনে, আলুলায়িত-কুন্তলরূপ মেঘ-সমারোহে, অশ্রুবৃষ্টিধারায়, দীর্ঘশ্বাসবায়ুতে, যেন শোকের ঝড় বহিয়া গেল। ব্যথাহত কণ্ঠে জননী চিত্রাঙ্গদা রাবণের নিকট তাঁহার একমাত্র রক্ষোরত্নটিকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। কাঙালিনীর সযত্নধন অপহরণ করা রাজধর্ম নয়—রাবণ যেন রাজধর্মের বিরুদ্ধতা করিয়া তস্করের মত অভাগিনী জননীর সম্পদ হরণ করিয়াছেন। রাবণ এই অভিযোগের উত্তরে হতাশব্যাকুল কণ্ঠে জানাইলেন যে, এক অবিশ্বাস্য নিয়তির প্রভাবে তিনি অসহায়, চরম দুর্ভাগ্য-বশত আজ লঙ্কা বীরপুত্রহীনা হইতে বসিয়াছে। কেবল এক পুত্র নয়, রাবণের চিত্ত অহর্নিশি শতপুত্রশোকে বহ্নিমান। বিধাতা যেন বাত্যাতাড়িত শিমুল-বনের মত লঙ্কাকে বিধ্বস্ত করিবার আয়োজন করিতেছে। পুত্রের গৌরবভূয়িষ্ঠ বীরত্বের স্মৃতি যেন বীরপ্রসূ চিত্রাঙ্গদার সন্তপ্ত চিত্তকে সান্ত্বনায়িত করে, রাবণ এইরূপ অনুরোধ করিলে চিত্রাঙ্গদা এই মৃত্যুকে দেশবৈরীর সহিত সংগ্রাম, এইরূপ ব্যাখ্যায় অভিহিত করিবার যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইলেন না। কিসের জন্য দূর সরযূতীরবাসী ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত জলধিবেষ্টিত স্বর্ণলঙ্কাপুরীতে আসিল, ইহাই জননী চিত্রাঙ্গদার জিজ্ঞাসা। রামচন্দ্র বামন হইয়া প্রাংশুলভ্য স্বর্ণসিংহাসনের দিকে হস্তক্ষেপ করে নাই—সুতরাং রামচন্দ্রকে দেশবৈরী কেন তিনি বলিবেন। রামচন্দ্রের শত্রুতা রাবণেরই পাপে—একের কর্মফল অপরের সর্বনাশ ও সমগ্র দেশের গভীর দুর্গতির কারণ, এইরূপ অভিযোগ করিয়া রোরুদ্যমানা মহিষী অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

তখন শোকার্ত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ রাবণ স্বয়ং রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে চাহিলেন, সে আয়োজন সমগ্র নগরীতে সঞ্চারিত হইল, নানাবিধ সৈন্যবাহিনী ও সমরোপকরণ বিবিধ রণসূচক বাদ্যধ্বনি সহকারে প্রস্তুত হইতে লাগিল। কনকলঙ্কা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, সমুদ্রে তরঙ্গকল্লোল জাগিল। সে বিক্ষোভ চাঞ্চল্য ও ভূকম্পন দুষ্প্রবেশ্য সমুদ্রতলে সমুদ্রাধিপতি বরুণের স্ত্রী বারুণীর প্রসাধনকক্ষেও প্রবেশ করিল। কেশবিন্যাসরতা বারুণী ইহাকে সম্যপরাস্ত সমুদ্রশত্রু প্রভঞ্জন ও বায়ুর সমবেত পুনরাক্রমণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সহচরী মুরলার প্রদত্ত তথ্যে তিনি জানিতে পারিলেন যে, লঙ্কাপতি রাবণের সসৈন্য যুদ্ধায়োজনই এই জলস্থল-কম্পনের হেতু। স্বর্ণলঙ্কার রাজলক্ষ্মী বারুণীর পূর্বতন সখী, লঙ্কালক্ষ্মীর নিকট হইতে রাম-রাবণের যুদ্ধবিবরণের বিস্তৃত তথ্যসন্ধানের জন্য বারুণী তদ্দণ্ডেই সখীর নিকট কৌতূহলে মুরলাকে প্রেরণ করিলেন। সুবর্ণদীপ্ত সম্পদ ও মণিহর্ম্যে ভূষিত লঙ্কালক্ষ্মীর কমলালয়ে উপনীত হইয়া মুরলা লঙ্কায় অনুষ্ঠেয় যুদ্ধের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে বিষণ্ণবদনা রক্ষঃকুললক্ষ্মী রাবণের পাপের ফলে লঙ্কা কিরূপে সর্বনাশের পথে ধাবিত তাহা বিবৃত করিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মী এই অপরাধপঙ্কিল পুরী পরিত্যাগের জন্য চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। হীনবীর্য রাবণের দুর্মতির প্রতিক্রিয়ায় প্রতি গৃহে আজ অসংখ্য জননী পত্নী ও নারীদের প্রিয়জন-হারানোর বিলাপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ে দেউল-দুয়ারে দাঁড়াইয়া রাবণের সমরসজ্জার নাগরিক সমারোহ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মীদেবী মুরলাকে দৃশ্যমান রাবণ-সৈন্যের অন্তর্গত সেনাপতিদের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মেঘনাদের অনুপস্থিতিতে মুরলা বিস্ময় প্রকাশ করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া মেঘনাদের প্রমোদকাননে অবস্থানের সম্ভাবনার কথা বলিলেন। মুরলা দেবীর নিকট বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে পদ্মাক্ষী লক্ষ্মীদেবী বহির্লঙ্কায় অবস্থিত মেঘনাদের অপূর্বসুন্দর সুরক্ষিত প্রমোদকাননে উপস্থিত হইলেন এবং মেঘনাদের জনৈকা ধাত্রীর ছদ্মবেশে মেঘনাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করিলেন। ইতিপূর্বে মেঘনাদের সহিত সংগ্রামে রামচন্দ্রের শরবর্ষণে মৃত্যু ঘটিয়াছিল বলিয়া মেঘনাদ নিশ্চিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবনসংবাদে ও বীরবাহুর নিধনঘটনায় ইন্দ্রজিৎ বিস্মিত হইলেন। সেই মুহূর্তেই প্রমোদোদ্যানের পুষ্পাভরণ ছিন্ন করিয়া মহাক্রুদ্ধ

মেঘনাদ লঙ্কাভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাপূর্বে প্রাণপ্রিয়া পত্নী প্রমীলার নিকট রামচন্দ্রকে সংহারপূর্বক অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। মেঘনাদের আগমনে স্বর্ণলঙ্কা আনন্দে উত্তেজনায় উদ্দাম হইয়া উঠিল, যুযুৎসু সেনাবাহিনী অট্টধ্বনি করিয়া উঠিল। পিতার নিকট বিনীত কণ্ঠে ইন্দ্রজিৎ মায়াবলীভূত রামচন্দ্রকে নির্মূল করিবার সবিনয় অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্বজনবিয়োগে শোকাতুর বিধিলাঞ্ছিত রাবণ পুত্রের সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় ইতস্তত করিলেও পুত্রের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন এবং সমরযাত্রাপূর্বে পুত্রকে যথাবিধি ইষ্টদেবতার উপাসনা ও নিকুম্ভিলা যজ্ঞযাপনের পরামর্শ দিলেন। গঙ্গোদক ও অন্যান্য উপকরণে ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্যে অভিষেক-সাধন করানো হইল, রাজস্তুতিকরগণ বন্দনা-গান ধরিল, কনকলঙ্কা জয়ধ্বনিতে সমাকীর্ণ হইল।

প্রথম সর্গের সার্থকতা

একটি সর্গবদ্ধ, উদ্দেশ্য-সমন্বিত, আদ্যন্ত ঐক্যযুক্ত মহাকাব্যের একটি বিচ্ছিন্ন সর্গের সার্থকতা আবিষ্কার করা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন হইলেও সেই একটি মাত্র খণ্ডেও স্রষ্টার মনোভঙ্গি ও আদর্শ কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই কাব্যে মধুসূদনের যে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা ছিল, তাহা ইহার খণ্ডগুলির গঠনের মধ্য দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সর্গান্তর্গত ঘটনার যথাযথ সন্নিবেশ এবং কাহিনীর উপোদ্‌ঘাতের আদর্শটি ইহার প্রথম সর্গের মধ্য দিয়াই পাঠকের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যখানি সম্পর্কে কিরূপ আশা পোষণ করিতেন, ইহার উদ্দেশ্য ও পরিণাম বিষয়ে তাঁহার চিন্তা কত সুদূরপ্রসারী ও কল্পনাসমৃদ্ধ ছিল, তাহা তাঁহার অসংখ্য পত্রাবলীর মধ্যে একাধিকবার ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সূচনা সর্গটির যথাযথ বিশ্লেষণ করিলেই মহাকাব্যিক কায়ব্যূহ-নির্মাণে স্রষ্টার উচ্চাঙ্গ কবিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মধুসূদন নিরালম্ব প্রতিভার দ্বারা বাক্‌শিল্প নির্মাণে বিশ্বাসী ছিলেন না, প্রতিভার দৈবানুগ্রহের সহিত সুশিক্ষিত পুরুষকারের যথাযথ যোজনার দ্বারাই মহৎ কাব্য রচিত হয় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য তাঁহার কবিজীবনের প্রারম্ভিক কাল কঠোর সাধনা ও নীরন্ধ্র শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তাপদগ্ধ ধরিত্রীবুকে যে অকস্মাৎ

মেঘসমারোহ ও বারিবর্ষণের আয়োজন হয়, তাহা লৌকিকদৃষ্টিতে যতই আপতিক মনে হউক না কেন, দীর্ঘকাল সমুদ্র-উর্ধ্ববর্তী আকাশে মৌসুমী মেঘের সমাবেশে তাহার পূর্বপ্রস্তুতি ঘটিয়া থাকে। মধুসূদনের মহাকাব্য-রচনার পূর্বেও সেইরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যসমুদ্র হইতে উত্থিত মেঘায়োজনের একটি শ্রমমহার্ঘ্য পর্ব ছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় কবি যে সরস্বতীর আবাহন করিয়াছেন, তাহা একান্তভাবেই প্রতীচীয় মহাকাব্য-রীতির পরিচায়ক, সংস্কৃত কাব্যনাটকের নান্দী মঙ্গলাচরণ বা দেববন্দনার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। এই Muse-Invocation-এর সাহিত সংশ্লিষ্ট কাব্যপ্রসঙ্গের অবতারণার রীতিটি হোমার ভার্জিল হইতে মিল্টনের কাব্য পর্যন্ত প্রসৃত। (তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতেই মধুসূদন তাঁহার এই ইউরোপীয় কাব্যরীতি-অনুসরণের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন; সুতরাং মেঘনাদবধ কাব্যে তাহা একেবারে অযাচিতরূপে দেখা দেয় নাই।) এই কাব্যসূচনাটি ব্যতীত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে কবি মূল কাহিনীর যে সূচনা করিয়াছেন, তাহা এক মুহূর্তে তথ্যবিবৃতিমূলক কাহিনীকাব্যের আদর্শের বদলে একপ্রকার নাটকীয় চমৎকৃতি ও কৌতূহলের দ্বারা পাঠককে উচ্চকিত করিয়া তোলে।

মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণ না মেঘনাদ, এই প্রশ্নের উত্তর শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিতর্ক ও বিশ্লেষণ সত্ত্বেও অমীমাংসিত থাকিবার সম্ভাবনা, যেহেতু কবি স্বয়ং এই ব্যাপারে মনঃস্থির করিতে পারেন নাই। ইহারই জন্য এই কাব্যখানিতে যৌথ নায়কত্বের সূচনা হইয়াছে। প্রথম সর্গালোচনায় কেবল এই পর্যন্ত বলা যায় যে, আলোচ্য সর্গেই মধুসূদন তাঁহার সমগ্র কাব্যের দুই মুখ্য চরিত্রের সহিত পাঠকবর্গের পরিচয় সাধন করাইয়াছেন। এই কাব্য আরব্ধ হইয়াছে রাজসভায় রাবণের চিত্রের দ্বারা। সেই প্রসঙ্গে কবি তাঁহার প্রিয় রাবণ এবং ততোধিক প্রিয় সৌধকিরীটিনী লঙ্কার সম্পদভূষিত রত্নালংকারশোভিত নাগরিক ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য চিত্রলিপি প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য সর্গে লঙ্কায় পুর-জীবনের বিলাসবৈভবখচিত হর্ম্যশোভা ও জনজীবনের আলেখ্য আছে দুইবার। প্রথমে, যুদ্ধক্ষেত্র-পরিদর্শন উপলক্ষে প্রাসাদশীর্ষে আরোহণকালে রাবণের দৃষ্টিসম্মুখে কুঞ্জবীথিশোভিত, হীরকশীর্ষদেবগৃহ-সমন্বিত, রত্নভাণ্ডার-পরিবৃত কনকরাজধানীর একটি পট প্রসর্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয়বারে, লঙ্কার

কুললক্ষ্মী সমভিব্যহারে বারুণী-প্রেরিতা মুরলা দূতী দেউলদুয়ারে দাঁড়াইয়া লঙ্কাবধূদিগের পুষ্পবৃষ্টি-বর্ষিত রাজপথে বিপুল সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিজয়াভিযান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। লঙ্কার বিশেষণে কনক স্বর্ণ ইত্যাদি ধাতব বিশেষণে মধুসূদনের যেমন কখনও আলংকারিক ভ্রান্তি ঘটে নাই, তেমনি তাঁহার মনোলোকের স্নেহধন্য ও কল্পনারঞ্জিত এই রাজধানীর অবিশ্রান্ত সমারোহবর্ণনেও ক্লান্তি ঘটে নাই। লঙ্কার সভাগৃহটিও কবির তিলোত্তমা সৌন্দর্যকল্পনার একটি অত্যুজ্জ্বল উদাহরণরূপে আমাদের দুর্লভ-মাণিক্য-দর্শনের অনভিজ্ঞতাপ্রসূত মধ্যবিত্ত হৃদয়ে এক স্বপ্নাতুর দীর্ঘশ্বাসজড়িত স্বর্গীয় জগতের প্রতিবিম্ব সঞ্চার করিয়া যায়।

ইহার পর এই কাব্যের মধ্যমণি রাবণের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। কিন্তু এই রাবণ পুত্রশোকাতুর মৃত্যুবাত্যাবিতাড়িত বলিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত। মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদের মধ্যস্থলে বসিয়াও প্রিয়জন-বিয়োগের বিদীর্ণবক্ষ বিলাপকে গোপন করা যায় না, পার্থিব কোনো রত্নমণিভূষণই জীবনহরণের ক্ষয়ক্ষতিকে মুছিয়া দিতে পারে না। রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত ভগ্নদূতের মুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর অকাল বিদায়ের সংবাদ সমস্ত সভাগৃহটির উপর শোকের পাণ্ডুর ছায়া বিস্তার করিয়াছে—সাময়িকভাবে গৃহ-শিখর হইতে রণভূমিতে প্রদর্শিত পুত্র-পরাক্রম-কাহিনী শুনিয়া সেই অনিবার্য নৈরাশ্য অপনোদিত হয় নাই। একাদিক্রমে পুত্র ভ্রাতা ও বীরযোদ্ধগণের অবিশ্বাসজনক নিধনসংবাদ রাবণকে আপনার আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পর-অসম দুই শক্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের নিকট প্রবলের অপ্রত্যাশিত পরাজয় ও বিনাশে মূঢ় রাবণ ইহাকে আপনার কোনো দুর্জ্ঞেয় অপরাধের বিধিনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে করিতেছেন। কেবল একবার পুরুষকারের স্নায়বিক উত্তেজনা, ব্যক্তিত্বের ক্ষণিক জাগরণ, ক্রোধকম্পিত কণ্ঠের প্রাণসংশয়সৃষ্টিকারী গর্জন ব্যতীত রাবণের এই নিরুপায়, নিয়তি-নির্যাতিত, ভাগ্যাহত বিষাদের অসহায় আর্তনাদই সমগ্র কাব্যখানিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত, নাট্যশালাতুল্য সুন্দর পুরীর দীপবর্তিকাগুলি এক এক করিয়া নিভিয়া আসিতেছে, শুষ্কফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, বাদ্যযন্ত্রগুলি নীরব হইতেছে। সেই নিষ্প্রদীপ হতাশার মধ্যে বিস্ময়বিমূঢ় রাবণের শোকস্তম্ভিত বজ্রাহত মূর্তিটিই আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর প্রথম সর্গে মধুসূদন রাবণের

সেই মূর্তিটিকেই পাঠকচিত্তপটে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহাই প্রথম সর্গের সার্থকতা।

মূল কাব্যে কবি রাবণের ট্রাজেডির যে কারুণ্যধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে আছে রাবণের সীতাহরণজনিত পাপ, যদিও রাবণ এই অপরাধবোধের সহিত সজ্ঞানভাবে পরিচিত নহেন। প্রথম সর্গে এই বিষয়েও কবি আমাদের নিকট আভাস দিয়াছেন। বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা রাবণকে যে তীক্ষ্ণভাষায় অভিযোগ করিয়াছেন তাহা হইতেই জানা যায়, সমগ্র স্বর্ণলঙ্কার সর্বনাশের কারণ এই একটি মানুষের দুর্বুদ্ধিতাপ্রসূত কর্মফল, ইহাই রাবণ-ব্যতীত পার্শ্ববর্তী অধিকাংশ চরিত্রের বিশ্বাস। অন্তত স্বগৃহের মহিষীর হৃদয়ে রাবণ রামরাবণের সংগ্রামকে অবলম্বন করিয়া দেশাত্মবোধ জাগাইতে পারেন নাই। মনে হয়, কেবল চিত্রাঙ্গদাই নহে, রাবণ ব্যতীত লঙ্কার সকলেরই অন্তরের বিশ্বাস চিত্রাঙ্গদার বিশ্বাসের অনুরূপ, কিন্তু আদর্শ নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্ররক্ষার দায়িত্বে সকলেই সচেতন। ফলে কাহিনীর আগাগোড়াই যোদ্ধবর্গের কর্তব্যবোধ-সমুখ আস্ফালন ও দুঃসাহসিক বীরত্ব দেশরক্ষায় প্রযুক্ত না হইয়া রাবণের কর্মফল-রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছে এবং উহাই তাহাদের চরম ব্যর্থতার হেতু হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য এবং এই জাতীয় প্রতীচ্যাদর্শপ্ররোচিত মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ যে সুরলোক ও নরলোকের যুগপৎ কর্মতৎপরতা, প্রথম সর্গে কবি ইহারও পরিচয় দিয়াছেন। রণদর্পে সৈন্যবাহিনীর পদভারে যখন জলতল প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার রেশ জলধিগর্ভে সমুদ্রাধিপতি বরুণের পত্নী বারুণীর নিভৃত কক্ষে পর্যন্ত পৌছিয়াছে এবং তথা হইতে এই কম্পন-হেতু-নিরূপণের জন্য মুরলা দূতীকে লঙ্কার রাজলক্ষ্মী সমীপে প্রেরণ করা হইয়াছে। লঙ্কাপুরীর কুল-সেবিতা নারায়ণীর ভূমিকাটি স্পষ্ট নহে। স্বয়ং দেবকুলভুক্তা বলিয়া হয়ত তিনি দেবসমাজের সামগ্রিক রাক্ষসবিরোধী মনোভাব এবং লঙ্কাপুরী ও রাক্ষস-বংশের প্রতি বহুকুলাগত পক্ষপাতের মধ্যে মনঃস্থির করিতে পারেন নাই।

প্রথম সর্গে কবি কাব্যের মূল বিষয়ের নায়ক মেঘনাদের সহিতও পরিচয় সাধন করাইয়াছেন। রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী-পরিবৃত লঙ্কানগরী হইতে দূরবর্তী কোনো নিজস্ব প্রমোদোদ্যানে প্রমীলা ও দুর্ধর্ষ নারীদল-পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রজিৎ নিশ্চিন্ত প্রেমকূজন ও প্রিয়ভাষণে রত ছিলেন।

ধাত্রীবেশিনী লঙ্কা-রাজলক্ষ্মীর মুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ ও রাবণের যুদ্ধায়োজন শুনিয়া তিনি ক্রোধে কুসুমদাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, কনকবলয়-ভ্রষ্ট বাহু যুযুৎসু হইয়া উঠিয়াছে, আত্মধিক্কারে তিনি তদ্দণ্ডেই রথারূঢ় হইয়াছেন। প্রেম ও জিগীষা, কোমলতা ও বীর্য এই উভয় বৈপরীত্যমূলক গুণের সমাবেশ-ক্রিয়ার আদর্শে নায়কচরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই যেন কবি মেঘনাদকে প্রমোদকাননে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তারপর প্রাক্তনের ফল পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে লঙ্কায় অবতীর্ণ করাইয়া গঙ্গোদক ও শাস্ত্রীয় উপচারাদির দ্বারা রণসাজে অভিষিক্ত করাইয়াছেন। কিন্তু এই সকল আয়োজন ও উৎসব-কোলাহলের মধ্য হইতে আসন্ন সর্বনাশের বজ্রগর্ভ মেঘমালা যে ধীরে ধীরে কনক-রাজপুরীর নীলকান্ত আকাশে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে পাঠকের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। অভিষেকান্তে বন্দীদলের উদ্দীপন সংগীতের মধ্যেও সেই অনাগত আশঙ্কার জলভরাক্রান্ত ছায়া যেন নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে।

প্রথম সর্গের রাবণ-চরিত্র

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে মধুসূদন তাঁহার কাব্যের প্রিয় চরিত্রটিকে যথোচিত সতর্কতা ও নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত করিলেও, রাবণ-চরিত্র মধুকবির অব্যবস্থিতচিত্ত পরিকল্পনার সাক্ষ্য হইয়া আছে, ইহা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। শোকাতুর রাবণের বিষাদ-নৈরাশ্যের সহিত বীর্যবত্তা ও রণস্পৃহতার সমন্বয়ে তাঁহার চরিত্র রাজকীয় মহিমা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য চরিত্রের মুখে একাধিকবার রাবণের অপরাধ সংঘটনের উল্লেখ আধুনিক পাঠককে রাবণ-চরিত্রটি সম্পর্কে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেয় না। সম্ভবত, মধুসূদন স্বয়ং এই ব্যাপারে মনঃস্থির করিতে পারেন নাই। পুরুষকারের অভ্রভেদী মহিমার তলদেশে নারীহরণজনিত পাপরন্ধ্র যে বিশাল ভূধরকেও অন্তঃসারশূন্য করিয়া দেয় এইরূপ কোনো প্রত্যয়ও শেষ পর্যন্ত বলিষ্ঠ নীতিবাক্যের মত কাব্যটি হইতে সংকলন করা যায় না। কিন্তু কোনো অশুভক্ষণে 'পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীকে' রাবণের হৈমগৃহে আনয়ন করার গ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও 'কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে'—বীরবাহুর মৃত্যুতে তাঁহার এইরূপ বিলাপ সংগতিপূর্ণ মনে হয় না। মোটের উপর এক দুর্জ্ঞেয় অপ্রতিবিধেয় নিয়তির করাল কবলে আচ্ছন্ন, আপন

অনিশ্চিত পরিণামে আশঙ্কাকম্পিত ভগ্নোদ্যম নায়কের শোকস্তম্ভিত মূর্তিটি প্রথম সর্গ পাঠকালে পাঠকের চিত্তে অভ্রান্তভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

মধুসূদনের রাবণ আদর্শ রাজা, আদর্শ পিতা, আদর্শ পরিবার-মধ্যমণি—এক কথায় মনুষ্যোচিত সার্থক গুণাবলীর প্রতীক। অশেষ সুবর্ণসম্ভার ও হিরণ্যদীপ্ত এক সুনির্মিত নগরীর তিনি অধিপতি। বীরপ্রসূ লঙ্কার শত মহাবলী যোদ্ধার গর্বে তিনি আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। দেশগৌরবী সৈনিককে তিনি পুত্রসম জ্ঞান করেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে তিনি স্বজনবিয়োগের শোক অনুভব করেন। অন্যদিকে তাঁহার পিতৃহৃদয় স্নেহকাতর, প্রীতিবৎসল; সাংসারিক ক্ষয়ক্ষতির দার্শনিক সান্ত্বনা তাঁহার পুত্রশোকের অনপনেয় বেদনার উপর কোনো সাময়িক প্রলেপও দিতে পারে না। ক্রমশ নির্বাপিতদীপ নাট্যশালার সূচীভেদ্য অন্ধকারে তাঁহার রাজকীয় মহিমা নৈরাশ্যে হাহাকার করিয়া উঠে। পরমবীর ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে প্রেরণ করিতেও এখন তিনি অনির্দিষ্ট শঙ্কায় কম্পিত হইতেছেন, কারণ আপন জীবনের সকল কৃতাকৃতই যে সম্প্রতি দৈব-প্রতিকূলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই বিষয়ে তিনি যেন নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। অথচ ইহা চরিত্রদৌর্বল্য মাত্র নহে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে সুগভীর বাৎসল্য। বীর্যকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে জানেন। নিহত পুত্রের গরিমাময় বৃত্তান্ত তাঁহার বক্ষোস্পন্দন শ্লাঘায় দ্রুততর করে। রণকুশলী পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া তিনি তাঁহাকে যথোচিত সতর্ক নির্দেশ ও পরামর্শ দান করেন। যোদ্ধকৌশল ও বিপুল সমরবাহিনীর নায়কত্ব করিবার অধিকার তাঁহার কী পরিমাণ আছে, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রথম সর্গে না পাইলেও, আলোচ্য সর্গে সুসজ্জিত সামরিকবাহিনী, পদাতিক অশ্বারোহী প্রভৃতির বর্ণনা, সৈনাপত্যসমাবেশ ও অস্ত্রশস্ত্রাদির পুনঃপুনঃ বর্ণনা তাহারই পরোক্ষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অন্তত দেবতা-বিশেষের অহেতুক কৃপাপ্রাপ্তিই যে রাবণের অপরাজেয়ত্বের হেতু নহে, এই বিষয়ে কবি প্রথম হইতেই সচেতন আছেন। কিন্তু তাঁহার এই স্বোপার্জিত বাহুবল বুদ্ধিমত্তা সংগ্রামকুশলতা যে অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিমান প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রামেও নিষ্ফল হইতেছে এই দুর্বোধ্য ঘটনায় তাঁহার বিচারশক্তি মূঢ় হইয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং মহাজলধি আজ ক্ষুদ্র নরের অনুরোধে শৃঙ্খলিত হইয়াছে, ইহা রাবণের অভিমান ও বিদ্রূপ উদ্রেক করিয়াছে।

বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার সহিত কথোপকথনে রাবণ-চরিত্রের বিশিষ্টতা

আর এক দিয়া স্পষ্ট হয়। স্বয়ং পুত্রশোকে বিদীর্ণবক্ষ হইলেও মহিষী চিত্রাঙ্গদার নিকট সহবেদনায় তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন নাই, বরং সহানুভূতির সহিত একমাত্র জননীর রিক্ত হৃদয়ের মর্মন্তুদ ক্রন্দনকে সান্ত্বনা দিয়া প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথার্থ স্বামীর মত, আদর্শ দেশরক্ষক রাজার মত চিত্রাঙ্গদাকে তিনি প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে শোকবেদনায় তিনি স্বয়ং বজ্রাহত, যাহার অন্তহীন গভীরতা রাবণকে সর্বরিক্ত বৈরাগ্য গ্রহণে অন্তরে প্ররোচিত করিতেছিল, সেই শোককে চিত্রাঙ্গদার সম্মুখে অন্তত তিনি গোপন করিয়াছেন এবং লঙ্কার নিহত বীরপুত্রদের স্মরণে 'শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে দিবা নিশি' এই বৃহত্তর শোকের দ্বারা এক পুত্রশোককে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার বিদায়ে আবার রুদ্ধবেদন হৃদয় বিদারিত হইয়াছে,—এইবার শোক হইতে ক্রোধে। সেই ক্রোধ স্বয়ং রাবণকে যুদ্ধযাত্রায় অংশগ্রহণ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাইয়াছে। রামচন্দ্র অথবা রাবণ—ইহাদের যে-কোনো একজনের নিশ্চিত বিনাশ ও অপরজনের অস্তিত্বের দ্বারা এই বৈরিতার, এই শোকবেদনা বিলাপের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের অন্তরালে রাবণের রাজসুলভ বিচক্ষণতা বা স্থৈর্য অপেক্ষা দ্রুত-উত্তেজিত ক্রোধাভিমানই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চিত্রাঙ্গদা-প্রসঙ্গ

মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় বীররসাত্মক মহাগীত রচনার প্রতিশ্রুতি মধুসূদন শেষ পর্যন্ত কতখানি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু ইহার সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত করুণ রসাত্মক ঘটনার আয়োজনে মধুসূদন যে ক্রমশই তাঁহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৃত পুত্রের জন্য রাবণের সাশ্রুনেত্র বিলাপের পরই পুত্রের রণকুশলতা ও পরাক্রম-কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং দূর হইতে যুদ্ধক্ষেত্রের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কবি সভার পরিবেশটিকে যেমন সামলাইয়া আনিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই যেন অপ্রত্যাশিত শোকের ঝড় লইয়া চিত্রাঙ্গদা প্রবেশ করিয়াছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুনরায় সমস্ত সভাস্থল বাত্যাবিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মৃতবৎসা জননীর হাহাকারে দাসদাসী ছত্র চামর ত্যাগ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছে, দৌবারিকের কোষবদ্ধ

তরবারি নিষ্ফল ক্রোধে আত্মবিলাপ করিয়াছে, পাত্রমিত্র সকলেই এই সর্বস্বান্ত মাতার সহিত কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বীররসের কাব্যে ইহা যেন অশ্রুর ক্রোড়পত্র।

চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের আকর কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, চিত্রাঙ্গদা চিত্রসেন-গন্ধর্বনন্দিনী, রাবণ কর্তৃক অপহৃতা এবং বিষ্ণুর বরে তাঁহার বীরবাহু নামক পুত্রের জন্ম হয়। সুতরাং স্বভাবে ও জন্মসূত্রে রাক্ষসবংশজ না হইবার জন্য এবং বিষ্ণুর আশীর্বাদে, চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে রাবণের বিপরীত একটি মনোভাব থাকিবার সম্ভাবনাকেই হয়ত মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসমতে বীরবাহু বা চিত্রাঙ্গদার বিষ্ণুভক্তিপরায়ণতার প্রসঙ্গ স্বভাবতই এখানে থাকিবার কথা নহে। চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া রাবণ যে তাহাকে হরণ করিয়া আনেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই সূত্রটিকেই হয়ত মধুসূদন চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্য-বর্ণনায় স্বপক্ষে একাধিকবার প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এইজন্য গন্ধর্বনন্দিনী চিত্রাঙ্গদাকে কবি পুনঃপুনঃ 'চারুনেত্রা' 'ইন্দুনিভাননে, 'বিধুমুখী' ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। এই কাব্যে মন্দোদরী বা রাবণের অন্যান্য মহিষীর বিশেষ সক্রিয় উপস্থাপনা নাই, কিন্তু চিত্রাঙ্গদাকে সমীপদৃষ্ট করিবার সার্থকতা কী তাহাও বিবেচনা বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বীরবাহুর মৃত্যুজনিত ঘটনার শোকাবহতা প্রমাণ করিবার জন্যই রোরুদ্যমানা জননীর সভাগৃহে আগমন ঘটিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহার আরও একটি উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষে রাবণের যে পুত্রনিধন ঘটিয়াছে, তাহা ন্যায়যুদ্ধের স্বাভাবিক ফল মাত্র নহে, তাহা অপরিণামদর্শী রাবণের স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, রিক্তহৃদয়া জননীর ভর্ৎসিত উক্তিতে ইহা ঘোষণা করিবার জন্যই যেন চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। "একদিকে রাবণের দুর্বোধ নিয়তির সক্ষোভ উল্লেখ, অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদা কর্তৃক রাবণের পাপজনক কর্মফলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, ইহাই এই সর্গের বিশেষত্ব।" রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, দেশবৈরীর সহিত সংগ্রামে বীরবাহুর আত্মদানকীর্তি স্মরণ করিয়া জননীকে গর্ববোধের অনুনয় করিয়াছেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার ক্ষুব্ধ তিরস্কারে এই গর্ববোধের অন্তঃসারশূন্যতা মুহূর্তেই যেন উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা স্বামীর অপরাধের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেন নাই, সীতাহরণ-জনিত পাপের ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু নারীত্বের অসম্মান, তাহা যে কোনো

পারিবারিক বা বংশগত মর্যাদারক্ষার মূল্যেই হউক না কেন, বিশ্ববিধান লঙ্ঘনের দুঃসাহস মাত্র—ইহার প্রায়শ্চিত্ত মানবমাত্রেরই অনিবার্য—ইহা আর এক রিক্ত জননীর সকরুণ বিলাপে ও অভিমানাহত তিরস্কারে ঘোষণা করাই যেন কবির উদ্দেশ্য ছিল।

নামকরণ : অভিষেক

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে কাব্যপ্রসঙ্গ সূচনাকালে কবি-সরস্বতীর বন্দনা করিয়া বর্তমান সর্গের অবলম্বিত বিষয়ের আভাস দিয়াছিলেন। সম্মুখ-সমরে বীরচূড়ামণি বীরবাহুর অকাল-প্রয়াণের পর কোন বীরবরকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া পুনরায় রাবণ সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন এই জিজ্ঞাসা দিয়া যে কাহিনীর উদ্ভব তাহারই প্রারম্ভিক সর্গ 'অভিষেক'। ইলিয়াড ও ঈনিড কাব্যের মত দুই প্রবল শক্তিমান পক্ষের সংঘর্ষ-কাহিনী বলিয়াই মেঘনাদবধ কাব্যে নায়ককে সংগ্রামে পাঠাইবার পূর্বে কবি তাঁহাকে যথোচিত অভিষিক্ত করাইয়া লইতে চাহিয়াছেন। এ অভিষেক কেবল গঙ্গোদক ও শাস্ত্রোপকরণে নহে, কবির অনুরাগে ও সমবেদনায়, পাঠকের স্নেহ ও করুণায় কবি তাঁহার পরমপ্রিয় তরুণ মানসসৃষ্টিকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। ইহাই এই নামকরণের তাৎপর্য।

ইন্দ্রজিতের অভিষেকের কথা বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামায়ণে নাই। যুদ্ধকাণ্ডে মকরাক্ষ বধের পর বাল্মীকির রামায়ণে রাবণ ক্রুদ্ধকণ্ঠে ইন্দ্রজিৎকে নির্দেশ দিয়াছেন, দৃশ্য বা অদৃশ্য যেরূপভাবেই হউক, রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিতে হইবে। ইহার পর ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে গিয়া বিপুল ভাবে যজ্ঞায়োজন করেন এবং মন্ত্রপূত অস্ত্রাদির সাহায্যে রামলক্ষ্মণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকেন ও মায়াসীতা বধ করেন। ইহা নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পাদনের পূর্ব ঘটনা। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বীরবাহুর যুদ্ধায়োজন ও মৃত্যুর বর্ণনা ঈষৎ বিস্তৃততর বলিয়া মধুসূদন তাঁহার কাব্যসূচনায় ইহাকেই সচেতনভাবে স্মরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাবণের শোক এবং ইন্দ্রজিতের বিস্ময়প্রকাশও মধুসূদন উক্ত কৃত্তিবাসী কাব্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অভিষেকের ঘটনা কৃত্তিবাসেও নাই। কৃত্তিবাসে কেবল বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাবণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎকে স্বয়ং যুদ্ধগমনের অনুরোধ আছে। সুতরাং অভিষেক নামক ব্যাপারটি মধুসূদনের নিজস্ব কল্পনা।

এই অভিষেক-কর্ম সম্পাদনের জন্যই কবিকে অনেকগুলি ঘটনার সন্নিবেশ করিতে হইয়াছে—বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া ভগ্নদূতের আগমন, চিত্রাঙ্গদার বিলাপ, ক্রোধোদ্দীপ্ত রাবণের যুদ্ধসজ্জা, সমুদ্রগর্ভে বারুণীর কৌতূহল এবং লঙ্কারাজলক্ষ্মী সমীপে মুরলা দূতীকে প্রেরণ, প্রভাষা দাসীর ছদ্মবেশে প্রমোদোদ্যানে গিয়া লঙ্কালক্ষ্মী কর্তৃক ইন্দ্রজিতের নিকট রাবণের যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিবরণ, ইন্দ্রজিতের ক্ষোভ ও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রা—ইহারই পরিণামস্বরূপ অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধগমনের পূর্বে আনুষ্ঠানিক কর্মহিসাবেই এই অভিষেক-ব্যাপারটি সম্পন্ন হয় নাই। যে বিধিবিড়ম্বনায় রাবণের কুসুমদামসজ্জিত সুন্দরী পুরী ধীরে ধীরে পুষ্পহীন হইয়াছে, সেই দুর্লঙ্ঘ্য বিধির চূড়ান্ত আক্রমণ এই মেঘনাদবধ। মেঘনাদের অকালমৃত্যুর সেই পরম বিষাদঘটনাটিকে উজ্জ্বল করিবার জন্যই নিবিড় শোকের সেই ঘনীভূত ক্রন্দনকে তৎপূর্ববর্তী এই অভিষেক-আনন্দের পটে স্থাপিত করা হইয়াছে। বেদনার চারিপার্শ্বে উল্লাসের স্বর্ণরেখা সেই বেদনার নিঃসীমতাকে মর্মভেদী করিবার উপায় রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্যই বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ ও রাবণের সংগ্রাম-প্রস্তুতির বার্তা শুনিয়া মেঘনাদ যে প্রমীলাকে 'ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া' বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন, ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দিতে রাবণের চিত্ত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে, অভিষেকান্তে বন্দীদের স্তুতিগানে মুক্তকেশী শোকাবিষ্টা অশ্রুনয়না লঙ্কাপুরীর জননী-মূর্তিটি ভাসিয়া উঠে—সবই পাঠককে এক অবশ্যম্ভাবী বজ্রপাতের দিকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে। আসন্নবর্ষণ মেঘের কোলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় এই সর্গের অভিষেক-ক্রিয়া সেই ভয়ংকর মৃত্যুরই অভিষেক মাত্র, ইহাই বর্তমান সর্গের সাংকেতিক সার্থকতা।

দ্বিতীয় সর্গের কাহিনী

সেনাপতিপদে মেঘনাদের অভিষেক-ঘটনার দিন সন্ধ্যাগমের পর নৃত্যগীত-মুখরিত স্বর্গসভায় রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীর আগমন ঘটিল। দেবেন্দ্র কর্তৃক যথোচিত বন্দিত হইবার পর লক্ষ্মীদেবী তাঁহার স্বর্গাগমন-কারণ স্বরূপ জানাইলেন যে, রাবণের কৃতকর্মের পাপে নিমজ্জিত লঙ্কাপুরী তাঁহার নিকট কারাগার হইয়া উঠিয়াছে। পরদিবস নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া মেঘনাদ রণে অবতীর্ণ হইলে রামচন্দ্রের জীবনসংকট উপস্থিত হইবে। তৎপূর্বেই ইহার প্রতিকার

·ভাবন করিতে হইবে। এই সমূহ বিপদকালে ইন্দ্র বলিলেন, বিশ্বনাথ ব্যতীত রামচন্দ্রকে উদ্ধারের কোনো উপায় নাই। মেঘনাদ স্বয়ং ইন্দ্রের বজ্রকেও পরাভূত করিয়াছে—ইহাই ইন্দ্রের আক্ষেপ। কৈলাস-সদনে শিব-সমীপে রাবণের পাপের কথা সবিস্তারে নিবেদন করিবার জন্য লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ইন্দ্র অতঃপর শচীদেবীকে সঙ্গে লইয়া মানস-সরোবরের নিকটস্থ কৈলাসশিখর-শীর্ষে মহাদেবের ভবনে উপনীত হইলেন। মহাদেব তখন যোগাসন নামক দুর্গম শৃঙ্গে ধ্যানমগ্ন ছিলেন বলিয়া ইন্দ্র ও শচী পার্বতীর চরণ বন্দনা করিয়া লঙ্কাপুরীর অবস্থা ও পরদিবসের সম্ভাব্য সংগ্রামে রামচন্দ্রের পরিণতির আশঙ্কার উল্লেখ করিলেন। এই সংকটকালে পাপপূর্ণ বসুন্ধরার দুঃসহ বিলাপ এবং লঙ্কাপুর-লক্ষ্মীর লঙ্কা-পরিত্যাগের ইচ্ছাও পার্বতীর গোচরীভূত করিলেন। দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার মত দেবতা স্বর্গলোকে আর নাই। এক্ষণে ভয়ংকর রাক্ষসের কবল হইতে রঘুকুলমণিকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিশ্বজননীকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পরম শিবভক্ত রাবণের অনিষ্ট যে শিবকর্তৃক সম্ভব হইবে না, ইহা মহাদেবী জানেন। তদ্ব্যতীত শিব এখন ধ্যানমগ্ন, সেইজন্যই লঙ্কার এই দুর্গতি। কিন্তু পার্বতীর এই অসহায়তায় ইন্দ্র ও শচী আরও ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট কাতর অনুনয় করিতে লাগিলেন। সচ্চরিত্র গুণবান্ রাঘব পিতৃসত্য পালনের জন্য সর্বরিক্তবেশে অরণ্যগমন করিয়াছিলেন। পরম-অধর্মাচারী দেবদ্রোহী রাবণ সেই সুযোগে মায়াজাল পাতিয়া তাঁহার পরমপ্রিয় বক্ষোরত্ন সীতাকে হরণ করিয়া শাশ্বত ন্যায়নীতির যে বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার শাস্তি কেবল শিবের উপর কেন নির্ভর করিবে? দরিদ্রধনহরণকারীর এই পাপের জন্য জগন্মাতাই তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন! অশোককাননে বন্দিনী সীতার দুঃখে বিগলিত হৃদয়ে শচীও পাষণ্ড রক্ষোনাথ ও মেঘনাদের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য দেবীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-বংশের প্রতি ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর বিদ্বেষের কারণ ছিল, পার্বতী তাহা বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন যে, রক্ষোবংশ স্বয়ং মহাদেবের দ্বারা সুরক্ষিত, কিন্তু সম্প্রতি যে দুর্গম স্থানে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া আছেন সেখানে গমন করা কাহারও পক্ষে সাধ্য নহে। কিন্তু বসুন্ধরাকে পাপমুক্ত করিবার জন্য, ধর্মের মহিমা বৃদ্ধির জন্য এবং দেবানুগৃহীত রামচন্দ্রকে বাঁচাইবার জন্য, যত দুর্গম স্থানেই মহাদেবের অবস্থান হউক, পার্বতীকেই তথায় যাইতে হইবে, এই বলিয়া ইন্দ্র ও

শচী যথাবিধি সতীর স্তুতিগান গাহিতে লাগিলেন। এই চরণবন্দনায় কী হইত বলা যায় না, কিন্তু ইতিমধ্যে নরলোক হইতে রামচন্দ্রও প্রায় একই সময়ে ভগবতী দুর্গার পূজায়োজন করিতেছিলেন। ভক্তের সেই পাদ্যার্ঘ্য-প্রদানে ও উপচারবন্দনায় দেবীর কনকাসন টলিয়া উঠিল। বিজয়ার গণনায় রামচন্দ্র কর্তৃক নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া দেবীবোধনের বিবরণ শুনিয়া ভক্তবৎসলা আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। ইন্দ্র ও শচীর প্রতি যথোচিত সম্মান ও আতিথ্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়া পার্বতী যোগাসন পর্বতে মহাদেবের উদ্দেশে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। দেবেন্দ্র ও শচীর অভ্যর্থনায় কৈলাসপুরী উৎসবমুখর হইয়া উঠিল। ধ্যানরত মহাদেবকে কোন্ বেশে বিভ্রান্ত করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাদেবী রতিকে স্মরণ করিলেন। রতির সাহায্যে মহাদেবীর রূপ হইল ভুবনমোহিনী, সর্বাঙ্গভূষিতা। তখন সেই যৌবনভারাবনত ফুল্লকুসুমিত দেহকান্তি লইয়া দেবী আহ্বান করিলেন রতিপতি কামদেবকে, তাঁহাকে লইয়া তিনি মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবেন। কিন্তু কুমার-কার্তিকের জন্মঘটনার পূর্বে মহাদেবের সহিত পার্বতীর মিলন-সংঘটনের জন্য স্বর্গপতি ইন্দ্র মদনকে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর তাহার পরিণামে হরকোপে মদনকে ভস্মীভূত হইতে হইয়াছিল। সেই কথা স্মরণ করিয়া রতিপতি সশঙ্ক হইয়া উঠিলে শংকরী তাঁহাকে যথোচিত অভয় ও মৃত্যুঞ্জয় বর প্রদান করিলেন। তখন মদন বলিলেন, বিশ্ববিমোহিনী বেশে শংকরী কিরূপে কৈলাস হইতে নির্গত হইয়া যোগাসন পর্বতে যাত্রা করিবেন? তাঁহার অতুলবিমোহন রূপরাশি দেখিলে জগৎবাসী আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইবে। তখন এই আশঙ্কা অমূলক নহে মনে করিয়া রূপবিমোহিনী দুর্গা আপনার অনিন্দ্যকান্তির উপর সুবর্ণবর্ণ ঘন মায়াজাল সৃষ্টি করিলেন এবং উভয়ে যোগাসনশৃঙ্গে উপনীত হইলেন। বিভূতিভূষিত মুদিতনয়ন সন্ন্যাসীর প্রতি পার্বতীর ইঙ্গিতে পঞ্চশর তাঁহার কামবাণ নিক্ষেপ করিয়াই ভস্মীভূত হইবার ভয়ে বিপন্ন শিশুর মত জননীর বক্ষঃসংলগ্ন হইলেন। ধ্যানভঙ্গ তাপস বিশ্ব-বিলাসিনী পার্বতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং পরমাদরে তাঁহাকে অজিনাসনে বসাইলেন। অলক্ষিত মদনের পুষ্পবাণে মহাদেব ক্রমশই প্রেমার্ত হইতে-ছিলেন, পার্বতীর আগমনের গূঢ় উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তিনি পত্নীর নিকট কৈলাসে ইন্দ্রের আগমন, রামচন্দ্রের অকালবোধনের উল্লেখ করিলেন এবং পরমভক্ত হইলেও রাবণ যে নিজকর্মদোষে নিমজ্জিত হইতেছে ইহাও

স্বীকার করিলেন। সুতরাং দেবতা ও মানব উভয়ের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য যে নিয়তি সেই নিয়তির প্রকোপেই রাবণের সর্বনাশ আসন্ন। পার্বতী যেন অবিলম্বে মদনকে ইন্দ্রসমীপে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রের অনুরোধে মায়াদেবী মেঘনাদবধে লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবেন। মহাদেবের এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়া মদন শচীপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মায়াদেবীর নিকট গমন করিতে বলিলেন। মহাদেবের নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য ইন্দ্রও কালবিলম্ব না করিয়া মায়া-সকাশে আগমন করিলেন। তখন মায়াদেবীর নিভৃত দেউলে উভয়ের পরামর্শ আরম্ভ হইল এবং মায়াদেবী ইন্দ্রকে কিছু দৈব-অস্ত্র প্রদান করিলেন। তারকাসুরকে বধ করিবার জন্য স্বয়ং মহাদেব এই দুর্লভ শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রগুলি রুদ্রতেজে নির্মাণ করিয়া কুমার কার্তিকেয়কে দান করিয়াছিলেন। অগ্নিশিখার মত তেজস্কর এই অস্ত্রগুলির দ্বারাই মেঘনাদের মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু মায়াদেবী ইহাও বলিলেন যে, ন্যায়যুদ্ধে মেঘনাদকে হত্যা করা অসম্ভব। ইন্দ্র প্রথমে লক্ষ্মণকে অস্ত্রগুলি দান করিবেন, পরে পরদিবস প্রভাতে মায়াদেবী স্বয়ং লঙ্কাপুরে গমন করিয়া লক্ষ্মণকে অন্যান্য ব্যাপারে সহায়তা করিবেন। মায়াপ্রদত্ত অস্ত্রগুলি বহন করিয়া ইন্দ্রের নির্দেশে চিত্ররথ আসিলেন লঙ্কাধামে রঘুকুলমণি রামচন্দ্রের হস্তে তাহাদের সমর্পণ করিতে। ইন্দ্র তৎসহ ইহাও রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে জানাইতে বলিলেন যে, সমগ্র দেবসমাজ রামচন্দ্রের প্রতি অনুকূল, স্বয়ং পার্বতী তাঁহার উপর প্রসন্ন। সুতরাং দৈব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় রামচন্দ্রের বিপদ কাটিয়া যাইবে, রাবণ ও ইন্দ্রজিতের মৃত্যু অবধারিত এবং রামচন্দ্র পুনরায় সীতা উদ্ধার করিবেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লঙ্কার ঊর্ধ্বাকাশের উপর দিয়া চিত্ররথের আগমন নিরাপদ করার জন্য ইন্দ্রের নির্দেশে লঙ্কার উপর ঝড়বৃষ্টি মেঘাবরণ ও অন্ধকারের সৃষ্টি হইল। সেই অবসরে চিত্ররথ রামপক্ষের শিবিরদ্বারে দৈবসমরসম্ভার লইয়া উপনীত হইলেন। দীপ্তকান্তি দেবদূতকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চিত্ররথ রামচন্দ্রকে ইন্দ্রপ্রেরিত স্বর্গীয় অস্ত্রগুলি ও ইন্দ্রের বার্তা নিবেদন করিলেন। এই শুভ ঘটনায় রামচন্দ্র বিহ্বল হইলেন এবং ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন চিত্ররথ রামচন্দ্রকে উপদেশসহকারে বলিলেন যে, দরিদ্রসেবা, জিতেন্দ্রিয়তা, ধর্মপরায়ণতা ও দেবসেবাই দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের উপায়। অন্তরে অসত্যচারীর বাহ্যিক উপচার দেবতা কখনও গ্রহণ করেন না।

রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়া চিত্ররথ স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লঙ্কার বুকে ইন্দ্ররচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ শান্ত হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় সর্গের সার্থকতা

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের কাহিনী হর্ম্যকিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কা হইতে বহু ঊর্ধ্বে সুদূর স্বর্গলোকে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সর্গের বিষয়বস্তু মেঘনাদের মৃত্যুর জন্য দৈব অস্ত্রাদি সংগ্রহ এবং দেবসমাজের তৎপরতাবশতই সেই সকল অমোঘ অস্ত্রশস্ত্র লক্ষ্মণের করায়ত্ত হইয়াছে। যে নিষ্ঠুর অদৃষ্ট বিধি-কবলিত মানবজীবনকে সম্পদের শীর্ষচূড়া হইতে সহসা সর্বনাশের অতল অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করে, সেই অদৃষ্টের যদি কোনো দৃশ্যমান রূপ থাকে, তবে তাহা অন্তরীক্ষের দেবসমাজ—যেখানে ক্রুর সুরলোকচারীগণ অসহায় মানুষের ভাগ্যবিধাতা হইয়া মানুষের জীবনকে অবিশ্বাস্য পরিণামের দিকে চালিত করিতেছেন—সম্ভবত এইরূপ কোনো অবচেতন বিশ্বাস হইতেই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের এই বর্তমান সর্গটির পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে প্রবল পরাক্রমশালী মেঘনাদের নিরুপায় মৃত্যুবরণ ব্যাপারটি যেমন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি ভক্তবৎসল দেবতাদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের প্রতিও নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী মানুষের এক প্রকার নীরব ভর্ৎসনা প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষ মাত্রই দেবতার অনুগ্রহ-প্রত্যাশী, কিন্তু কৃপাবিতরণের ছদ্মবেশে দেবতার অহেতুক পক্ষপাতিত্ব ও পুরুষকারাশ্রিত ব্যক্তিকে দ্রুত নিশ্চিহ্ন করিবার হীন তৎপরতা সংস্কার ও বিশ্বাসে শাশ্বতভাবে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। ইন্দ্র তাঁহার বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি প্রতিশোধগ্রহণের জন্য যেরূপ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী গ্লানির অপনোদনের সুযোগ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎবধে লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবার জন্য অন্যান্য দেবতাদের নির্বিচার ব্যাকুলতা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয় না। কেবলমাত্র দেবসমাজভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্যেই দেবতাবৃন্দ একাদিক্রমে রাক্ষসবংশের প্রতি যেরূপ প্রতিকূল আচরণে অভ্যস্ত তাহা মধুসূদনের নিজস্ব কোনো মনোভাব হইতেই জাত এবং সে মনোভাব সম্পূর্ণ নাস্তিকতা-প্রসূত না হইলেও নির্দোষ মনুষ্যজীবনের সর্বনাশ-সাধনে উদ্যত দুর্জ্ঞেয় দৈবচক্রান্তের প্রতি অভিমান হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

এই কাব্যের কাহিনীভাগ সামান্যই। মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনায় স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু ইহার ঘটনাবস্তুকে এইভাবে সংকলিত করিয়াছেন—

"মেঘনাদবধ কাব্য নয় সর্গে বিভক্ত। তিনদিনের ও দুই রাত্রির ঘটনা এই নয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণান্তে রাক্ষসরাজ কর্তৃক মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেক, প্রথম দিবসের ঘটনা। হরপার্বতীর অনুগ্রহে লক্ষ্মণের স্বপ্নদর্শন ও অস্ত্রলাভ, রাত্রির ঘটনা। মেঘনাদবধের মধ্যে এই রাত্রিই সর্বাপেক্ষা ঘটনাপূর্ণ। দেবেন্দ্রের ও শচীদেবীর কৈলাসে গমন, লক্ষ্মণের দেবীপূজা, প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ, এবং সীতাদেবী সঙ্গে সরমার কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের অনেক প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ এই রাত্রির ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল দ্বিতীয় দিবসের ঘটনা। রামচন্দ্রের যমপুরীদর্শন, দ্বিতীয় রাত্রির এবং প্রমীলার চিতারোহণ, তৃতীয় দিবসের ঘটনা। কবির অনুপম কল্পনাগুণে এই তিন দিবস মাত্র ব্যাপী ঘটনা অতি দীর্ঘকালের কার্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয়।"

সুতরাং এই দুই রাত্রির মধ্যে প্রথম রাত্রি-সমাগমের পর হইতে ঘটনার ধারা অনুসরণ করিয়া কাব কাব্যপাঠকগণকে প্রথমে স্বর্গীয় চক্রান্ত সভায় লইয়া গিয়াছেন। সামান্য একটি মানুষকে হত্যার জন্য স্বর্গ মর্ত পাতাল পর্যন্ত ঘটনার জাল বিস্তৃত হইয়াছে, দেব-দৈত্য-নর একত্রে এই মহাহত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অদৃশ্য সূত্রে জড়াইয়া পড়িতেছে, সমুদ্র-তলবর্তী বারুণীর প্রসাধন কক্ষ হইতে দুর্গম কৈলাস-পারবর্তী যোগাসন শৃঙ্গ পর্যন্ত ইহার জন্য প্রত্যক্ষ পরোক্ষ আন্দোলন চলিতেছে—ইহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয় না। যেন এইভাবেই বিরুদ্ধ ভাগ্যের প্রতিকূলতার ত্রিলোকব্যাপী ষড়যন্ত্র বেষ্টিত হইয়া থাকে। যাহার পতন আসন্ন তাহার জন্য দুরবগাহ সমুদ্রতল হইতে দুষ্প্রবেশ্য যোগশৃঙ্গ পর্যন্ত সর্বত্রই দুরদৃষ্টের অট্টহাস্য নিঃশব্দে ধ্বনিত হয়। আমাদের অলক্ষ্যে অগোচরে রাত্রির অন্ধকারে আমাদের মৃত্যুর জন্য কোথায় কে অস্ত্রসংগ্রহ করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? ইহাই মুখ্যত দ্বিতীয় সর্গের সার্থকতা।

মেঘনাদবধ-কাব্যবর্ণিত ঘটনা রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হইলেও মধুসূদন বাল্মীকির পৃষ্ঠা হইতে কাহিনীর কিশলয়টুকু উন্মূল করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভূমিতে পুনরায় রোপণ করিয়াছেন। ইহার জলসেচ পদ্ধতি ও ভূমিকর্ষণায়

আধুনিকতম ব্যবস্থা, আলোক ও বায়ুপ্রবাহের বৈজ্ঞানিক বিধি, উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অভিনব উপাদান প্রয়োগ উপ্ত কিশলয়ের মৌলিক পরিবর্তন সাধন না করিলেও তাহার পল্লব ও পুষ্পসৌন্দর্যের যে গুণগত পরিবর্তন ঘটাইয়াছে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সারস্বত প্রতিভার সহিত গভীর পরিচয় এই পরিবর্তন কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছে। মধুসূদনের ব্যক্তিগত বৈপ্লবিক প্রতিভা, কাব্যসংস্কার প্রয়াস ও মহাকবি হইবার ইচ্ছা এই ভূম্যন্তর ব্যাপারে সর্বাধিক জলসেক করিয়াছে। এইজন্যই মূল কাহিনী ব্যতীত রামায়ণ কাব্যের সহিত মধুসূদন বিশেষ কোন আনুগত্যে বাধিত হন নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে ইন্দ্রজিৎ-নিধনের জন্য লক্ষ্মণের অস্ত্রলাভের ঘটনাটিও বাল্মীকি রামায়ণে নাই। (মধুসূদন ইহা গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ডের চতুর্দশ সর্গ হইতে সংকলন করিয়াছেন এবং রাজনারায়ণ বসুকে পুর্বাহ্ণেই ইহা জানাইয়া দিয়াছেন। জপিটার বা জিউসের অনুগ্রহভাজন ট্রয়বাসীদের সর্বনাশসাধনের জন্য গ্রীকদিগের প্রতি পক্ষপাতগ্রস্তা জিউস-পত্নী হেরা বা জুনো কিরূপে ইডা-পর্বতস্থিত জিউসের মনোহরণ করিয়া শত্রুপরাভবের উপায় সন্ধান করেন এবং এই ব্যাপারে তিনি কিরূপে সৌন্দর্যদেবী আফ্রোদিতে ও নিদ্রাদেবতা সমনাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা মধুসূদনকে ভারতীয় দেশসমাজের উপর অনুরূপ ব্যাপারে প্রয়োগ করিতে সাহায্য করিয়াছে।) পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ঘটনাকে এইভাবে ভারতীয় পরিবেশে স্থানান্তরিত করার পশ্চাতে যে দূরদর্শী কল্পনা আছে, তাহা মধুসূদনের ন্যায় মহাকবির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় কবি যে 'কবির চিত্তফুলবনমধু' লইয়া মধুচক্র রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ বৈদেশিক উপাদান-যোজনার পরিদর্শিতার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে, ইহাও দ্বিতীয় সর্গের অন্যতম সার্থকতা।

দ্বিতীয় সর্গের দেবদেবী চরিত্র

দ্বিতীয় সর্গে মধুসূদন লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্র ও তৎপত্নী শচীদেবী, মহেশ্বর ও মহেশ্বরী এবং মায়াদেবী, এই কয়জন দেবদেবীর অবতারণা করিয়াছেন। ইহাদের ভিতর মেঘনাদের মৃত্যু-সংঘটনে ইন্দ্রের উদ্বেগ উদ্যোগ ও তৎপরতাই সমধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য ইহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, রাবণের বিপক্ষতাচরণ কিংবা ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসম্পাদনের উদ্দেশ্যে সমগ্র দৈবসমাজের

অহেতুক ব্যস্ততা সত্ত্বেও মধুসূদনের কবিকল্পনা কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোনো দেবতাকেই পাঠকের চক্ষে ঘৃণাজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। মধুসূদনের পত্রাংশে প্রচারিত উদ্ধৃতি সমর্থন করিয়া বলা যায় তিনি কুত্রাপি তাঁহার কাব্যের উপর অজ্ঞতাজনিত বা ধর্মবিদ্বেষপ্রণোদিত কোনো প্রকার অহিন্দু পরিধেয় বিন্যস্ত করেন নাই। তাই দ্বিতীয় সর্গে দেবপরিবারের চিত্রগুলি যথোচিত সংযম সতর্কতা ও শ্রদ্ধার সহিতই অঙ্কিত হইয়াছে। ইঁহাদের সম্পর্কে পাঠকের মনোভাব কবি-ব্যবহৃত কোনো কটূক্তি বা কটাক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আধুনিক পাঠক দৈবব্যাকুলতার আতিশয্যের মূল্যায়ন করিয়া একটি নিরপেক্ষদৃষ্টিসঞ্জাত ধারণা সঞ্চয় করিতে পারে, যাহা আমাদের সনাতন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ছন্দ অনুগামী নহে।

প্রথম সর্গে রাবণের রণসজ্জার পরাক্রমজনিত ভূকম্পনে সমুদ্রগর্ভস্থ আন্দোলিত প্রসাধনকক্ষে সমুদ্রাধিপতি বরুণের স্ত্রী বারুণী সখী মুরলাকে তাঁহার পূর্বতন সখী লঙ্কাপুর-রাজলক্ষ্মীর নিকট লঙ্কাযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সর্গে লঙ্কার কুললক্ষ্মী স্বয়ং ত্রিদশ-আলয়ে উপনীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট লঙ্কার রণপ্রস্তুতি বিবৃত করিয়াছেন এবং দেব-কুল-প্রিয় রাঘবদ্বয়কে রক্ষার জন্য ইন্দ্রের নিকট যথোচিত ব্যবস্থাবলম্বনের অনুরোধ করিয়াছেন। লক্ষ্মীর সনির্বন্ধ অনুরোধে দেবেন্দ্র শচীসহ তৎক্ষণাৎ কৈলাসধামে যাত্রা করিয়াছেন এবং পার্বতীর নিকট লক্ষ্মীর অনুরোধ পেশ করিয়া রামচন্দ্রকে রক্ষার জন্য মহাদেবীর নিকট মিনতি করিয়াছেন। প্রথমে মহাদেবী শিবভক্ত রাবণের শত্রুতাসাধনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেও সেই মুহূর্তে মর্তে রামচন্দ্র কর্তৃক যথোচিত অর্ঘ্যোপচারে দেবী বোধনের আয়োজন শুনিয়া ভক্তবৎসলা অম্বিকা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং রতির সাহায্যে মনোহর বেশ ধারণ করিয়া পুষ্পধনু মদনের সমভিব্যাহারে যোগাসন নামক দুর্গম পর্বতে ধ্যানব্রত মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং যৌবনা-বেশবিধুর স্বামীর নিকট ইন্দ্রজিৎ বধের উপায় জানিয়া লইয়াছেন। মহাদেবের ইঙ্গিত শ্রবণ করিয়া মদন ইন্দ্রকে তদনুরূপ বার্তা প্রদান করিয়াছেন ও ইন্দ্র মায়াদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া মহাদেবের ইঙ্গিত জ্ঞাপন করিয়াছেন। মায়াদেবীও সেই মুহূর্তে তারকাসুরবধের জন্য মহাদেব-নির্মিত ও কার্তিকেয়-ব্যবহৃত মহারুদ্র-তেজ দৈবাস্ত্রগুলি লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিবার জন্য ইন্দ্রকে দান করিয়াছেন ও স্বয়ং অন্যায় সমরে মেঘনাদবধে লক্ষ্মণকে সহায়তা করিবেন

এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইন্দ্রের নির্দেশে চিত্ররথ নামক দেবদূত যথা-সময়ে সেই অস্ত্রগুলি রামচন্দ্রের শিবিরে দৈব আশীর্বাদস্বরূপ দান করিয়া গিয়াছেন।

এই তৎপর বিবরণের মধ্য দিয়া প্রধান হইয়া উঠিয়াছে **ইন্দ্রের** চরিত্র। ইন্দ্র স্বর্গেশ্বর, সুতরাং স্বর্গীয় স্বার্থরক্ষায় তাঁহার দায়িত্বই সর্বাধিক। নিখিল দেবতাবর্গের প্রিয় রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সম্ভাব্য শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করা, স্বর্গপরিবারভুক্ত লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধ রক্ষা করা যেমন তাঁহার কর্তব্যের অঙ্গ, সেইরূপ দেবশক্তির স্পর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার উদ্বেগও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সর্বোপরি ইন্দ্র স্বয়ং দেবশ্রেষ্ঠ পদাধিকারী হইয়াও মেঘনাদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, এই গ্লানি নিবারণের সুযোগও তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। এই দিক দিয়া মেঘনাদবধের স্বর্গীয় ষড়যন্ত্রে ইন্দ্রের সকর্মক ব্যস্ততা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবীর প্রতি ইন্দ্রের সবিনয় ভক্তি, ভগবতী দুর্গার নিকট সকাতর অনুনয়, মায়াদেবীর নিকট তাঁহার সসম্ভ্রম আচরণ এইগুলি ইন্দ্রের চরিত্রের সহিত সংগতিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু মহাদেবের অনুপস্থিতে নগেন্দ্রনন্দিনী দুর্গার নিকট ইন্দ্র যে ভাষায় রাবণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত উষ্মা অভিমান ও নৈরাশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—ইহা মহাদেবীর নিকট অগোচর থাকে নাই। দেবদ্রোহী অধর্মাচারী রাবণের প্রতিপক্ষরূপে সুশীল ধর্মপথচারী রাঘবের তুলনা রামচন্দ্রকে মর্যাদা দান করে নাই, ইহা নীতিমূলক গল্পে দুঃশীল ও সুশীল বালকের তুলনামূলক আলোচনার মত লঘু হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রের পত্নীরূপে **শচীর** ভূমিকা ইন্দ্রের কর্মপটুতা ও উদ্দেশ্যের প্রসারণেই নিয়োজিত হইয়াছে মাত্র। ইন্দ্র যেখানে পার্বতীর করুণা উদ্রেকের জন্য রামচন্দ্রের অসহায়তার বিবরণ দিয়াছেন, নারী হিসাবে শচী সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে নিগৃহীতা সীতার দৃষ্টান্তের দ্বারা পার্বতীর নারী হৃদয়ে অনুকম্পা আকর্ষণ করিতে ও রাবণের উপর তীব্রতর ক্রোধ উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে দেব-কুল-প্রিয় রাঘবের জন্য শচীর দুশ্চিন্তা অপেক্ষা ইন্দ্রজিতের হস্তে স্বামীর পূর্বতন পরাজয়ের লজ্জা ও কলঙ্কই তাঁহাকে ভগবতীর চরণে অধিকতর কৃপাপ্রার্থিনী করিয়াছে। ইহাতে শচী চরিত্রটিকে মধুসূদন ইন্দ্র অপেক্ষাও বাস্তব ও সংগতিপূর্ণ করিয়াছেন।

অন্যান্য দেবচরিত্রের মধ্যে **মহাদেব** ও **পার্বতী** দ্বিতীয় সর্গের মুখ্য

আকর্ষণ বলা যায়। যোগাসন-পর্বতে ধ্যানরত মহাদেবকে বিলোলবেশ ও উতরোল যৌবনের দ্বারা বিচলিত করিয়া জগদীশ্বরী ইন্দ্রজিতের নিধন রহস্য জানিয়া লইলেন, ভারতীয় পৌরাণিক দেবচরিত্রের এহেন পরিকল্পনা সমকালীন বাঙালী পাঠকের অনেকেরই অনুমোদন লাভ করে নাই এবং ইহার জন্য মধুসূদন রীতিমত সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দেবচরিত্র পরিকল্পনা কোনো ধর্মসংস্কারের দ্বারা বিচার্য হইতে পারে না, কারণ হোমারের মহাকাব্য হইতে মধুসূদন ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পার্বতী ও মহাদেব দেবতাদ্বয়ের মধ্যে মহাদেব অপেক্ষাকৃত সতর্ক বর্ণে অঙ্কিত, যদিও ধ্যানমহিম বিশ্বনাথের মদনবাণাহত কামাতুরতা আমাদের অভ্যস্ত ধারণাকে পীড়িত করে। দুর্গম যোগাসন-পর্বতে মহাদেবের কঠিন তপস্যা-নিরত স্তব্ধ-গম্ভীর মূর্তি এবং কামদেবের প্রথম-নিক্ষিপ্ত পুষ্পশরে তাঁহার ত্রিনয়নের অগ্নিস্ফুরণ কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের নিবাতনিষ্কম্প যোগীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও পরক্ষণেই পার্বতীর মোহিনীরূপ দর্শনে তাঁহার বিহ্বলতা ও প্রেমামোদে মত্ত হওয়া যতখানি কাহিনীর উপায়রূপে দ্রুত কল্পিত হইয়াছে, ততখানি চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। প্রতীচ্য মহাকাব্যের জুপিটার অপেক্ষা ভারতীয় শাস্ত্রের শৈব আদর্শ অপেক্ষাকৃত উন্নত, জুনো-র ক্রূরতাও দুর্গার উপর আরোপ করা শোভন হয় নাই। কুমার-সম্ভব কাব্যের আর্শদকেও মধুসূদন নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কারণ কালিদাসের কাব্যে পঞ্চশর ধ্যানস্থ মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া বাণক্ষেপ করেন নাই, ধ্যানভঙ্গের পর পার্বতীর প্রতি পতিলাভের আশীর্বাদ-প্রদানরত মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি কুসুমধনু চালনা করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ শরাহত হইয়া মহাদেব চন্দ্রোদয়ারম্ভে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য হইলেন এবং উমার রক্তাভ অধরোষ্ঠে আকর্ণ-আয়ত দৃষ্টি মেলিয়া ধরিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁহার ব্যাকুলতা সংযত হইল—ইন্দ্রিয়-ক্ষুব্ধ যুগ্মনেত্র পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল এবং এই সাময়িক চঞ্চলতার হেতু আবিষ্কারের জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখনই বৃক্ষশাখা-বিলগ্ন ভয়াতুর মদনের প্রতি তাঁহার ত্রিনয়নের রোষবহ্নি ধাবিত হইল।

কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে মহাদেব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মদনদেবের দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং সেইক্ষণেই তাঁহার কম্পিত জটাজুট-আশ্রিত মস্তকের ললাট-কেন্দ্র হইতে চিত্রভানু বিকীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে মহাদেবের

মানসিক ক্রোধের সহিত একাত্ম হইয়া ললাটাগ্নি একটি যান্ত্রিক কলাকুশলতায় পরিণত হইয়াছে মাত্র। যোগভঙ্গপ্রযুক্ত মহাদেবের কোপ পার্বতীর দৃষ্টি-বিভ্রমকারী রূপসৌন্দর্য-দর্শনে মুহূর্তে তিরোহিত হইয়াছে এবং পরমসমাদরে তিনি সুচারুহাসিনী ভার্যাকে অজিন-আসনে সহাবস্থানের অনুমতি দিয়াছেন। পার্বতীর বক্ষোলগ্ন অদৃশ্যপ্রায় মদন ইহার পরও কৌতূহল-বশতঃ মহাদেবকে পুনঃপুনঃ ধনুঃশরে বিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা মহাদেবের ক্রোধের বদলে আর একপ্রকার পরিলুপ্তধৈর্য কামনার উদ্রেক করিয়াছে, যাহা দেবাদিদেবের শীর্ষস্থিত চন্দ্রকে লজ্জাবশতঃ প্রচ্ছন্ন থাকিতে ও ললাটনিহিত অগ্নিকে ভস্মাচ্ছাদিত করিতে বাধ্য করিয়াছে।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের মৃত্যুমন্ত্র প্রকাশ করিবার ব্যাপারে মধুসূদন মহাদেবের সংলাপে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। মহাদেব ত্রিকালজ্ঞ, সর্বদর্শী—তাই স্বর্গ মর্ত পাতালের কোনো সংবাদই তাঁহার অবিদিত নহে। লক্ষণীয় যে, স্বর্গধামের আর কোনো দেবতাকেই মধুসূদন এরূপ সর্বজ্ঞ করিয়া আঁকেন নাই। তাই পার্বতীর নিকট শচীসহ বাসবের আগমন, রামচন্দ্রের অকালবোধন প্রভৃতি ব্যাপার মহাদেবের গোচরীভূত। রাবণ তাঁহার পরমভক্ত হইলেও ভক্তের স্বকৃত কর্মফলই তাঁহার পতনকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া সেই বিধি-নির্দিষ্ট পরিণাম রোধ করিবার ক্ষমতা মহাদেবেরও নাই। এইভাবে কবি মহাদেবকেও নিয়তি নামক দুর্জ্ঞেয় শক্তির অধীন করিয়াছেন। কিন্তু মহাদেব পার্বতীর নিকট ইন্দ্রজিৎ-হত্যার কোনো তথ্যপূর্ণ ব্যবস্থার নির্দেশ দান করেন নাই। তিনি কেবল ইন্দ্রকে মায়াদেবীর সাহায্য গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং এই সংযম ও মিতবাক্ ইঙ্গিত ইন্দ্রজিৎ-নিধনে তৎপর ও উদ্বিগ্ন অন্যান্য দেবতার তুলনায় মহাদেবকে শেষ পর্যন্ত ঈষৎ স্বাতন্ত্র্যে ও শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কিন্তু পার্বতীর চরিত্র মহাদেবের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অশাস্ত্রীয় ও অধিকতর প্রতীচীয়। জুনো-র ক্রূরতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা তাঁহার মধ্যে না থাকিলেও উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় সন্ধানে তিনি জুনো-র ন্যায়ই কুটিল কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। জগদীশ্বরের পত্নী হওয়ার জন্য জাগতিক ধর্ম-রক্ষায় তাঁহার যে দায়িত্বের কথা ইন্দ্র শচী বা লক্ষ্মীদেবীর মন্তব্যে সূচিত হইয়াছে, পার্বতীর ব্যক্তিত্বহীন সংলাপে তাহার বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। পরম-অধর্মাচারী নিশাচর-পতি রাবণের নারীহরণজনিত অপরাধ

বা সীতাদেবীর লাঞ্ছনা ও পিতৃসত্যরক্ষাব্রতী সুশীল রামচন্দ্রের দুর্গতি তাঁহাকে বিচলিত করে নাই। রাবণের সকল অপরাধের তুলনায় তাঁহার শিবভক্ত হওয়ার সৌভাগ্যই পার্বতীর নিকট যাবতীয় অপরাধের মার্জনা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। রাবণের সকল দুষ্কর্মের বিবরণ তাঁহাকে দুষ্কৃতিদমনে উত্তেজিত না করিয়া ইন্দ্র ও শচীর ব্যক্তিগত রাবণ-বিদ্বেষ-আবিষ্কারেই প্রণোদিত করিয়াছে। একদিকে এই অন্যায় ঘটনা সম্পর্কে নিস্পৃহতা, অন্যদিকে ভক্ত-ব্যাকুলতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্র ও শচীর সনির্বন্ধ অনুরোধ যাঁহার সুবিবেচনা জাগাইতে পারে নাই, তিনি সহসা ভক্তের আরাধন-সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। দেবরাজ ও দেবরাজ্ঞীর ধর্মরক্ষার অনুরোধ যাহা করিতে পারে নাই, সুদূর মর্তলোকের সামান্য সিন্দুর-চর্চিত বারি-সংঘটিত ঘট ও নীলোৎপলাঞ্জলি তাহা এক মুহূর্তে সম্ভব করিয়াছে। যথোচিত নৈবেদ্য পুষ্পার্ঘ্য ও ভক্তিউপচারে আরাধনা করিলে সামান্য নরও যে বিশ্বজননীর কৃপালাভ করিতে পারে, সম্ভবত এই লোকায়ত বিশ্বাসকেই মধুসূদন দেবী দুর্গার আচরণের দ্বারা বিপরীত দিক হইতে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ পার্বতী মহাদেবের ন্যায় সর্বজ্ঞ নহেন, ত্রিলোকের সকল সংবাদ তাঁহার নখদর্পণে নহে। মর্তবাসীর ভক্তি মর্তসীমা লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গে উপনীত হয়। রামচন্দ্র যখন মর্তে দেবীর অকালবোধন করেন, তখন কৈলাসপুরী গন্ধামোদে পূর্ণ হয়, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠে, দেবীর কনকাসন টলিয়া উঠে। কিন্তু উক্ত আন্দোলনের হেতু-নির্দেশের জন্য জগজ্জননীকে বিজয়ার সাহায্য লইতে হয় এবং বিজয়া মন্ত্র পড়িয়া খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া রামচন্দ্রের পূজা ও উপচারাদির বিস্তারিত সংবাদ সংকলন করেন। এই ধরণের পরিকল্পনা লৌকিক বিশ্বাস ও মধুসূদনের উদ্ভাবনী শক্তির মিশ্রফল। মোটের উপর, রামচন্দ্রের পূজাসংবাদে পার্বতী তাঁহার সকল নিস্পৃহতা ও অসামর্থ্য ত্যাগ করিয়া তদ্দণ্ডেই যোগাসন-পর্বতে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছেন, অথচ ক্ষণ-পূর্বেই যে পর্বত সম্বন্ধে তিনি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম।” মহাদেবের নিকট গমন করা ও ধ্যানভগ্ন করার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নাই, মুহূর্তে সমগ্র কর্মের পরিকল্পনা করিয়া তিনি প্রথমে রতিকে স্মরণ করিয়াছেন এবং রতির সাহায্যে মনোহর বেশ-ধারণ করিয়া মদনকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর ধ্যানভঙ্গাভিযানে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু পার্বতীর অঙ্গে তিনি ভেনাসের কটিবন্ধ পরান নাই, রতির দ্বারা করি

যে প্রসাধনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা একান্ত বঙ্গীয় নারীসুলভ। সুবাসিত তৈলে কেশ মার্জনা করিয়া বেণীবিন্যাস করা বা অলক্তকে চরণ রঞ্জিত করা ঠিক মদন-মনোহর-বেশবাসের ইঙ্গিত দেয় না, ইহারা এক প্রকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যশ্রী দান করে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের নারীকল্পনায় বাঙলার পুররমণীর স্নিগ্ধ কমনীয় কান্তিকে অতিক্রম করিয়া কোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ নারী-রূপ প্রকাশ পায় নাই। প্রমীলার চিত্রালোচনায়ও দেখা যাইবে, বীর্য-শালিতার সহিত একটি গার্হস্থ্য সৌম্য-সুন্দর শান্ত কমনীয়তাই তাঁহাকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্যই পার্বতীর যে রূপমাধুরী দর্শন করিলে জগতে বিপ্লবাশঙ্কা করা হইয়াছে, সে রূপমাধুরীকে কবি মনোহর সুবর্ণবরণ ঘন মায়াজালে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধত অনাবৃত স্বরূপ কবির ভাষায় প্রকাশ পাই নাই।

রক্ষঃকুললক্ষ্মীর সহিত পূর্ববর্তী সর্গেই পাঠকদিগের পরিচয় ঘটিয়াছিল, বর্তমান সর্গেও লক্ষ্মীদেবীর আগমন ঘটিয়াছে। প্রথম সর্গেই লক্ষ্মীদেবীর আচরণ সম্পর্কে কবির অনিশ্চিত মনোভাবের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমান সর্গে লক্ষ্মীদেবীকে নিশ্চিতভাবে স্বর্গীয় দেবকুলের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত দেখা গেল। প্রথম সর্গে লক্ষ্মীদেবী তৎপর হইয়া প্রভাষা ধাত্রীর বেশে ইন্দ্রজিৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং রাবণের যুদ্ধ-প্রস্তুতির উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ইন্দ্রজিৎ প্রমোদোদ্যান হইতে অবিলম্বে লঙ্কায় আসিয়া রাবণের নিকট হইতে সৈনাপত্যের কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে ইন্দ্রজিৎ-নিধনের জন্য দেবসমাজে এত তৎপরতা লক্ষ্মীদেবীই তাহার উদ্যোক্তা, তাঁহারই দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধপ্রয়াসে নিযুক্ত করা হইয়াছে, আবার তিনিই সেই সংবাদ সন্ধ্যায় দেবরাজ-সমীপে উপস্থিত করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রজিতের কবল হইতে রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার স্বর্গীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। লক্ষ্মীর এই আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁহার মতে, রাবণের পাপে ধরাতল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বসুন্ধরা সতী ধরার পাপভারে সতত ক্রন্দমানা, বাসুকী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিজ কর্মদোষে সবংশে রাবণ নিমজ্জিত হইতেছে। ইহার পর নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে বৈদেহীনাথের জীবনসংকট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং দেব কুল-প্রিয় রাঘবকে রক্ষার জন্য ইন্দ্র যেন সত্বর প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা করেন। ইন্দ্র এইজন্য বিশ্বনাথ-সকাশে যাইবার কথা বলিলে লক্ষ্মী তাহাতে সম্মত হইলেন এবং সেই সঙ্গে কন্যাসুলভ অভিমানে দীর্ঘকাল পিতাকর্তৃক কন্যার সংবাদ গ্রহণ না করার জন্য অভিযোগও যোগ করিয়া দিলেন। অথচ এই লক্ষ্মীদেবীই বলিয়াছেন যে, রাবণ তাঁহার ভক্ত, তাঁহাকে তিনি ত্যাগ করিতে অক্ষম। 'বহুবিধ রত্ন দানে, বহু যত্ন করি' রক্ষোরাজ লক্ষ্মীকে নিয়মিত পূজা করেন অথচ লক্ষ্মীদেবী কেন যে ভক্তদ্রোহিণী হইয়া উঠিলেন তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। যে ভক্তবৎসলতা দেবী দুর্গাকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা করিয়া তুলে এবং যে-কোনো প্রকারে মহাদেবের নিকট ধাবিতা করে, সেই ভক্তবৎসলতার অভাব লক্ষ্মীদেবীর মধ্যে বেদনাদায়ক। ব্যক্তিগ্রহানুযায়ী কৃপা ও কৃপণতার এই বৈপরীত্য দেবচরিত্রকে নির্মল করিয়া তুলে না। সুতরাং দেবচরিত্রাঙ্কনে মধুসূদন ভক্তির বিশুদ্ধতা অপেক্ষা ভক্তের শ্রেণী ও চরিত্র-নির্ণয়েই দেবতাবৃন্দের মনোভাব নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

মায়াদেবীর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মায়াকে দেবীরূপে সৃষ্টি করা প্রতীচ্য-মহাকাব্য-পাঠেরই প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু এই চরিত্র-কল্পনায় মধুসূদনের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। অমিত পরাক্রমশালী ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য দেবসমাজের পক্ষে যে চাতুর্য প্রয়োজন তাহা যেন মায়ার শরীরী রূপ ধারণের ফলে আরও বিশ্বাসজনক হইয়া উঠিয়াছে। মায়াদেবী মহাদেবের অনুজ্ঞানুযায়ী ইন্দ্রকে দৈব-অস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছেন এবং স্বয়ং যুদ্ধকালে দেবপক্ষকে আপন মায়াপ্রভাবে সাহায্য করিবেন, এইরূপ আশ্বাস-প্রদানের ফলে ইন্দ্রজিতের আসন্ন হত্যাকাণ্ড আরও নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। ন্যায়যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকে যে দেবতা-মানব কেহ বধ করিতে পারিবে না, মায়াদেবী কর্তৃক এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হইবার পর মায়াদেবীর ভূমিকাটি কাব্যে অপরিহার্য হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু যে বীরপুরুষকে অন্যায়যুদ্ধে বধ করিতে হইবে এবং যাহার জন্য মায়া-দেবতার ছলনাময় ষড়যন্ত্র প্রয়োজনীয়, তাহার মৃত্যুর জন্য রুদ্রতেজসম্পন্ন দৈব-অস্ত্রাদির কী প্রয়োজন ছিল, ইহা ঠিক বোধগম্য হয় না। মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর অভিমত এক্ষেত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে—

"শৈবকুলোত্তম রাক্ষসরাজের পুত্রকে নিহত করিতে হইলে, অবশ্যই মহাদেবের অনুগ্রহলাভ আবশ্যক; কিন্তু দেবেন্দ্রের মায়াদেবীর নিকট গমন, অস্ত্রলাভ, এবং চিত্ররথের দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রপ্রেরণ প্রভৃতি আড়ম্বরপূর্ণ

বিষয়গুলি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। যে ভাবে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছিলেন, তাহাতে রুদ্রতেজে নির্মিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধের জন্যই দেবানুপ্রাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন, হত্যার জন্য নহে। লক্ষ্মণকে যখন সেরূপ নরহন্তারূপে চিত্রিত করা কবির অভিপ্রেত ছিল, তখন তাঁহাকে রুদ্রতেজে নির্মিত মহাস্ত্র প্রদান না করিলেই ভাল হইত।"

ইহার উত্তরে বলা যায়, হয়ত এই সকল আয়োজনের বিপুলতার দ্বারা, প্রতিরক্ষার এই সতর্ক ব্যবস্থার দ্বারা মধুসূদন তাঁহার প্রিয় মেঘনাদের মহাবীর্যশালিতাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

দেবকুলভুক্ত হইলেও **মদন** ও তৎপত্নী **রতির** চরিত্রে মধুসূদন কোনো দেবসমাজের অনুকূল তাৎপর্য আরোপ করেন নাই। ইন্দ্রজিতের নিধন-চক্রান্তে তাঁহাদের নিয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য মদন-রতির নিকট ব্যাখ্যা করা হয় নাই অথবা রাম-রাবণ সম্পর্কে তাঁহারা অন্যান্য দেবতার মত কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। মদন এই সর্গে শিবের রোষবহ্নির ভয়ে যেভাবে পার্বতীর বক্ষোলগ্ন হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ইউরোপীয় পৌরাণিক কাব্যের শিশু কিউপিডে হাস্যকরভাবে পরিণত হইয়াছেন এবং তাহারই পার্শ্বে মদন ও রতির প্রেমাবেশবিভোর চিত্রটি শোভা পায় নাই। তৃতীয় সর্গে প্রমীলা যখন প্রমোদোদ্যান ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতে চলিয়াছেন, তখন প্রমীলার পতিপরায়ণতা ও প্রেমঘন স্বামীমিলন কামনাকে তীব্রতর করিবার জন্য অন্তরীক্ষ পথে রতিপতি মদন অব্যর্থ কুসুম-শর নিক্ষেপ করিতে করিতে অদৃশ্যভাবে প্রমীলার অনুগমন করিতেছিলেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়, প্রণয় ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী এই দেবদম্পতীকে কবি কোনো ষড়যন্ত্র বা দৈব-উদ্দেশ্যের হীনতা হইতে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ রাখিয়া প্রেম নামক ব্যাপারটির প্রতি কবিচিত্তের গভীর অপক্ষপাত শ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছেন।

নামকরণ: অস্ত্রলাভ

প্রথম সর্গে বর্ণিত অভিষেক ঘটনার ন্যায় দ্বিতীয় সর্গের অস্ত্রলাভ ঘটনাটিও মধুসূদনের স্বকল্পনাপ্রসূত। বাল্মীকি অথবা কৃত্তিবাস কাহারও কাব্যে ইন্দ্রজিৎ-নিধনের জন্য লক্ষ্মণের নিকট দৈবাস্ত্র প্রেরণের ইঙ্গিত নাই। ইহার

কারণ, বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাস কোনো কবির পক্ষেই রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিজস্ব বাহুবল রণক্ষমতা ও শৌর্যবীর্যের উপর অনাস্থা ছিল না। তাঁহারা ইন্দ্রজিৎ-হত্যার জন্য লক্ষ্মণের হস্তে নূতন কোনো অস্ত্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। তাছাড়া আক্রমণ যেখানে আততায়ীর মত, নিরস্ত্র অবস্থায় যজ্ঞাগারের নিভৃত পরিবেশে, সেখানে তেজস্বী অস্ত্রের প্রয়োজনই বা কী? ষষ্ঠ সর্গে অস্ত্রহীন মেঘনাদকে হত্যার জন্য লক্ষ্মণ কয়েকটি শর নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং একবার তরবারি ব্যবহার করিয়াছেন। সেখানে শর ও তরবারির বিশেষ দৈবক্ষমতার উল্লেখমাত্র নাই—অসহায় মায়াবশীভূত ব্যক্তিকে হত্যার জন্য সাধারণ ধনুঃশর ও অসিই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে। তথাপি মধুসূদন যে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া এই অস্ত্রলাভ-ব্যাপারটি যোজনা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। দেবতাদের নিকট হইতে লক্ষ্মণকে এই অস্ত্র প্রদান একটি প্রতীক মাত্র—ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র দেবসমাজের পক্ষ হইতে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দান করা হইয়াছে যে নিরাপত্তা ও আশ্বাস, কৃপা ও আশীর্বাদ, অস্ত্রগুলি তাহারই ধাতব উজ্জ্বল অমোঘ রূপ। লক্ষ্মণের অস্ত্রের হয়ত অভাব ছিল না, কিন্তু এই নিশ্চিত নিরাপত্তা ও সমগ্র দেবসমাজের আনুকূল্য তাঁহার নিজস্ব অস্ত্রগুলির তুলনায় যে অধিকতর শাণিত ও অনিবার্য-ভাবে শত্রুমর্মভেদী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিলেও ইন্দ্রজিৎ যে অপরাজেয় বীর, ন্যায়যুদ্ধে তিনি অবধ্য, ইহা দেবসমাজের গোচরীভূত। সুতরাং নির্দোষ মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে নিধনের জন্য এমন মহারুদ্রতেজ-সম্পন্ন অস্ত্রাদির প্রয়োজন, যাহা সাধারণ মনুষ্যবধে ব্যবহার্য হয় না। অস্ত্রের মহার্ঘ্যতার দ্বারা বধ্যব্যক্তির অমানবিক বীর্যই অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয়। ইহাও মধুসূদন তাঁহার কাব্যের প্রিয় নায়ক চরিত্র সম্পর্কে গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। তৃতীয়ত, অস্ত্রলাভ ঘটনাটি লক্ষ্মণের—একদিকে ইন্দ্রজিতের অভিষেক, অন্যদিকে লক্ষ্মণের অস্ত্রলাভ, এই দুই পরস্পর সম্পর্কিত কাহিনীর দ্বারা কবি যেন উপাখ্যানের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছেন। যে মহাশক্তিধর ইন্দ্রজিৎকে রাবণ সৈনাপত্যে অভিষেক করাইলেন, নিয়তির নিঃশব্দ চক্রান্ত সেই মুহূর্ত হইতেই তো শুরু হইয়াছে। সেই সুদূরপ্রসারী স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সংযোগকারী নিয়তির প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল লক্ষণের অস্ত্রলাভ। যে যোদ্ধৃদ্বয় চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ের জন্য পরস্পর প্রস্তুত হইতেছেন, কবি হিসাবে মধুসূদন তাঁহাদের দুই জনের প্রতিই

পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। একজনকে পিতা অভিষেক করিলেন গঙ্গোদক দ্বারা, অন্যজনকে দেব-সমাজ অভিষিক্ত করিলেন দৈবাস্ত্র-দ্বারা। সুতরাং এই অস্ত্রলাভ কেবল অস্ত্রলাভ মাত্র নহে, নিয়তি কর্তৃক সংগৃহীত মৃত্যুবাণ-লাভ। এ অস্ত্রলাভ লক্ষ্মণের অভিষেক ক্রিয়ার নামান্তর এবং সেই হিসাবে ইহা প্রথম সর্গের পরিপূরক। সুতরাং দ্বিতীয় সর্গের এই পরিকল্পনা ও নামকরণ অসার্থক হয় নাই।

তৃতীয় সর্গের কাহিনী

লঙ্কার বহির্ভাগে অবস্থিত প্রমোদকাননে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলাসহ বিলাস-অবকাশ যাপন করিতেছিলেন, সহসা বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি লঙ্কায় চলিয়া যান এবং রামচন্দ্র-বধের উদ্দেশ্যে রাবণ কর্তৃক সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হন, ইহা প্রথম সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। প্রমোদোদ্যান ত্যাগের পূর্বে প্রমীলাকে তিনি আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুবধপূর্বক অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের বিদায় গ্রহণের পর হইতে বীরাঙ্গনা প্রমীলার হৃদয় অজ্ঞাত শঙ্কায় দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া উঠিল—বিলাসকুঞ্জের প্রমোদলহরী থামিয়া গেল। অধীর প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হইয়া প্রমীলা সখী বাসন্তীর নিকট শোককাতর হৃদয়ে স্বামী আগমনের বিলম্বহেতু আশঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কুঞ্জদ্বারে রজনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে—সেই ম্লান প্রদোষে স্তিমিতগীত নিকুঞ্জে সান্ত্বনা ও ধৈর্যের বাণী শুনাইয়া বাসন্তী প্রমীলার সহিত পুষ্পচয়ন ও মাল্যগ্রন্থনে রত হইলেন। বিরহবিধুরা প্রমীলার অশ্রুবর্ষণে আরণ্যক পুষ্প অকারণে সিক্ত হইয়া উঠিল। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় তখন প্রমীলা লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। শত্রু-অবরুদ্ধ পুরীতে নারীর পক্ষে অনুপ্রবেশ দুঃসাধ্য—বাসন্তীর এইরূপ নিষেধে বীরাঙ্গনা প্রমীলার নারীবীর্য অভিমানাহত হইল এবং তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পুরী-প্রবেশের প্রস্তুতির জন্য স্বর্ণ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে প্রমীলার নারীবাহিনী সজ্জিত হইল। কোলাহলে চতুর্দিক ব্যাপ্ত হইল, বীরমদে মত্ত ললনাবৃন্দ যোদ্ধসাজে প্রস্তুত হইল। অস্ত্র ও অলংকারের, বীর্য ও লাবণ্যের, ভয়ংকর ও সুন্দরের অপরূপ সমাবেশ ঘটিল। নৃমুণ্ডমালিনী নামে জনৈকা উগ্রচণ্ডা সহচরীর নেতৃত্বে একশত সশস্ত্র রমণী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। তেজস্বিনী প্রমীলা

সর্বাঙ্গে সৈনিক-সুলভ রণসাজ পরিয়া বড়বা-নাম্নী ঘোটকীর পৃষ্ঠে চড়িলেন। শত চেড়ী তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। গম্ভীর মেঘমন্দ্রধ্বনিতে প্রমীলা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, লঙ্কাপুরে অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ অবরুদ্ধ হইয়া আছেন শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। দানববংশের রমণী তাহারা, সমরপটীয়সী ও বাহুবল-ধারিণী তাহারাই আজ লঙ্কাশত্রু রামচন্দ্র-বাহিনীর পরাক্রম পরীক্ষা করিবেন। দৈত্য-কুলনন্দিনীর এই হুংকৃত উত্তেজনায় নারী-সেনাদল চঞ্চল হইল, তাহাদের পদভারে জলস্থল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, সধূম অগ্নিশিখার মতই অন্ধকারে সেই তেজোময়ী বাহিনী লঙ্কার পশ্চিম দুয়ারে উপস্থিত হইল। শত শঙ্খনাদে ও কোদণ্ড-টংকারে লঙ্কার অধিবাসীবৃন্দ, জীবজন্তু, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিল। পশ্চিম দুয়ারে প্রহরারত হনুমান প্রমীলার বাহিনীকে প্রতিহত করিয়া জানাইল, নিশাচর মায়াবী যে বেশেই আসুক না কেন, রামচন্দ্রের শিবিরে শিবিরে সতর্ক প্রহরা, সর্বপ্রকার শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। সগর্জন ধনুষ্টংকারে নৃমুণ্ড-মালিনীর কণ্ঠে ঘোষিত হইল, স্বয়ং ইন্দ্রজিৎপত্নী প্রমীলা লঙ্কাপুরে প্রবেশোদ্যত—তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য হনুমান তাহার প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে ডাকিয়া আনিতে পারে। ক্ষুদ্রজীবী বনবাসী হনুর সহিত সংগ্রামে তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই।

পবননন্দনের পরাক্রম নিতান্ত সামান্য ছিল না, তৎসত্ত্বেও বীরাঙ্গনা-বাহিনীও রূপসী প্রমীলা দানবীকে দেখিয়া হনূ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সসাগরা ধরিত্রীর যত রমণী হনূ সচক্ষে দর্শন করিয়াছে, তন্মধ্যে ইহার রূপরাশি সর্বশ্রেষ্ঠ। তখন প্রকাশ্যে গম্ভীর ও ধীরকণ্ঠে হনূ জানাইল যে, তাহার প্রভু বীরশ্রেষ্ঠ, কিন্তু দয়াপরবশ, অবলা নারীর প্রতি তিনি কখনই বিদ্বিষ্ট নহেন। প্রমীলার আবেদন হনূ রাঘবের নিকট জানাইবে। তখন প্রমীলা মধুর বীণানন্দিত কণ্ঠে হনূকে জানাইলেন যে রঘুবর পতিবৈরী হইলেও প্রমীলার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ শত্রুতার সম্পর্ক নাই। তাঁহার স্বামী ভুবনবিজয়ী, তাঁহার শত্রুর সহিত প্রমীলার অকারণ শত্রুতার কী প্রয়োজন? রামচন্দ্রের নিকট প্রমীলার যাহা নিবেদন তাহা স্বকণ্ঠে পেশ করিবার জন্য তিনি সহচরী নৃমুণ্ডমালিনীকে হনূর সহিত রাঘবসমীপে প্রেরণ করিলেন। অপেক্ষমাণ রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর মধ্য

দিয়া উদ্ধত পদক্ষেপে নির্ভয়হৃদয়ে নৃমুণ্ডমালিনী রামচন্দ্রের শিবিরে চলিলে তাহার অনিন্দ্য যৌবনের সহিত রণসজ্জা মিলিত হইয়া যে সৌন্দর্য ও ভীষণতার সৃষ্টি করিয়াছিল, রাঘব-সৈন্যদের চিত্তে তাহা যুগপৎ ত্রাস ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতে লাগিল। শিবিরাভ্যন্তরে সদ্যপ্রাপ্ত দৈবাস্ত্রগুলিতে পুষ্পচন্দন নিবেদন করিয়া তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও বিভীষণ সেগুলির গুণগরিমা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে আলোচনা করিতেছিলেন। সহসা শিবিরদ্বারে ভৈরবীরূপিণী নারীমূর্তি দর্শনে রামচন্দ্র তাহা লঙ্কাধিপতি রাবণের কোনো নূতন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া মনে করিয়া বিভীষণকে এই ব্যাপারে সত্বর অনুসন্ধানের অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে হনুমানের সহিত নৃমুণ্ডমালিনী প্রবেশ করিয়া আত্মপরিচয় দান করিল ও প্রমীলার সসৈন্য লঙ্কাদ্বারে আগমনের উদ্দেশ্য সবিনয়ে বিবৃত করিল। বীরকুলাঙ্গনা প্রমীলা স্বামী-মিলনের উদ্দেশ্যে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিবে, হয় রামচন্দ্র তাহার অবরোধ মুক্ত করিয়া দিন অথবা যে কোনও পদ্ধতিতে প্রমীলার সহিত সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হউন। কিন্তু রাবণের সহিত বিবাদ থাকিলেও অকারণে কুলনন্দিনীর সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা রামচন্দ্রের নাই, তিনি নৃমুণ্ডমালিনীকে প্রমীলার সগৌরবে লঙ্কাপ্রবেশের অনুমতি দান করিলেন এবং প্রমীলার পতিভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করিলেন। প্রমীলা-বাহিনীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি হনূমানকে নির্দেশ দিলেন।

দূতী বিদায় গ্রহণ করিলে বিভীষণ ও রামচন্দ্র উভয়েই প্রমীলার পরাক্রমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়া নির্ভীকভাবে প্রমীলার নারী-সৈন্যদল চলিয়াছে, তাহাদের অস্ত্রধ্বনি ও অলংকার ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাদের রূপের জ্যোতি চতুর্দিকের অন্ধকারকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিল। সম্মুখে উগ্রচণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী এবং পশ্চাতে শূলপাণি প্রমীলা, মধ্যে শত অশ্বারূঢ়া নারীবাহিনী চলিয়াছে। তাহাদের সহিত বীণা বাঁশি মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি যন্ত্রবাদ্য বাজিতেছে, অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পধনু মদন প্রমীলার প্রতি কুসুম-শায়ক নিক্ষেপে প্রমীলার পতিপ্রেম ও স্বামী-সহগমন-বাসনাকে মুহুর্মুহু উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন। এরূপ দৃশ্য রামচন্দ্রের নিকট স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখনও তিনি ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতেছিলেন। ইন্দ্রদূত চিত্ররথের

নিকট রামচন্দ্র শুনিয়াছিলেন, মায়াদেবী রামচন্দ্রকে সাহায্য করিতে স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন। মায়াদেবী প্রমীলার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল কিনা ইহাই তিনি বিভীষণের নিকট জানিতে চাহিলেন। কিন্তু বিভীষণ রামচন্দ্রকে জানাইলেন, প্রমীলার আবির্ভাব কোনো দৈবীমায়া নহে। মহাশক্তির অংশে প্রমীলার জন্ম, কালনেমি নামক সুবিখ্যাত দৈত্য তাহার পিতা—ইহাই প্রমীলার মহাতেজস্বিতার হেতু। স্বয়ং ইন্দ্রকে যে মহাবীর মেঘনাদ পরাস্ত করিয়াছেন, সেই মেঘনাদ এই বীররূপসীর সৌন্দর্যবন্ধনে বন্দী হইয়া থাকেন, নতুবা ইন্দ্রজিতেব তেজে জগৎ দগ্ধ হইত। প্রমত্ত বলের জন্য এই বন্ধন বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট, যেমন বৃষ্টিধারা দাবানলকে প্রশমিত করে, বিষদন্ত কালফণী যমুনাগর্ভে আত্মগুপ্ত থাকে। ইহারই ফলে ত্রিভুবনে স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে।

মহাবলী মেঘনাদের পরাক্রম রামচন্দ্রের অবিদিত ছিল না। ইহার সহিত যদি প্রমীলার শক্তিসম্ভূত তেজস্বিতা যুক্ত হয়, তবে রামচন্দ্র কর্তৃক লঙ্কাভিযানের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে রামচন্দ্র এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিলে সবিনয়ে লক্ষ্মণ বলিলেন, স্বয়ং দেবরাজ যাঁহাদের সহায় তাঁহাদের ভয় নাই। পরদিবস প্রভাতে অবশ্যই ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হইবে, পরম অধর্মচারী রাবণের পাপেই ইন্দ্রজিৎ-নিধন সম্ভব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তত দেবদূত চিত্ররথ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। বিভীষণ লক্ষ্মণের উক্তি সমর্থন করিয়া বলিলেন, আপনার পাপে রাবণের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং পরিণামে ধর্মের বিজয় ঘটিবে, কিন্তু তথাপি প্রমীলা হইতে সাবধানতার প্রয়োজন আছে। নৈশ অন্ধকারে কোনো অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে শিবিরে শিবিরে সর্বত্র সকলকে সতর্ক থাকিবার জন্য নির্দেশ দিতে বলিলেন।

শিঙ্গা দুন্দুভি প্রমুখ বাদ্যভাণ্ড-সমারোহে লঙ্কার স্বর্ণদ্বারে প্রমীলা-বাহিনী উপনীত হইলে লঙ্কা-প্রহরী ভীমকান্ত সদাজাগ্রত রাক্ষস সৈন্যগণ তাহাদিগকে শত্রু পক্ষ মনে করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল এবং অস্ত্রসঞ্চালনের দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইল। তখন নৃমুণ্ডমালিনী উচ্চকণ্ঠে রাক্ষসদের মূঢ়তাকে ভর্ৎসনা করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিল এবং তৎক্ষণাৎ পুরদ্বার উন্মোচিত হইল। জয়বাদ্য-নিনাদে রাজধানীর রাজপথে বিজয়িনীবেশে প্রমীলা-বাহিনী প্রবেশ করিল, লঙ্কাবাসী আনন্দে উল্লাসে তাহাদের বেষ্টন করিয়া মাঙ্গলিক ও বন্দনা গানে

অভ্যর্থিত করিল। চারিদিকে কোলাহল উত্থিত হইল—তাহারই মধ্য দিয়া প্রমীলা বীরাঙ্গনা হৃষ্টচিত্তে পতির মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

প্রমীলার এইরূপ আকস্মিক পুরী-প্রবেশ ইন্দ্রজিতের কৌতুক উদ্রেক করিল, তিনি পরিহাসচ্ছলে প্রমীলাকে রক্তবীজ-নিধনকারিণী দেবী চামুণ্ডার সহিত তুলনা করিলেন। প্রমীলাও তদুত্তরে সরসকণ্ঠে বলিলেন, ইন্দ্রজিতের চরণকৃপায় প্রমীলা কেবল রক্তবীজ নহে, বিশ্বজয় করিবার স্পর্ধা রাখেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুষ্পধনু মদনই তাঁহার অজেয়। শত্রুনিক্ষিপ্ত শরবর্ষণে প্রমীলা ভীত নহে, কিন্তু বিচ্ছেদ-বেদনাই তাহার অসহনীয়। ইহাই শত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রমীলার স্বামী-সন্নিধানে অভিযানের কারণ। ইতি-মধ্যে প্রমীলা তাঁহার যুদ্ধসাজ রণবেশভূষণ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া পুনরায় ললিত যৌবনের উপযোগী অলংকার ও বেশবাস ধারণ করিলেন এবং নিবিড় হর্ষে ও মিলনসুখে স্বামীর সহিত স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলেন। চতুর্দিকে গীতবাদ্য ধ্বনিত হইতে লাগিল।

লঙ্কার বাহিরে তখন রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিনিদ্র প্রহরা দেখিয়া বিভীষণ ও লক্ষ্মণ হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন।

প্রমীলার রণরঙ্গিণী বেশে লঙ্কাপুরে প্রবেশ ও স্বামী মিলন-প্রয়াস অন্তরীক্ষ হইতে পার্বতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রমীলার সৈন্যদলের স্বর্ণ বর্মের জ্যোতি স্বর্গেও দীপিত হইতেছিল। প্রমীলার এই নৃত্যপরায়ণা রণচ্ছন্দ সতীর নিকট আপনার পূর্বকালের স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিল, যখন তিনি অনুরূপ বেশে দানবদমনী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিজয়া সখী আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া জানাইল যে, মহাবীর ইন্দ্রজিতের সহিত মহারুদ্ররূপিণী প্রমীলার মিলন ঘটিলে পরদিবস ইন্দ্রজিতের নিধন দুঃসাধ্য হইবে এবং ইহাতে ইন্দ্র ও রামচন্দ্রকে প্রদত্ত পার্বতীর প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হইবারই সম্ভাবনা। ইহাতে পার্বতী জানাইলেন, পরদিবস যথাসময়ে তিনি পার্বতীর তেজ হরণ করিবেন এবং মেঘনাদের মৃত্যুর পর মেঘনাদ ও প্রমীলা উভয়েই কৈলাস ধামে আসিলে মেঘনাদ শিবের সেবা করিবেন ও প্রমীলাকে পার্বতী আপনার সখীদলভুক্ত করিয়া লইবেন।

তৃতীয় সর্গের সার্থকতা

তৃতীয় সর্গের বিষয়বস্তু লঙ্কাপুরীর উপকণ্ঠস্থিত প্রমীলার প্রমোদোদ্যান হইতে প্রমীলার রাজধানীতে প্রবেশ। স্বামী ইন্দ্রজিতের সহিত মিলন মূল

কাহিনীর সহিত কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত না হইলেও সর্গটির সার্থকতা অন্য দিক দিয়া বিচার্য। রামচন্দ্রের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রমীলার লঙ্কা আগমনের দ্বারা কোনোরূপ প্রভাবিত হয় নাই। (ইন্দ্রজিতের নিধনে প্রমীলার প্রতিক্রিয়া প্রমীলার যে-কোনো স্থানে উপস্থিতি সত্ত্বেও একই প্রকার হইত এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বীর পরিণামকেও তাহা বিলম্বিত করিত না, ইহাও সত্য।) তৎসত্ত্বেও মধুসূদন যে সকল গভীর উদ্দেশ্য লইয়া এই সর্গের পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেইগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও চমকপ্রদ আবিষ্ক্রিয়ার সহিত পরিচিত হওয়া যায়। মহাকাব্যের বিশাল ব্যাপ্তি তাহার আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র-কাহিনী যোজনায় ও পারিপার্শ্বিকের সতর্ক চিত্রণের উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকে। মহাকাব্য কেবলমাত্র নায়ক চরিত্রের আলেখ্য নহে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জ্যোতির্মণ্ডলী ও অগ্নিবলয়টিকেও যথোচিত গুরুত্ব দান করা ইহার অন্যতম শর্ত। (অর্জুন লক্ষ্যভেদের সময় কেবল বিহঙ্গের অক্ষির দিকেই তাঁহার শর-সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য তীরন্দাজগণ দৃষ্টির ব্যাপ্তিহেতু কেহ বৃক্ষশাখা, কেহ সমগ্র বিহঙ্গ ইত্যাদি লক্ষ্য করিতেছিলেন। অর্জুনের সহিত তুলনায় অন্যান্য শায়ক-সন্ধানীদের দৃষ্টি সাহিত্যে প্রয়োগ করিলে বলা যায়, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ আধুনিক যুগের ছোটগল্প-লেখকের ন্যায় এবং অন্যান্য ধনুর্বেত্তাদের দৃষ্টি ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারদের সহিত তুলনীয়।) উপন্যাস এবং মহাকাব্যের মধ্যে এই দিক দিয়া কিছুটা একরূপতা আছে—উভয়েরই লক্ষ্য জীবনের বিস্তৃতি, গভীরতার সহিত ব্যাপ্তির যোজনা। মহাকাব্যকার অনেকগুলি উপনদী-শাখানদীকে একটি মহানদীর সহিত মিলিত করিয়া তাহার সমুদ্রগামিতাকে আরও স্রোতোবেগ-গভীর ও অন্তর্বিদ্যুৎ-প্রবাহিণী করিয়া তোলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান কাহিনী ইহার ষষ্ঠ সর্গে ঘটিলেও ইহার প্রতিটি সর্গ সেই একটি ঘটনাকেই চরিতার্থ করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে। প্রতিটি ক্ষুদ্র বৃহৎ তুচ্ছ বা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মূল কাহিনীর সহিত ভাবসূত্রে বা ঘটনাসূত্রে জড়িত হইয়া একটি দুর্দমনীয় নিয়তির দ্বারা চালিত হইতেছে এবং একটি অগ্নি-শিখাকেই তীব্রতর করিবার জন্য ইন্ধনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সমুদ্রতলে সাগরিকা সম্রাজ্ঞী হইতে অশোকবনে বন্দিনী সীতা, দুর্নিরীক্ষ্য যোগাসন-পর্বতের মদন-শরাহত প্রেমাতুর মহাদেব হইতে পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার সর্বরিক্ত বিলাপ, যুদ্ধ-প্রত্যাগত ভগ্নদূত মকরাক্ষের হতাশা এবং নিদ্রা

সমাপনান্তে ইন্দ্রজিতের মাতৃবন্দনা—সবই যেন এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের সহিত অচেতনভাবে যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রমীলা-চরিত্রের উপস্থাপনার দ্বারা মধুসূদন সেই অপরিহার্য কেন্দ্র ঘটনাটির প্রতি মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন মাত্র, ইহাই তৃতীয় সর্গের মূখ্য সার্থকতা।

তৃতীয় সর্গে মধুসূদন প্রমীলা-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বিশেষ উদ্দেশ্য কেবল মূল কাহিনীর শাখা-কাহিনী রচনাই নহে, তাঁহার সর্বগুণোপেত নায়কের জন্য আদর্শ নায়িকা সৃষ্টিও বটে। "দীপ্ত ক্ষাত্রশৌর্যের প্রতিমূর্তি, প্রেমে মধুর, ভক্তিতে নম্র, কর্তব্যে দৃঢ়, আচরণে অপ্রগল্ভ, সংগ্রামে ন্যায়নিষ্ঠ, মরণে বরণীয়, তরুণ প্রাণ ধর্মের ভাস্বর বিগ্রহ" ইন্দ্রজিতের উপযুক্ত নায়িকা সৃষ্টির স্বপ্ন মহাকাব্যের কবি সার্থক করিবার দুর্বলতা পোষণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। কোনো পাশ্চাত্য মহাকাব্যেও শক্তিশালী, উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত কোনো চরিত্র একক বা, নিঃসঙ্গভাবে চিত্রিত হয় নাই। স্বামী-স্ত্রী প্রেমিক-প্রেমিকার মিলিত স্বরূপেই জীবনের পূর্ণতা, আদিম মানবের এই সংস্কারগত বিশ্বাসই মহাকাব্যে এই জাতীয় যৌথ চরিত্রসৃষ্টির পরিকল্পনায় নিহিত। হোমারের সহিত এণ্ড্রোমেকি, ইউলিসিসের সহিত পেনেলোপের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বাদ দিলে চরিত্রগুলি যেন ভারশূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি দেবদেবীর ক্ষেত্রেও সেইরূপ যুগ্ম চরিত্রের আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। স্পার্টা সুন্দরী হেলেনকে হরণ করিবার ফলে সমগ্র গ্রীসের পৌরুষ আহত হইয়াছিল, ইহাই দশ বৎসরের দীর্ঘ মৃত্যুপণ ট্রয়যুদ্ধের কারণ। সীতাকে হরণ করিয়া দাম্পত্য সম্পর্কের যে শাশ্বত ন্যায় ও বিধিনির্দিষ্ট সত্যকে রাবণ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ও তাঁহার সহিত সমগ্র স্বর্ণলঙ্কার পতনকে অনিবার্য করিয়া তুলিল, স্বয়ং বিশ্বনাথের পক্ষেও অপ্রতিবিধেয় এক ভয়ংকর প্রাক্তনের গতিকে আসন্ন বজ্রের মত ঘনাইয়া তুলিল, ইহা নিতান্তই দুর্ঘটনা নহে। সুতরাং মধুসূদনের কবিকল্পনায় পাশ্চাত্য মহাকাব্যের এই নরনারী-গ্রথিত যৌথ জীবনের যে আদর্শ ছিল সেই আদর্শই তাঁহাকে ইন্দ্রজিতের উপযুক্ত একটি নায়িকা চরিত্র-প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং বিশ্বসাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত করিয়াছে। প্রমীলা-চরিত্র-প্রধান তৃতীয় সর্গের সার্থকতা ইহার উপরও নির্ভরশীল।

প্রমীলা-চরিত্রটি মধুসূদনের নিজস্ব কবি প্রতিভার প্রসূতি, বাল্মীকি বা

কৃত্তিবাস এরূপ একটি চরিত্রের কোনো সম্ভাবনা বা ইঙ্গিত দান করেন নাই। মধুসূদন প্রমীলাকে মেঘনাদের উপযুক্ত সহধর্মিণী রূপে রচনা করিয়াছেন। প্রমীলা অমিত শক্তিধর মেঘনাদের জলদর্চিরেখা, প্রমীলার পটভূমিকায় মেঘনাদের বীর্য আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের গভীর প্রেরণায়, প্রিয়তমের নিকট আত্মসমর্পণের দুর্নিবার আবেগে, প্রিয়মিলনের দুরন্ত বাসনায় প্রমীলা নারীত্বের সকল সংস্কার লজ্জা ও সংকোচ বিসর্জন দিয়া যেভাবে রণরঙ্গিণী বেশে বিপক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়া অভিযান করিয়াছেন, তাহা পদাবলীর রাধার নিদারুণ দুঃখাশ্রিত পথকষ্ট ও বিপদসঙ্কুল বিঘ্ন-সমাকীর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়া অভিসার-যাত্রারই এক অতি আধুনিকতম সংস্করণ। প্রমীলার এই অনমনীয় দুঃসাহসিকা প্রগল্‌ভ মূর্তিটির জন্য তাঁহার কোনো পূর্বার্জিত ক্ষাত্রবংশীয় অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় নাই, কেবল অন্তঃসলিলা প্রেমের প্রবল বেগবতী প্রেরণাই এই প্রকার তেজস্বিতার পশ্চাদ্বর্তী হেতু বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। বড়বা নাম্নী গতিসম্পন্না ঘোটকীর উপর দিয়া মৃদুমন্দ চরণে যখন এই বীরাঙ্গনা রমণী শত্রুসৈন্য-ব্যূহ ভেদ করিয়া দর্পিত ভঙ্গিতে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তখন অন্তরীক্ষে কেবল কামদেবতা মদন পুষ্পশর নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, প্রমীলার এই সাহস-বিস্তৃত অভিযানের অন্তর্নিহিত মিলনোৎকণ্ঠা ও প্রেমের মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাই সশস্ত্র নারী-সেনাবাহিনী, যাহারা গদা অসি মল্ল প্রভৃতি যে-কোনো যুদ্ধেই অংশ-গ্রহণে পটীয়সী, প্রমীলার সহচরী হইলেও প্রমীলা তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। স্বামীর শত্রুর সহিত অকারণ বৈরিতা না করিয়া কেবল পুরীতে অনুপ্রবেশের ও স্বামীর সহিত মিলনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন এবং উদ্দেশ্য সার্থক হইবার পর অবিলম্বে যোদ্ধসাজ পরিত্যাগপূর্বক রমণীর প্রত্যাশিত বেশবাস পরিধান করিয়া স্বামীর প্রেমঘন সান্নিধ্য উপভোগ করিয়াছেন। প্রমীলার প্রেম সম্মুখপানে চলিতে এবং চালাইতে জানে বলিয়াই পথের ধারে বিলাসের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করে নাই। তিনি কুসুমদাম-সজ্জিত প্রমোদ-কাননের অবকাশমাধুর্যে মুগ্ধ থাকিলেও আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছেন। এই জন্যই পুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মত খরশান অসি ও কিরীট, স্বর্ণ-সারসন ও দীর্ঘ শূল ধারণ করিতে তাঁহার দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। কারণ পর্বতাবরোধ হইতে সিন্ধুর সমুদ্রাভিযানকে বাধা দিতে

পারে, এমন শক্তি কাহারও নাই, এই বিশ্বাসই তাঁহার নারীত্বের মূল অলংকার।

অথচ সত্যই কি প্রমীলা তাঁহার ভাগ্যকে জয় করিতে পারিয়াছিলেন? যে প্রসারিত বিধির করাল বাহু দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বল স্বর্ণলঙ্কার উপর মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া প্রসারিত করিতেছে, সেই মৃত্যু হইতে কাহারও উদ্ধার নাই, ইন্দ্রজিতের যেমন নাই, প্রমীলারও নাই। এমন যে বীরাঙ্গনা নারী, প্রেমের অক্ষুণ্ণ দুঃসাহসে নির্ভীক, মিলনের তীব্র আগ্রহে, বিঘ্নবিপদে স্বামীর সান্নিধ্য লাভের জন্য সামান্য পদাতিক নারীসৈন্য সম্বল করিয়াও বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইতে যাহার শঙ্কা নাই, সেই অপরূপ প্রেমিকা নারীকেও বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের সাহত চিতাশয্যায় শয়ন করিতে হইয়াছে। "পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী, নিজ ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী" প্রমীলার এই নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিমূল যে কখন ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছে, প্রমীলা তাহা জানিতে পারেন নাই। তাই অতর্কিত আঘাতে তাঁহার গর্বোন্নত নারীজীবন ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। সতী নারীর সম্ভাবিত পরিণামই তাঁহাকে বরণ করিতে হইয়াছে। কাব্যের প্রথম সর্গে বারুণী-প্রেরিত দূতী মুরলাকে লঙ্কার কুললক্ষ্মী লঙ্কা-ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, চলোর্মি-আঘাতে বেলাভূমির মত দিনদিন রাবণ হীনবীর্য হইতেছেন। তাঁহার হৃদয় দিবানিশি প্রমদা-কুল-রোদন শুনিয়া বিদীর্ণ হইতেছে, 'প্রতি গৃহে কাঁদে পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা সতী।' রাবণের কর্মফলেই বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা। সেই এক পুত্রহীনা মাতা চিত্রাঙ্গদা, আর এক পতিহীনা সতীর ইঙ্গিতের জন্যই প্রমীলা-চরিত্রের উপস্থাপনা। প্রমীলার মত পুত্রবধূকে আপনার হাতে মৃতপুত্রের সহিত সহমরণের স্বর্ণরথে তুলিয়া রাবণ দুর্ভাগ্যের শেষ ঘটটি পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাই প্রমীলা-চরিত্রের সার্থকতা।

প্রমীলা-চরিত্র

/ কাব্য-প্রয়োজনে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে একাধিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রমীলাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ চরিত্র। ইহার পরিকল্পনায় মধুসূদনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকল্পনা, অসাধারণ সৃজনীশক্তি, সংযত পরিণামবোধ, মহাকাব্যিক দায়িত্ব ও গভীর অধ্যয়নশীলতা নিহিত আছে। আজ পর্যন্ত

মধুসূদনের একাধিক সমালোচক প্রমীলা-চরিত্রের পশ্চাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য কাব্যকবিতার বহু অনুরূপ চরিত্রের প্রেরণা সন্ধান করিয়াছেন এবং প্রমীলা-চরিত্র-নির্মাণে মধুসূদনের অধমর্ণতার ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা অস্বীকার্য নহে, বৈদেশিক ভাষার সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলিতে এই জাতীয় নারীর আদর্শ আছে এবং মধুসূদনের সুঅধীতী মনন তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র স্তূপীকৃত উপাদান সংগ্রহের দ্বারাই একটি চরিত্র গড়িয়া উঠে না। আকরিক ধাতুর বিশৃঙ্খল সমাবেশই কোনো ধাতব পদার্থ নির্মাণ করিতে পারে না—ইহার সহিত যে প্রচণ্ড উত্তাপের প্রয়োজন হয় তাহাই কেবল ঐ সকল খনিজ পদার্থের বিগলিত রূপ হইতে আবর্জনা বর্জন করিয়া মনোগত আদর্শানুযায়ী নূতন বস্তু নির্মাণ করিতে পারে। প্রমীলা-চরিত্র-কল্পনায় মধুসূদন যে সংগতিবোধ ও সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় দিয়াছেন, মহাকাব্যের প্রয়োজনের সহিত তাহার সন্নিবেশ ঘটাইয়াছেন, তাহাই প্রমীলা-চরিত্রের মৌলিকতার একমাত্র পরিচয় হইয়া উঠিয়াছে, অন্যান্য উপকরণ বহিঃসাদৃশ্যে পরিণত মাত্র। প্রমীলা-চরিত্রে দুইটি বিরোধী ধর্মের সমাবেশ হইয়াছে—প্রণয় ও বীর্য, নারীর কমনীয় মাধুর্য ও ইহার সহিত বলিষ্ঠ পৌরুষ। নারীর পূর্ণতা যেন এই দুই বিরোধী গুণের মিশ্রণেই ঘটিয়া থাকে বলিয়া মধুসূদন বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকাগণ সকলেই বীরাঙ্গনা, কিন্তু সকলেই প্রণয়ভিখারিণী। প্রমীলাকে আমরা প্রথম দেখি প্রথম সর্গে, প্রমোদোদ্যানে স্বামী মেঘনাদের সহিত আবেশ-বিহ্বল প্রেমের মুগ্ধ আবেষ্টনে। সেই প্রমোদনিবাস 'বৈজয়ন্তধাম-সম-পুরী', তাহার অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী, চারিদিকে নন্দনকাননতুল্য রম্য বনরাজি; কোকিল-কূজিত পুষ্পশোভিত সেই কাননে যেমন নিত্য বসন্তের অবস্থান, তেমনি তাহা নিত্য-যৌবন-শোভিত। সেখানে অস্ত্রধারিণী যে সকল ভীমারূপী বামাবৃন্দ প্রহরায় নিযুক্ত তাহাদের বাহুধৃত তীক্ষ্ণ শরাপেক্ষা আয়ত দৃষ্টির কটাক্ষ তীক্ষ্ণতর। সেই মধুর যৌবনমদে-মত্তা বামাবৃন্দের শ্রীঅঙ্গের কাঞ্চী-বলয়-নূপুরের সহিত বীণা-মুরজ-মুরলীর সংগীতধ্বনি মিশিয়া গিয়াছে। এমনই প্রমোদকুঞ্জে প্রমীলা তাঁহার পতির সহিত বিহার করিতেছেন, নক্ষত্র যেমন চন্দ্রের সহিত, ব্রজগোপিনীর সহিত যেমন ব্রজেশ্বর। কুসুমদাম ও কনক-বলয়ের দ্বারা প্রমীলা সেখানে স্বামীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন নিবিড় প্রেমে, হেমলতার ন্যায় অটবীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সে বন্ধন ছিঁড়িয়া

শত্রুনিধনে নির্গত মেঘনাদকে কাতর কণ্ঠে তিনি মিনতি করেন, "কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে এ অভাগী"? কিন্তু ইন্দ্রজিৎ জানেন, এ প্রস্থান সাময়িক। ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদকে যে বন্ধনে প্রমীলা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, সে বন্ধন ছিন্ন করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রজিতেরও নাই।

কিন্তু এই সাময়িক বিচ্ছেদও প্রমীলার নিকট দুঃসহ বোধ হইল, তৃতীয় সর্গে তাঁহার বিরহকাতর ম্লান মূর্তিটির সহিত পুনরায় পাঠকদের পরিচয় ঘটিল। তখন সন্ধ্যা অবসিত হইয়াছে, ইন্দ্রজিতের বিদায়-গ্রহণের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় নাই (দিননাথ যখন অস্তাচলগামী তখনই মেঘনাদ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন), কিন্তু অজ্ঞাত আশঙ্কায় প্রমীলা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই প্রিয়বিরহিত অশ্রুনয়না মূর্তিটি শূন্যনীড়ের কপোতবধূ এবং বৃন্দাবনের বিরহিণী রাধিকার সহিত সার্থকভাবে উপমিত হইয়াছে। প্রমীলার সহিত সহমর্মিতায় প্রমোদকাননের সংগীত-মূর্ছনা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, সখীবৃন্দের কলোচ্ছ্বাসও নীরব হইয়া পড়িয়াছে। বাসন্তী সখীর সান্ত্বনাবাক্যে প্রমীলার আশঙ্কাদোদুল হৃদয় প্রশমিত হয় নাই, সন্ধ্যাকাননের পুষ্পচয়ন ও মাল্যগ্রন্থন করিতে বসিয়া প্রমীলা তাহাদের উপর অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। আর তখনই প্রমোদগৃহ ত্যাগ করিয়া লঙ্কাপুরে স্বামীর সহিত মিলনের পরিকল্পনা জাগিয়াছে, বাসন্তীর আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া প্রমীলা তাঁহার নূতন অভিযানের সাজসজ্জায় প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত শত নারীসৈন্য অলংকার ও অস্ত্রে সুসজ্জিতা হইয়াছে, যৌবন ও বীর্যে চতুর্দিক চমকিত করিয়া প্রমীলা তাঁহার নারী সৈন্যসহ লঙ্কাপুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। লঙ্কাপুরে বন্দী ইন্দ্রজিৎকে অবরোধমুক্ত করিবার অভিযানে প্রমীলার নেতৃত্বে দানব-কুল-সম্ভবাগণ মধুকালে মত্ত মাতঙ্গিনীর মত হুংকার করিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পদভারে কনকলঙ্কা কাঁপিয়া উঠিয়াছে। রামচন্দ্র-পক্ষের বীরবৃন্দের কাছে এ দৃশ্য অভিনব, স্বয়ং রামচন্দ্র ইহাকে রাবণের কোনো ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। বলীন্দ্র পবন-নন্দন হনুমান লঙ্কাপুরীতে কোনো পুরহর্ম্যে এরূপ নারী মূর্তি কখনও দেখে নাই বলিয়া বিস্ময় অনুভব করিয়াছে। যে মেঘের পাশে এরূপ সৌদামিনী প্রেমপাশে নিত্যবন্দী, সেই মেঘরূপী মেঘনাদের সৌভাগ্যকে হনুমান প্রশংসা করিয়াছে।

লঙ্কাদ্বারে উপনীত হইয়া রামচন্দ্রের শিবির-সম্মুখে প্রমীলাকে দিয়া

মধুসূদন উত্তেজিত রণগর্জন ও যুদ্ধাহ্বান প্রকাশ করান নাই, সবিনয়ে ধীরকণ্ঠে কেবল আপন আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করাইয়াছেন। ইহার ফলে রামচন্দ্র-চরিত্রটিও বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে—প্রমীলার উদ্দেশ্যের কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সশ্রদ্ধভাবে নারীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া প্রমীলাকে নারীবাহিনীসহ লঙ্কাপুরে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন। কুলবালা কুলবধূ রণসাজে রণভূমে আগমন করিলেও অকারণে শত্রুতাচরণ করা তাঁহার মানবধর্মের বিরোধী বলিয়া আপনার সকল বিনয় ও দৈন্য স্বীকার করিয়াই রামচন্দ্র বিনাযুদ্ধে প্রমীলার নিকট পরিহার প্রার্থনা করিয়াছেন। এইভাবে প্রমীলা আপন প্রেমের গৌরবে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, বিজয়িনীর মত স্বামীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া অনির্বাণ বিরহাগ্নির প্রশমন লাভ করিয়াছেন। অবিলম্বে তিনি যোদ্ধবেশ পরিবর্জন করিয়া নারীর স্বভাবসংগত বেশভূষা পরিধান করিয়াছেন। ✓

এই সর্গের শেষাংশে মধুসূদন প্রমীলার এই তেজোদৃপ্ত গৌরবাভিযান এবং বৈদ্যুতিক বীর্যশালিতার একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নারী-সেনাবাহিনীসহ প্রমীলার এই বলদর্পিত অভিযাত্রা দর্শনে স্বর্গলোকবাসিনী পার্বতী বলিয়াছেন, প্রমীলা তাঁহারই অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আগামী কল্য লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য প্রমীলার তেজোহরণ করা প্রয়োজন। তারপর পতিসহ প্রমীলা স্বর্গধামে আগমন করিলে ইন্দ্রজিৎ শিবের উপাসনা করিবেন এবং প্রমীলা স্বয়ং ভগবতীর সখীদলভুক্তা হইবেন। কিন্তু প্রমীলা-চরিত্রের এই স্বর্গীয় পরিণাম পৌরাণিক কাব্যের বিষয়বস্তুর উপযোগী হইলেও ইহা গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছে, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা-চরিত্র সম্পর্কে এই তত্ত্বের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই কাব্যে প্রমীলা নারী হিসাবে দৃষ্টান্তরহিত মনে হইলেও তাঁহার অনন্যসদৃশতার অন্তরালে প্রেমের যে বলিষ্ঠ আকুতি, নারীত্বের যে গভীর প্রকাশ আছে, তাহাই এই চরিত্রের বাস্তবতা। মহাশক্তির অংশরূপে ব্যাখ্যা করিলেই প্রমীলা-চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠে না।

প্রেমই প্রমীলা-চরিত্রের প্রধানতম উপাদান, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রমীলাকে কবি প্রেমময়ীরূপে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সকল বীরত্ব, সাহসিক কার্যপ্রণালী, রণরঙ্গিণী অভিযাত্রা ঐ প্রেমের বলিষ্ঠ প্রকাশেরই অঙ্গমাত্র। প্রেমের বীর্যেই প্রমীলা অশঙ্কিনী হইয়া উঠিয়াছেন।

কুসুমভূষিত প্রমোদকাননে প্রমীলা স্বামীকে কঠিন প্রেমশৃঙ্খলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষণিকের বিরহও তাঁহার নিকট দুঃসহ বোধ হইয়াছিল। তথাপি এই প্রেমনিগড় ছিন্ন করিয়া কর্তব্যপালনের আহ্বানে মেঘনাদ যখন লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন তখন বিরহার্তা প্রমীলা সহসা এমন এক দুর্জয় সাহসের অধিকারিণী হইয়াছেন যে, তাহার প্রকোপে তিনি স্বয়ং বীরাঙ্গনা-বেশে লঙ্কাভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বস্ত সাধ্বীত্ব ও ললিত-যৌবন এই প্রগল্‌ভ অভিসারে দুর্জয় গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে। রাধিকার অভিসারে পথের বিঘ্নসঙ্কুল দুর্যোগ ও ভয়ংকর প্রতিবন্ধকতা যেমন তাহার অনমনীয় প্রেমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, প্রমীলার তেজস্বী অভিযানের নিকটও সেইরূপ শত্রুসৈন্য-ব্যূহ দুই পার্শ্বে সরিয়া গিয়া প্রমীলাকে পথ করিয়া দিয়াছে। শূন্যলোক হইতে কুসুমেষু মদন তাঁহার ধনুঃশর লইয়া এই প্রেমপাগলিনীর স্বামীমিলনোৎকণ্ঠাকে পুষ্পবাণের দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—রাক্ষসবংশের প্রতি দেবসমাজের সামগ্রিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যথার্থ প্রেমের জন্য উন্মত্ত অভিসার মদনের নিকট উপেক্ষিত হয় নাই। এই প্রেম পাশ্চাত্য মহাকাব্যের নিষিদ্ধ প্রণয় নহে, ইহা ভারতীয় দাম্পত্য প্রেমই —স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা ও ঋজুতাই ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য স্বামীর জন্য স্ত্রীর এই প্রমত্ত স্বেচ্ছাভিসার ভারতীয় সাহিত্যে কোনো পূর্বসমর্থন লাভ করে নাই, ইহার প্রকাশরীতিটি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতেই লব্ধ এবং স্বাধীন প্রেমের এই বাধাবন্ধনতুচ্ছকারী গতিটি ভারতীয় সাহিত্যে অভিনব। কিন্তু সব মিলিয়া প্রমীলা তাঁহার স্বদেশীয় চরিত্র ও সংস্কারকে মুহূর্তমাত্র বিচলিত করেন নাই। তাঁহার লঙ্কা-অভিযানের সংকল্পের পশ্চাতে আছে কেবল বিরহাবসানের প্রতিজ্ঞা। তাঁহার রণসজ্জাধারণের ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের জন্যও কোনো অতীত শিক্ষা বা ক্ষাত্রানুশীলনের প্রয়োজন হয় নাই। কেবল নবোদ্‌ভূত প্রণয়াবেগ ও স্বামীসান্নিধ্যই ইহার মূল প্রেরণারূপে অনুভূত হইয়াছে। রাবণ যাঁহার শ্বশুর এবং মেঘনাদ যাঁহার স্বামী তাঁহার পক্ষে কোনো 'ভিখারী রাঘবের' নিকট সন্ত্রাসের বিহ্বলতা আপনাকেই অপমান করা মাত্র—ইহাই প্রমীলার মনে হইয়াছে। এইজন্য নারীবাহিনীসহ রণযাত্রার পূর্বে প্রমীলার শত্রুপক্ষ নিষ্পেষিত করার আস্ফালন সত্ত্বেও রামচন্দ্রের শিবিরসম্মুখে তাঁহার অকারণ বৈরিতার প্রয়োজন অন্তর্হিত হইয়াছে। অবলা কুলবধূ স্বামীর শত্রুর প্রতি

কোনোরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না, কেবল স্বামীদর্শন লালসাই তাঁহার আগমনের কারণ—এইরূপ স্বীকৃতির দ্বারা প্রমীলা রামচন্দ্রের হৃদয় পর্যন্ত শ্রদ্ধায় হরণ করিয়া লইয়াছেন। লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর চরণপ্রান্তে পড়িয়া প্রমীলা তাঁহার সাময়িক যুদ্ধসজ্জা অবিলম্বে পরিহার করিয়াছেন এবং গৃহস্থবধূর চিরায়ত বসনভূষণ অলংকার পরিধান করিয়া ইন্দ্রজিতের পার্শ্বে মঙ্গলময়ী পুরস্ত্রীর ন্যায় শোভা পাইয়াছেন। এই কাব্যে পরবর্তী সর্গে প্রমীলার যে চিত্র পুনরায় পাঠকের চোখে পড়িবে, সেখানে প্রমীলার এই কুললক্ষ্মী প্রেমময়ী রূপটিকে আরও গভীরভাবে অনুভব করা যাইবে।

অবশ্য প্রমীলার এই গার্হস্থ্য সংস্কার, পুরশ্রীবিবর্ধন মূর্তি, মধুসূদনের পরিকল্পনার অঙ্গ হইলেও প্রমীলার এই যোদ্ধবেশধারণ কিছুটা অতিরঞ্জন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবলা গৃহবধূ প্রেমের তীব্রতম শক্তিতে কেবল অশ্বপৃষ্ঠেই আরোহণ করেন নাই, বড়বা নাম্নী সর্বশ্রেষ্ঠ গতিসম্পন্ন ঘোটকীটি তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রমীলার প্রমোদকাননের প্রহরারত নারীসেনাদল সকলেই যুদ্ধ-নিপুণা, তাহাদের ললিতলবঙ্গলতা তনুর সহিত নিপুণ যোদ্ধার রণসাজ প্রমীলার নির্দেশেই হয়ত অর্পিত হইয়াছে, কারণ অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় প্রমোদোদ্যানটি ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার বিহারস্থল হইলেও ইহা প্রমীলারই সাম্রাজ্য—নারীই এই সাম্রাজ্যের প্রজা এবং প্রমীলাই তাহাদের অধীশ্বরী (কাশীরাম দাসের কাব্যে অর্জুনের নারীবেষ্টিত প্রমীলা-রাজ্যের চিত্র কবিকে অভিভূত করিয়াছিল নিশ্চয়)। প্রমীলার আহ্বানে একশত চেড়ী অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহারা অসিযুদ্ধ গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ বাণযুদ্ধ—সকল প্রকার যুদ্ধেই যে পারদর্শিনী তাহাও নির্ভীককণ্ঠে রামচন্দ্রের সম্মুখে ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রমীলা প্রবীণ অভিজ্ঞতার সহিত তাহাদের নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাহাদিগকে রণযাত্রার নির্দেশ দিয়াছেন, শত্রুশিবিরে উপনীত হইয়া নিপুণ সেনাপতির মত নৃমুণ্ডমালিনীকে রামচন্দ্রের নিকট দৌত্যকার্যে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রমীলার এই সকল আচরণ কেবল মাত্র প্রণয়ের অন্তর্নিহিত ও আকস্মিক প্রেরণায় সম্ভব নহে। প্রেম মূককে বাচাল বা পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনে শক্তিদান করিতে পারে, কিন্তু কুলবধূকে যুদ্ধের কঠিন নিয়মকানুন ও সৈন্য পরিচালনার রীতি শিক্ষা দিতে পারে কিনা সন্দেহের বিষয়। প্রমীলার এই আকস্মিক সংগ্রামবিলাসের কারণস্বরূপ প্রমীলা তাঁহার সহচরীদের নিকট দানব-কুলসম্পন্ন হইবার বংশগত অভিজ্ঞতার

কথা বলিয়াছেন। দানবকুলের বিধি সমরে শত্রুসূদন করা অথবা শত্রু-শোণিতে নিমজ্জিত হওয়া—দানবকুলললনারও ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা, ইহাই প্রমীলার বক্তব্য। যাহাদের অধরে মধুভাণ্ড আছে তাহারাই লোচনে গরল ধারণ করিতে পারে, এই যুক্তিতে যৌবন-পরিবেষ্টিত রমণী একাকিনী রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ প্রার্থনা করিবে, ইহা প্রত্যাশিত নহে। এইখানে মধুসূদন যেন উৎসাহের আতিশয্যে কিছুটা অতিরঞ্জিত কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তবে অবিলম্বে তাহা সংশোধন করিয়া স্বর্ণলঙ্কায় প্রবেশের পরই প্রমীলার বর্ম-অসি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে প্রেমময়ী নারীর শোভন বস্ত্রালংকারে মণ্ডিত করিয়াছেন।১

রামচন্দ্র-চরিত্র

রাবণ-চরিত্র মধুসূদনের কবি কল্পনাকে উদ্‌বেজিত করিয়াছিল বলিয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ-চরিত্র সম্পর্কে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্কার মধুসূদনকে সাময়িকভাবে বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে তৎকালীন হিন্দু-সংস্কার আহত হইয়াছিল, স্বধর্ম সম্বন্ধে স্পর্শকাতর পাঠক স্বাভাবিকভাবেই পীড়া অনুভব করিয়াছিলেন। মধুসূদনের ব্যক্তিগত ধর্মান্তরগ্রহণ এই ব্যাপারটিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল ইহাও সত্য। সৌভাগ্যবশত বিশুদ্ধ কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই কাব্যবিচার করিবার শিক্ষা আধুনিক যুগের হইয়াছে, তাই কোনো প্রচলিত ধর্মসংস্কারের দ্বারা বশীভূত না হইয়াই আমরা মানবিক দৃষ্টিতে মধুসূদনের কাব্যবিচার করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন এই, রামচন্দ্র-চরিত্রের প্রতি মধুসূদন কি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন? মধুসূদনের চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য পাঠকবর্গের পরিচিত। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"কবি রাক্ষসপরিজনগণের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিবশত ইহাতে রামচন্দ্রের চরিত্রের হীনতা সাধন করিয়াছেন।"

স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের এই অভিমত পরবর্তী একাধিক সমালোচকের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে এবং রাম-চরিত্রের হীনতা-সাধনকেই মধুসূদনের কাব্য-পরিকল্পনায় প্রধানতম ত্রুটি বলিয়া নির্দেশিত করা হইয়াছে। এমন কি, এ যুগের অপেক্ষাকৃত স্থিতধী প্রবীণ রসবেত্তা কবি-সমালোচক মোহিতলাল

মজুমদারও রাম-চরিত্রের এই হীনতাকে অস্বীকার করেন নাই, ইহাকে বাঙালী চরিত্রের অন্যতম লক্ষণরূপে নির্দেশ করিলেও মধুসূদনের রাম যে খর্বব্যক্তিত্বের উদাহরণ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"রামের কাপুরুষতার চিত্র আঁকিতে কবিও বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে একরূপ বিনা যুদ্ধে বিনা ক্লেশে হত্যা করিবার সকল সুবিধা লাভ করিয়াছেন—একালের রাজা জমিদারেরা যেমন, অনেক ক্ষেত্রে, সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত হইয়া হস্তী-ব্যাঘ্র শিকারের আমোদ উপভোগ করিতে যান—লক্ষ্মণ তাহা অপেক্ষাও নির্বিঘ্ন হইয়া মেঘনাদবধ করিতে চলিয়াছেন; তথাপি রামের ভয় আর ঘোচে না, নারী অপেক্ষাও ভয়ভূতগ্রস্ত হইয়া রাম বলিতে থাকেন

…নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে।…
চল ফিরি পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আসিনু আমরা।

—ইহাও কি বাঙালী কবির আত্মলাঞ্ছনা? বাঙালী-চরিত্রের এই সাধারণ দুর্বলতাকেই কবি রাম-চরিত্রের উপাদান করিয়া তাহাকে এক নূতন মহিমা দান করিয়াছেন। সেখানে এই দুর্বলতাই মানুষের মনুষ্যত্বের নিদান; ইহা তাহার পৌরুষকে ব্যর্থ করিলেও সেই পৌরুষের অন্তরায় নয়—মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তম সর্গে কবি তাহাই দেখাইয়াছেন।"

মনে হয় রাম-চরিত্র সম্পর্কে এতাবৎকাল সমালোচকগণ যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং কবি মধুসূদনেরই স্বীকৃতি অনুসারে ঘটিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার পত্রগুচ্ছে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, I despise Rama and his rabble, ইহাই তাঁহার কাব্যে রাম-চরিত্রাঙ্কনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার কাব্যে চরিত্রটির অবনতি কতদূর ঘটিয়াছে তাহা সতর্কভাবে দেখিতে হইবে।

রামচন্দ্রের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠকদের প্রথম পরিচয় ঘটে দ্বিতীয় সর্গে। মায়াদেবীর নিকট হইতে লব্ধ দৈবাস্ত্র লইয়া যখন ইন্দ্রদূত চিত্ররথ রামচন্দ্রকে প্রদান করিতে আসিয়াছেন, তখনই কবি রামচন্দ্রকে একজন সাধারণ মানবরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। দেবদূতের প্রতি তাঁহার ভক্তিনম্র বিনয় ও দৈবানুগ্রহ লাভে মুগ্ধ আনন্দ তাঁহার চরিত্রের সাধারণত্বেরই

পরিচায়ক। আপনার ভাগ্যাহত দৈন্য ও দারিদ্র্য বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে এই বিনয় অশোভন হয় নাই। স্বর্ণাসনের অভাবে কুশাসনে দেবদূতের উপবেশন স্থান নির্দেশ করার কুণ্ঠাকে চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও পৌরুষহীনতা বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনো কারণ নাই। দেবতার সহিত সংগ্রাম ও দেবতাকে পরাজিত করিবার যে ঐতিহ্য রাক্ষসবংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাহা সাধারণ মনুষ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নহে,—মধুসূদন ইহা ভুলিয়া যান নাই। একথা সত্য, বাল্মীকি রামায়ণের রাম-চরিত্রের সংস্কার মধুসূদন গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কৃত্তিবাসও বাল্মীকির রামকে ক্ষাত্রতেজ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া স্নেহদুর্বল ও ভক্তবৎসল করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং রাম-চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদন চরিত্রের প্রতি কোনো গোপন বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া চরিত্রটিকে নিজস্ব প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুযায়ীই গড়িয়া তুলিয়াছেন। এইজন্য ইন্দ্রদূত চিত্ররথ রামচন্দ্রকে যে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক মনুষ্যধর্মের অনুকূল—দরিদ্র-পালন ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্মপথে গতি, নিত্যসত্যদেবীসেবা এইগুলি পালন করিলেই যথার্থ দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হইবে, ইহাই রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার শিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে আর্ষ রামায়ণে যেখানে রামচন্দ্র স্বয়ং দেবতার অবতার সেখানে মধুসূদনে দেবতা ও মনুষ্যজন্মগ্রহী রামচন্দ্রের মধ্যে একটি ব্যবধান রচিত হইয়াছে। মধুসূদন রামচন্দ্রকে পৌরুষহীন করিয়া চিত্রিত করেন নাই, তিনি রামচন্দ্রকে দেবত্বহীন করিয়াছেন মাত্র। বাল্মীকি রাক্ষসবংশের প্রতি অহেতুক হীনতা আরোপ করিয়াছিলেন। মধুসূদন সেই হীনতা হইতে রাক্ষসবংশকে যেমন উদ্ধার করিয়াছেন, তেমনি রাম-চরিত্রের দেবদুর্লভ মহিমা হইতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া সাধারণ মানুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এইভাবে তিনি রাবণ ও রামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে কাব্যিক ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছেন মাত্র—ইহার সহিত ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের কোনো সম্বন্ধ নাই।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলা-চরিত্রের পার্শ্বে রামচন্দ্রের এই সাধারণত্বই তাঁহার পৌরুষহীনতার প্রমাণরূপে ভ্রান্তি উৎপাদন করে। তীব্র বিদ্যুতালোকে স্থিরজ্যোতি নক্ষত্রও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সুতরাং প্রমীলা-চরিত্রের অসামান্য জ্যোতির্ময় প্রেমবীর্য ও তেজস্বিতার নিকট রামচন্দ্র যে ম্লান বলিয়া গণ্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রমীলার বৈদ্যুতিক আকস্মিকতাকে

প্রত্যাহার করিয়া লইলে রাম-চরিত্রের প্রতি আমরা সুবিচার করিতে পারিব। রামচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যে আর এক দুর্ভাগ্যপীড়িত চরিত্র, যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে আসিয়া সীতাকে হারাইয়াছেন এবং সেই সীতা উদ্ধারের জন্য কঠিন সংকল্প লইয়া স্বর্ণলঙ্কা পর্যন্ত আসিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবে কোমলতা আছে, স্নেহবৎসলতা আছে, মমতা বিনয় শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে সকল গুণ পুরুষকে মণ্ডিত করে, তাহার কোনোটিরই অভাব নাই। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহার মহৎ সংকল্পে দেবসমাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, অগণিত গুণমুগ্ধের সাহায্য অযাচিতভাবে পাইয়াছেন। তথাপি তাঁহার চিত্ত সর্বদাই সংকুচিত, স্নেহে তিনি দুর্বল, কৃতজ্ঞতায় পূর্ণহৃদয়। ইহা কি পৌরুষহীনতা? ভাগ্যক্রমে তিনি রাজকুলেশ্বর হইয়াও ভিখারী, সুদূর সরযূতীরনিবাসী হইয়াও লঙ্কাপুরীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। নিতান্ত মন্দভাগ্য হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার প্রিয়তমা রাজনন্দিনী পত্নী সীতা আজ শত্রুপুরীতে বন্দিনী। সেই সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের অন্ত নাই। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অন্তরীক্ষে যে দেবকুলের মধ্যে গভীর পরামর্শ হইতেছে, ইহা তাঁহায় জানার কথা নহে বলিয়াই তাঁহার আশঙ্কা ঘুচিতে চাহে না। ইন্দ্রজিৎকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিবার সময় পিতা রাবণের হৃদয় যে স্নেহাতুর আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, রামচন্দ্রের আশঙ্কা তাহারই মত, কারণ তিনিও অদৃষ্টকে স্বীকার করেন। রাবণের তুলনায় তাঁহার অদৃষ্ট যে অনুকূল, একথা তাঁহার গোচরীভূত নহে, তাহা হইলে অদৃষ্টের সহায়তায় অন্তত তাঁহার চরিত্রে কৃত্রিম পৌরুষের আস্ফালন দেখা যাইত। দেবতা-প্রদত্ত অস্ত্রগুলিকে যথোচিত পূজার্ঘ্য নিবেদন করিয়া গ্রহণ করার মধ্যে কোনো হীনতা নাই, ইহা স্বাভাবিক শ্রদ্ধারই উদাহরণ। ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্তিতে তিনি যে বিস্মিত হইয়াছেন, ইহাও স্বাভাবিক, মহাবীর ইন্দ্রজিতের এরূপ যোগ্য সহধর্মিনীর প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাই নির্গত হইয়াছে। রাবণ-চরিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্রের চরিত্রের একটি স্পষ্ট পার্থক্য রচনা করাই ছিল মধুসূদনের মূল কল্পনা। রাবণ যতই পৌরুষ ও শক্তির অধিকারী হউন না কেন, রাবণের সকল সর্বনাশের মূল একটি মাত্র—তাহা হইল সীতাহরণ। এই সীতাহরণের পাপে রাবণের সহিত স্বর্ণলঙ্কাও নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে। আপন পরিবার, ভগ্নী শূর্পনখা, রাক্ষসবংশের

মর্যাদা ইত্যাদি রক্ষার জন্য রাবণ নারীহরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই সর্বনাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং অমানিতা মানবীর ক্রন্দনের অভিশাপ তাঁহাকে বহন করিতেই হইবে। কিন্তু ইহার সহিত তুলনায় রাম-চরিত্রকে মধুসূদন কত উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন তাহা বুঝা যায়, প্রমীলার সৈন্যবাহিনীর রণপ্রার্থনার উত্তরে তিনি কুলবধূ নারীর সহিত কোনো প্রকার বৈরিতার প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রাবণের প্রাসাদ-মধ্যবর্তী অশোকবনে সীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সকল চেড়ী নিযুক্ত ছিল, তাহারাও সীতার প্রতি কোনোরূপ করুণাপূর্ণ ব্যবহার করে নাই, পরন্তু ভীতিপ্রদর্শন ও কঠোর ব্যবহারে সীতাকে সর্বদা সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, সরমার নিকট সীতা এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীতে হনূমান হইতে সুরু করিয়া সাধারণ সৈন্যদল পর্যন্ত প্রমীলার নারী-সৈন্যদের প্রতি কোনোরূপ অসম্মান প্রদর্শন করে নাই। নারীত্বের প্রতি এইরূপ মর্যাদারক্ষার গৌরবই রামচন্দ্রকে সকল পৌরুষহীনতা হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছে, ইহা পূর্ববর্তী সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নামকরণ ঃ সমাগম

তৃতীয় সর্গের সমাগম নামকরণের ঘটনাগত অর্থ প্রমীলার লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ এবং স্বামী ইন্দ্রজিতের সহিত মিলন। প্রথম সর্গেই আমরা দেখিয়াছি, প্রমীলার সহিত ইন্দ্রজিৎ লঙ্কার বহির্দ্বারে অবস্থিত সুনির্মিত ও সুরক্ষিত প্রমোদকুঞ্জে প্রেমাবেশে ও কুসুমলীলায় রত রহিয়াছেন। ইহা ইন্দ্রজিতের চরিত্রের পক্ষে অশোভন হয় নাই। কারণ ইহার পূর্বেই তিনি রামচন্দ্রের সহিত পরাক্রান্ত সংগ্রাম সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছেন এবং নিশারণে প্রচণ্ড শর বর্ষণ করিয়া সীতাপতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ধারণা। তাহারই শ্রমবিরামের জন্য প্রমোদকাননে তিনি প্রিয়ালাপে নিরত ছিলেন। পুনরায় রামচন্দ্রের জীবনসংবাদ ও বীরবাহুর মৃত্যুবার্তা তাঁহার নিকট অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সঞ্চার করিয়া আনিল, ক্রুদ্ধ মহাবীর কুসুমদাম ও প্রণয়-কুণ্ডল ছিন্ন করিয়া সেই মুহূর্তে লঙ্কাধামে উপস্থিত হইলেন বীরবাহু-ঘাতককে চূড়ান্ত শাস্তি দানের জন্য। অপরাজেয় দুর্ধর্ষ বীর ইন্দ্রজিতের নিকট রামচন্দ্রের বিনাশ দুশ্চিন্তার বিষয় নহে, তাই অবিলম্বে শত্রুনিধন করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন, এই স্নেহসম্ভাষণ করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইন্দ্রজিতের এই আকস্মিক বিদায়ে প্রমোদকুঞ্জের বাঁশরীসংগীত ও বাদ্য মূর্ছনা স্তব্ধ হইয়া গেল, সখীদের কলোচ্ছ্বাস প্রমীলার অশ্রুকাতর ক্ষণবিরহিণী মূর্তিটিতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল, সন্ধ্যায় চয়িত পুষ্পমাল্য প্রিয়কণ্ঠে সার্থক হইবার পূর্বে শঙ্কিত বিরহিণীর গোপন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিল। তখনই সহসা এই বিরহ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাইবার জন্য প্রমীলা সংকল্প করিয়াছেন—প্রিয়তমের সহিত তাঁহার যে ভৌগোলিক দূরত্ব তাহা দূর করিবার উদ্যম দেখাইয়াছেন। প্রমোদোদ্যান রাজধানীর বাহিরে স্থাপিত, তথা হইতে লঙ্কায় প্রবেশ করিবার পক্ষে প্রধান বাধা রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী, যাহারা পুরী অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং সেই শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের জন্য সৈন্যবল ও বাহুবল প্রয়োজন। প্রমীলার নির্দেশে সর্বপ্রকার সংগ্রামভূষণে সুসজ্জিত হইয়া দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে একশত নারী প্রস্তুত হইল। এই অভিযান কুলবধূর পক্ষে দুঃসাহসিক তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু অন্তরে যদি প্রণয়ের স্রোতোবেগ দুর্দম হইয়া উঠে, তাহা সকল প্রকার প্রতিকূলতার উপল-বাধা চূর্ণ করিয়া শেষ পর্যন্ত প্রিয়তম-রূপ সাগরে মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইবেই। ইহাই প্রমীলা-চরিত্রের লক্ষণ, তাই শেষ পর্যন্ত এই প্রেমপ্রবাহিণীর অনিরুদ্ধ গতিবেগেই তিনি স্বামীর সহিত মিলনাভিযানে যাত্রা করিয়াছেন। এই অভিযান ও প্রিয়মিলনই সমাগম এই নামকরণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু সমাগম শব্দের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটি আরও গভীর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইন্দ্রজিৎ যে উদ্দেশ্যে লঙ্কাপুরীতে আসিয়াছেন এবং সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়, সেই অভিষেকই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যুঅভিষেকে পরিণত হইয়াছে। ইহা কাহারও নিকট পূর্বজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সকল ঘটনাই যেন এই একটি ঘটনার দিকে বিধিনির্দিষ্ট হইয়া ধাবিত হইয়াছে। এই আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় সকল ব্যাপারই গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। যে ক্ষণস্থায়ী বিরহ প্রমীলা কেন, যে-কোনো নারীর পক্ষেই অসহনীয় ছিল না, সেই বিরহ প্রমীলাকে স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য কেন প্ররোচিত করিবে? তাই কুলস্ত্রীর লজ্জাসংকোচ বিসর্জন দিয়া প্রেমিকা নারীকে রণসাজ পরিতে হইল, পুষ্পশয্যার বদলে বড়বা-ঘোটকীতে আরোহণ করিতে হইল। এই সাহসিকা অভিযাত্রায় স্বামীর সহিত মিলন ঘটিল বটে,

কিন্তু সে মিলন জীবনের শেষ সৌভাগ্য-রজনীর মিলন, ইহা পাঠকগণ কোনো মতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। প্রমীলার এই বীরাঙ্গনা মূর্তি দর্শন করিয়াই সে রাত্রে অন্তরীক্ষে মহাশক্তিরূপিণী ভগবতী পার্বতী শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, কারণ বায়ুর সহিত অগ্নিশিখা মিলিত হইলে পরদিবস ইন্দ্রজিৎ অপরাজেয় হইয়া উঠিবেন। এই আশঙ্কার কথা যেন ইতিপূর্বে দুর্গার মনে উদিত হয় নাই—তাই পরদিবস তিনি প্রমীলার তেজ হরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। রবিচ্ছবি-কর-স্পর্শে উজ্জ্বল মণি দিবাবসানে যেরূপ আভাহীন হয়, সেইরূপ প্রমীলার নিস্তেজীকরণের দ্বারাই ইন্দ্রজিৎ-নিধনের সর্বশেষ বাধাটুকু অপসারিত করার ব্যবস্থা হইল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত প্রেমের দৃপ্ত প্রভায়, অনুরাগের দুর্মর প্রভাব প্রমীলার স্বামী-সমাগম ঘটিলেও সে সমাগম এক আসন্ন চিতারোহণের ভয়ংকর পরিণামের দিকে করুণভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। নির্বাণের পূর্বে প্রদীপশিখা যেরূপ সকল ধূম্রাবরণ ত্যাগ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, প্রমীলার প্রেমও সহমৃতা হইবার পূর্বে সেইরূপ শেষ অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই সমাগম কেবল ইন্দ্রজিতের সহিত প্রমীলার সমাগম নহে, ইহা যেন এক ব্যর্থ সংকল্পের সহিত নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের সমাগম, অন্তঃসারশূন্য বিশ্বাসের সহিত চরম নৈরাশ্যের সমাগম। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তৃতীয় সর্গের এই নামকরণ এক গভীর সংকেতবাহিতায় পাঠকমনকে চমৎকৃত করিয়া তোলে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে পাশ্চাত্য প্রভাব

মধুসূদনের কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা ও আলোচনা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সমালোচকগণ তাঁহার কাব্যের পরিকল্পনা, পংক্তি, চরণ, ভাষা, শব্দ ও অলংকারে অধিকতর প্রতীচ্য কাব্যসাহিত্যের আনুরূপ্য আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু এই ব্যাপারে মধুসূদন স্বয়ং যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তদপেক্ষা নূতন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার প্রারম্ভে মধুসূদন স্বদেশীয় ও বৈদেশিক কাব্য-ভাণ্ডারে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং মুখ্যত ইউরোপীয় মহাকাব্যের ঐশ্বর্যসম্পদের অনুসরণেই তিনি ভারতীয় ভাষায় অনুরূপ কাব্য-সম্ভার গঠন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে গ্রীক মহাকাব্যই তাঁহার কবিপ্রাণকে সমধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল।

হোমারের মহাকাব্য সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন যুগ ও কালের বিভিন্ন মহাকবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। হোমারের কাব্যের উপাদান লইয়াই দান্তে ভার্জিল টাস্‌সো মিলটন প্রমুখ কবিবৃন্দ তাঁহাদের কাব্যদেহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মধুসূদন সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনায় সেই হোমারের কাব্যের আদর্শকেই সচেতন ও অবচেতনভাবে গ্রহণ করিবেন, ইহাতে সন্দেহের কিছু নাই। মধুসূদন স্বয়ং এই বিষয়ে যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki.

কিন্তু এই মন্তব্যের শেষাংশের আক্ষরিক বাচ্যার্থ মধুসূদনের কাব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। মধুসূদন ছিলেন অসাধারণ অধ্যয়নপটু, বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের বিপুল উদ্যম তাঁহার মননকল্পনাকে নির্মিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাল্মীকি-বেদব্যাসের মহাকাব্য, সংস্কৃত কাব্যনাটকাদি ও ভারতীয় শাস্ত্রপুরাণে তাঁহার অনুপ্রবেশ গ্রীক সাহিত্য অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম ছিল না। সুতরাং বাল্মীকিকে বিস্মৃত হইয়া হোমারকে একমাত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে মিলটনই ছিলেন তাঁহার কবিজীবনের আদর্শ। মিলটনের ন্যায় কবি হওয়াই ছিল তাঁহার চিরকালের স্বপ্ন। শেষ পর্যন্ত মিলটনের সহিত তাঁহার এই দিক দিয়া তুলনা করা যাইতে পারে যে, মিলটন যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধীত বিদ্যার দ্বারা পূর্বতন সাহিত্যের বহুবিধ প্রসঙ্গ ও চিন্তাকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার কাব্যদেহকে সম্পূর্ণ মৌলিক বেশে সাজাইয়া তুলিয়াছেন মধুসূদনও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken. এই স্বীকরণ-ক্ষমতায় মধুসূদন সম্ভবত মিলটনকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। অলিম্পাস পর্বতের শিখরস্থিত জুপিটারের সহিত মহাদেবকে একত্র করিয়া, হেক্টরের অন্ত্যেষ্টির সহিত ইন্দ্রজিতের সংক্রিয়াকে মিলাইয়া দিয়া মধুসূদন যে সমীকরণ-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে-কোনও মৌলিক সৃজনীশক্তি অপেক্ষাও চমকপ্রদ বিবেচিত হইবে। এই বিষয়েও

মধুসূদন স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি গ্রীক কাহিনীভাগের অনুকরণ করেন নাই। কিন্তু গ্রীক আদর্শানুযায়ী মেঘনাদবধ কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন—as a Greek would have done, একজন গ্রীক যেরূপভাবে কাব্য রচনা করিতেন, কবি সেই পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। এই পন্থাটি কিরূপ, গ্রীক কাব্যাদর্শ বলিতে কবি কী বুঝিয়াছিলেন, ইহা সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। হয়ত, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী, মানবিক আদর্শ, দুর্জ্ঞেয় নিয়তির দ্বারা জীবনের ঘটনাবলীর অচিন্তিতপূর্ব নিয়ন্ত্রণ, ঋজু স্বচ্ছ জীবন-দৃষ্টি ও ট্রাজিক চরিত্রপরিণাম—এইগুলিই গ্রীক কাব্যাদর্শ হইতে মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছিলেন [দ্রঃ মধুসূদন-কাব্যসম্ভার—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-লিখিত ভূমিকা]। অবশ্য গ্রীক পৌরাণিক-কল্পনা ও হিন্দু পুরাণ-কল্পনার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তাহা মধুসূদনের সমন্বয় প্রতিভার দ্বারা কোথাও কোথাও একীভূত হয় নাই। কাব্যের দু-এক স্থানেই এই সন্ধিকৃত মিলনের মধ্যে একপক্ষের অসৌজন্য ও উষ্মা যেন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রপত্নী বারুণী কর্তৃক লক্ষ্মীদেবীকে সখী সম্বোধন করাইয়া পুনরায় সর্গান্তরে কবি লক্ষ্মীকে বারীন্দ্রসুতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, প্রেমের অধিষ্ঠাতা মদনকে পুষ্পশর-হস্তে তিনি পার্বতীর বক্ষোসংলগ্ন শিশু কিউপিডে পরিণত করিয়া ভারতীয় চেতনাকে ঈষৎ পীড়িত করিয়াছেন। কিন্তু কবির সামগ্রিক সাফল্যের নিকট এই ত্রুটি বা দুর্বলতাগুলি নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য।

মেঘনাদবধ কাব্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব দুই দিক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে; একটি, এই কাব্যের সামগ্রিক পরিকল্পনায় কবি কতখানি প্রতীচীয় কবিকল্পনার নিকট ঋণী এবং আর একটি, কাব্যের বিভিন্ন স্থানে চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা, প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ব্যাপারে বিদেশীয় কাব্যের উপকরণ কবি কী পরিমাণ ব্যবহার করিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে মেঘনাদবধ কাব্য হোমারের মহাকাব্যের আদর্শেই পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হেক্টরের মৃত্যুতে প্রিয়ামের ব্যবহার ও আচরণ রাবণের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। দেবতার সাহায্যপুষ্ট রামচন্দ্রের কাহিনীর সহিত রাবণের মরণপণ সংগ্রামও দৈবসাহায্যপুষ্ট গ্রীসের সহিত ট্রোজানদের সংগ্রামের মত। প্রিয়ামের পত্নী পুত্র প্রসবকালে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতেই ট্রয় ভস্মসাৎ হইবে। পুত্রকে নির্বাসন দিয়া রাজা সেই ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিরাকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের বিচিত্র ছলনাজালে

তাহা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই, স্বপ্ন-ইঙ্গিতই সত্য হইয়াছে। রাবণের জীবনও সেইরূপ দেবদৈত্যনর-অচিন্তিত এক দুর্জ্ঞেয় বিধিবলে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং তাহার সমস্ত কর্মপ্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা এই নিয়তির দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত হেলেনহরণের অপরাধে ট্রয়ের সর্বনাশের মত সীতাহরণের অপরাধে রাবণ ও লঙ্কার পতনও অবশ্যম্ভাবী হইয়া দেখা দিয়াছে। ট্রয়যুদ্ধে হেক্‌টরই ট্রয়ের প্রধান সেনাপতি—হেক্‌টরবধের ভূমিকায় মধুসূদন লিখিয়াছেন, "মহাবীর হেক্‌টর (যাহাকে ট্রয়স্বরূপ লঙ্কার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ-বিদেশীয় বন্ধুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন।" মেঘনাদের সৈন্যাধ্যক্ষ-পদ-গ্রহণেও মেঘনাদবধ-কাব্যের সূচনা। ইলিয়াডের অনুবাদে মধুসূদন তাহার নাম দিয়াছিলেন হেক্‌টরবধ—মেঘনাদবধ কাব্য-নামের সহিত ইহার সাদৃশ্য প্রমাণ-অতীত। সুতরাং রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইলেও মধুসূদনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা যে তপোবনের কবির নিকট হইতে লব্ধ নহে, উহা যে নীল ভূমধ্যসাগর-পারবর্তী দ্রাক্ষাকুঞ্জের বীণাবাদকের সংগীত-ধ্বনিতেই অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা তর্কের অপেক্ষা রাখে না। এমন কি, সরস্বতীর শ্বেতভুজা বিশেষণটিও গ্রীক লেউকোলেনোস্-শব্দের অনুবাদ মাত্র।

কেবল ইহাই নহে, কবি রামায়ণের গল্পকাহিনীর সাদৃশ্যে যে কাহিনীকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার সর্বাঙ্গে গ্রীক পুরাণের গোলাপ-নির্যাস ছিটাইয়া দিয়াছেন। এক আধটি চরিত্রে, কাহারও ভাষায়, কোথাও উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, বিশেষণে, এমন কি, সর্গের গঠন পরিকল্পনাতেও গ্রীক কাব্যের অনুষঙ্গে কবি যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ কোথাও আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই, ইহার অহিন্দু-রূপ পীড়াদায়ক হইয়া উঠে নাই, কারণ ভারতীয় শাস্ত্রপুরাণের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা ও গভীর অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং সর্বোপরি সৃজনী প্রতিভা কবিকে পরিচালিত করিয়াছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য রবীন্দ্রনাথের গোরার মতই জন্মসূত্রে হয়ত বিদেশীয়; কিন্তু তাহার গভীর নিষ্ঠায়, আত্মসমর্পণের ঐকান্তিকতায়, ভক্তিতে, স্বদেশপ্রেমে জননীর সাধ্য কি তাহার পুত্র হইবার দাবীকে অস্বীকার করিতে পারেন?

সুতরাং তুলনা যদি করিতেই হয় তবে ঐ গ্রীক মহাকবির নিকটেই কবির ঋণের আলোচনা, অন্য কাহারও সহিত নহে। সত্য বটে, মধুসূদন অন্যান্য বিদেশী কবির কাব্য হইতেও উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র

কাব্যের চেতনার জন্য নহে ; তাহা কাব্যের অঙ্গ বিশেষের জন্য, গৃহনির্মাণের পর মরকত-ফলক বা গজদন্ত-গবাক্ষের জন্য।) ভার্জিল দান্তে টাস্‌সো মিলটন—এই চারিজন কবিও মধুসূদনের মতই বারবার হোমারের দ্বারস্থ হইয়াছেন, সুতরাং ইঁহাদের সহিত মধুসূদনের সতীর্থ মনোভাবই থাকিবার কথা। সতীর্থের নিকট লব্ধ ঋণ পরিশোধনীয়, কিন্তু গুরুঋণ কোনোকালেই শোধ হয় না। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দের কথাও মনে পড়িবে। মিলটনের কাব্যে প্রবর্তিত Blank Verse-ই যে মধুসূদনের কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ-আবিষ্কারের মুখ্য প্রেরণায় পরিণত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাতত অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখমাত্র করিয়া এই কাব্যের বিষয়ের ক্ষেত্রে কবি কতখানি প্রতীচ্য প্রভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাই আমাদের আলোচ্য।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে পাশ্চাত্য প্রভাব সামগ্রিকভাবে এই সর্গটির পরিকল্পনায়, ইহা পূর্বেই আভাসিত হইয়াছে। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্যে অভিষেক আগামেম্‌ননের বিরুদ্ধে হেক্‌টরের সৈনাপত্যে অভিষেকের ঘটনারই অনুরূপ। উভয় যোদ্ধার দায়িত্বের পরিণামই নির্মম জীবনাবসান। অবশ্য ইলিয়াড কাব্যে এই অভিষেক-রূপ নামকরণ কোনো সর্গেই দেখা যায় না, কিন্তু হেক্‌টরের সেনাধ্যক্ষপদ গ্রহণের উল্লেখ আছে। হেক্‌টর সম্পর্কে হোমারের কাব্যে একাধিকবার Hope of Troy এইরূপ শব্দের উল্লেখ আছে, আর মেঘনাদের বিশেষণরূপে কবিও রাক্ষসভরসা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম সর্গে ইন্দ্রজিৎ প্রমোদোদ্যান ত্যাগ করিয়া যখন রাঘব-নিধন-সংকল্পে যাত্রা করিতেছেন, তখন প্রমীলার প্রীতিপূর্ণ কাতরতা হেক্‌টরের যুদ্ধযাত্রাপূর্বে হেক্‌টর-পত্নী এণ্ড্রোমেকির বিলাপের সহিত তুলনীয়।

বিচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রথমেই কাব্যারম্ভের সরস্বতী-বন্দনার প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। এই Muse-invocation-এর সূচনা ইলিয়াডেই, ভার্জিল মিলটন তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদন এই রীতি প্রতীচ্য মহাকাব্যের সাধারণ ঐতিহ্য হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম সর্গের ৪৫৪-৪৫৫ ছত্রে বারুণীর মুখে সমুদ্রদেবতার সাহিত চিরশত্রু বায়ু তথা প্রভঞ্জনের যে চিরন্তন বৈরিতার এবং ৪৬০ ছত্রে বায়ুকে কারাবদ্ধ করার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা গ্রীক পুরাণ-প্রসঙ্গ ; ভার্জিল-রচিত এনেইড কাব্যেও এই

সমুদ্রদ্রোহী বায়ুপতি এয়োলাসের উল্লেখ আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে ৫৫০-৫৫৩ ছত্রে দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় বায়ুপতিকে আহ্বান করিয়া কারা-বদ্ধ বায়ুদলকে সাময়িকভাবে মুক্তিদানপূর্বক লঙ্কার উর্ধ্বাকাশে প্রলয়-ঝড় সৃষ্টি করিবার আদেশ দিয়াছেন। সমুদ্রাধিপতি বারুণী ও তাহার সখী মুরলা এই দুই চরিত্রের জন্য মধুসূদন মিলটনের নিকট ঋণী—মিলটনের কোমাস কাব্যে সেবার্ন নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্যাব্রিনা এবং সহচরী লিজিয়া যথাক্রমে বারুণী ও মুরলায় পরিণত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য হোমারের থেটিস-চরিত্র হইতেই মিলটন তাঁহার স্যাব্রিনা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। পাশ-অস্ত্রধারী সমুদ্রপতিও গ্রীক পুরাণের নেবিয়াস। সমুদ্র ও বায়ুর শত্রুতার ইঙ্গিত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গেও দেখা যায়।

প্রথম সর্গে লঙ্কার প্রমোদোদ্যানের পরিকল্পনা টাস্সোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড কাব্য হইতে গৃহীত। এই কাব্যে আর্মিডার স্বর্গীয় উপবন এবং আর্মিডার সহিত রিনাল্ডোর প্রণয়-সম্ভাষণই প্রমীলা-মেঘনাদের আচরণের উপর আরোপিত হইয়াছে। চার্লস ও যুরাল্ডো যেরূপ রিনাল্ডোকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য আর্মিডার উপবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মধুসূদনের কাব্যে সেইরূপ লঙ্কা-কুললক্ষ্মী প্রভাষা ধাত্রীর ছদ্মবেশে প্রমোদোদ্যানে আসিয়াছেন এবং ইন্দ্রজিৎকে উত্তেজিত করিয়াছেন। উত্তেজিত রিনাল্ডো বিলাসভূষণ সক্রোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—His nice attire in scorn he rent and tore—মেঘনাদও 'ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী' (৬৭৯ ছত্র)।

দ্বিতীয় সর্গে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রথম সর্গের তুলনায় আরও গভীর। এই সর্গের বিষয়বস্তু ইন্দ্রজিৎ-হত্যার জন্য স্বর্গলোকের ষড়যন্ত্র এবং রাবণের ইষ্টদেবতা মহাদেবকে বিহ্বল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের নিধনোপায়-সংগ্রহ ও দেববৃন্দের সাহায্যে জ্যোতির্ময় অস্ত্রাদি লইয়া লক্ষ্মণকে দান। সমগ্র সর্গটি স্পষ্টই ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের অনুরূপ। জুপিটার ও জুনো এই দুই দেবদম্পতীর অনুগ্রহ ট্রয় ও গ্রীসের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত ছিল, সুতরাং জুপিটারের সতর্ক প্রহরার সম্মুখে ট্রোজানদের ক্ষতিসাধন অসম্ভব হওয়ায় জুনো তাঁহার স্বামীর উপর মোহিনীমায়া বিস্তার করিলেন। নিদ্রাধি-পতি সোম্নাস ও সৌন্দর্যস্বরূপা ভেনাস দেবীকে আসিয়া সহায়তা করিলেন। যৌবন-কুঞ্জবনে জুপিটার পত্নীর মদির কটাক্ষ ও ললিতবাহুবন্ধনে মোহাচ্ছন্ন হইলে জুনো ট্রয়বাসীদিগের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলিয়াডের

এই অলিম্পিয়া-অন্তর্গত ইডা-পর্বতশিখরই কৈলাস-নিকটস্থ যোগাসন পর্বতে পরিণত হইয়াছে। জুপিটারকে উত্তেজিত করিলে তাঁহার ক্রোধের কারণ হইবার ভয়ে সোম্‌নাস যেরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং জুনো তাঁহাকে যেভাবে অভয় দান করেন, তাহাও মদন ও পার্বতীর কথোপকথনে গৃহীত হইয়াছে বলা যায়। পার্বতী ও ধ্যানভঙ্গ মহাদেবের সংলাপ জুপিটার ও জুনোর সংলাপেরই অনুরূপ। "হোমারের মহাকাব্যে দেবী থেটিস দেবশিল্পী হেফাইস্‌তোসকে দিয়া দিব্যঅস্ত্র গড়াইয়া পুত্র আখিল্লেওসকে (এ্যাকিলিসকে) দিলেন হেক্‌তোরকে (হেক্‌টরকে) বধ করিবার জন্য। মধুসূদনের কাব্যে ইন্দ্র মহামায়ার নিকট হইতে দিব্যঅস্ত্র লইয়া দেবদূত গন্ধর্ব চিত্ররথকে দিয়া লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ইন্দ্রজিৎ-বধের জন্য।" এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় সর্গে কবি যে মদনের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাহা সর্বাংশে পাশ্চাত্য কবিকল্পনার শিশু কিউপিড মাত্র। দ্বিতীয় সর্গের ৭-৯ ছত্রে সুগন্ধবহ বাতাস কর্তৃক সকলের নিকট 'কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা' তাহার ঘোষণা সম্পর্কে কবি স্বয়ং পত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন, These lines will, no doubt recall to your mind the lines—

And whisper whence they stole
Those balmy spoils. (Milton)

And— Like the sweet sound
That breaths upon a bank of violets
Stealing and giving odour. (Twelfth Night 1. 1.)

তৃতীয় সর্গে পাশ্চাত্য প্রভাব কেবল প্রমীলা-চরিত্র-পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যায়, সর্গ-পরিকল্পনায় বা অন্য কোনো আঙ্গিক-সাদৃশ্যে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। এই সর্গের বিষয়বস্তু বহির্লঙ্কাস্থিত ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার বসন্ত-পুষ্পিত প্রমোদোদ্যান হইতে প্রেমময়ী প্রমীলার রণরঙ্গিণী মূর্তিধারণ এবং লঙ্কাবরোধকারী রাঘবসৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ এবং স্বামীর সহিত প্রমীলার মিলন। ঘটনা হিসাবে ইহা মধুসূদনেরই স্বকপোল-উদ্ভাবিত, কিন্তু রমণীর যে সংগ্রাম-কুশল সশস্ত্র দৃপ্তভঙ্গিম রূপটি তিনি প্রমীলার উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীচ্য কাব্যের কয়েকটি অনুরূপ বীরাঙ্গনা মূর্তির ধ্যান হইতে লব্ধ হইয়াছে। মধুসূদনের কাব্যসমালোচকগণ

প্রমীলা-চরিত্রের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া একাধিক য়ুরোপীয় কাব্যের তেজস্বিনী অশ্বারূঢ়া রণবেশধারিণী নারীর আদর্শ সংকলন করিয়াছেন। গ্রীক পুরাণের আমাজন রমণী, হোমারের কাব্যে হেক্‌টর-পত্নী এণ্ড্রোমেকি বা এথেনির সহিত প্রমীলার সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—

"আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ট্যাসোর জেরুজালেম-উদ্ধার কাব্য হইতে মধুসূদন তাঁহার প্রমীলা-চরিত্র-চিত্রণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। ইহার বীরাঙ্গনা এরমিনিয়ার, ক্লরিণ্ডার এবং গিল্‌ডিপের চিত্রে তাঁহার বীরত্বানুরাগী হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর ইলিয়াডের রণসজ্জায় সজ্জিতা আথিনীর (Athenae) এবং ইনিয়াডের [এনেইড-এর] অশ্বারোহণ-নিপুণা সসঙ্গিনী কেমিলার চিত্র তাঁহার অস্পষ্ট কল্পনাকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছিল।" অবশ্য এথেনার সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের মহামায়া বা মায়াদেবীরই সাদৃশ্য আছে। জেরুজালেম ডেলিভার্ড কাব্যের আর্মিডা-চরিত্রটির কথাও প্রমীলা-প্রসঙ্গে মনে পড়িবে। বায়রনের মেড অফ সারাগোসার কথাও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়া অশ্বারোহিণী প্রমীলার যাত্রাকালে অন্তরীক্ষপথে মদনের ধনুঃশরনিক্ষেপপূর্বক প্রমীলার মিলনোৎকণ্ঠা ও প্রেমার্তিকে তীব্রতর করিতে করিতে সহগমন করার দৃশ্যটিও টাস্‌সোর কাব্য হইতে সংকলিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমীলা-চরিত্র প্রযোজনায় মধুসূদনের আপন কবিপ্রতিভা ও উদ্‌ভাবনী কৌশল ব্যতীত, সাধারণভাবে টাস্‌সোর নিকটই তাঁহার উপকরণ-গ্রহণের পরিমাণ সর্বাধিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন সমগ্রকাব্যে অন্যান্য ধরণের পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিমাণ ও প্রকৃতি, মহাকাব্যিক উপমা ব্যবহারে বৈদেশিক ঋণের কথা আলোচনা সমাপনান্তে পুনর্বার উল্লিখিত হইবে।

প্রাচ্য প্রভাব

মধুসূদনের প্রসিদ্ধ চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মধুসূদনের মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টিপর্বকে 'প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাবকাল' ও 'পাশ্চাত্য কবিদিগের প্রভাবকাল' এইরূপ দুইটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে ভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র সারস্বত জীবন এই দুই পর্বে আলোচিত না হইলেও এই দুই পর্বের মধ্যে প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাব বলিতে জীবনীকার প্রধানত শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতী নাটক

রচনা, বাঙলা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তন এবং তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য প্রভাবকালে একমাত্র মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্য বিশ্বকর্মা মধুসূদনের শিক্ষা অনুশীলন সৃজনীপ্রতিভা ও কল্পনাসম্পদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহার অন্যান্য রচনা সেই তুলনায় মোহিতলাল মজুমদারেব ভাষায় 'কাব্যকলাকুতূহল'—ইহাও অস্বীকার্য নহে। মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে কবির সম্মুখে সমুদ্রপারের জ্ঞানভারতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি লেউকোলেনোস, শ্বেতভুজা—শ্বেতবসনা নহেন। যে-সকল 'কবিব চিত্তফুলবন-মধু' লইয়া তাঁহার মধুকরী কল্পনা গৌড়জনের জন্য নিরবধিকাল-আস্বাদ্য মধুচক্র রচনা করিতে চাহিয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশই পশ্চিম মহাদেশেব কলাবিদ্। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মধুসূদন ছিলেন এমন এক বিরল প্রতিভার অধিকারী যাঁহার নিকট সমন্বয় ছিল মৌলিক সৃষ্টির মতই একটি অনায়াসসাধ্য ব্যাপার। এইজন্য এই কাব্যের প্রাচ্যরূপটিও শেষ পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রাজনারায়ণ বসুর মত সমালোচক তাই স্বীকার করিয়াছিলেন—

"এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু আকার প্রায সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুত এই কাব্যটি এসিয়ারূপ জনয়িতা ও ইউরোপরূপ জনয়িত্রীব সন্তানস্বরূপ" (মধুস্মৃতি হইতে উদ্ধৃত, মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন)।

সুতরাং মধুসূদনের কাব্যে প্রাচ্যপ্রভাব অনুসন্ধান করিবাব প্রস্তাবটি এক হিসাবে ভ্রমাত্মক, কারণ সমগ্র কাব্যই প্রাচ্য—এই কাব্যেব বিষয়বস্তু রামায়ণের ঘটনা, ভাষা বাঙলা এবং কবি বাঙালী। ডিভাইন কমেডিব হেল-খণ্ডে প্রথম সর্গে দান্তে যেমন ভার্জিলকেই তাঁহাব গুরু বলিয়া স্বীকাব করিয়াছিলেন, মধুসূদন এই কাব্যে পদে পদে বাল্মীকিকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইয়াছেন। কবি যে চতুর্থ সর্গে লিখিয়াছেন—

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজি, তুমি নাহি দিলে।
রত্নাকর ?—

তাহা সকল সর্গ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহা ভিন্ন তিনি চতুর্থ সর্গে ভর্তৃহরি

ভবভূতি ভট্টি কালিদাসের সহিতও আপনার ঐতিহ্যানুগত বন্ধন স্মরণ করিয়াছেন—কোনো পাশ্চাত্য কবি তাঁহার উল্লেখ-তালিকায় পড়ে নাই। এই কাব্য যে ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের ধারাতেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ, প্রথমত, হিন্দু পুরাণগুলি সম্পর্কে কবির নিবিড় শ্রদ্ধা এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিস্ময়কর অধিকার। তৎসত্ত্বেও বাল্মীকির কাব্য-বিষয়কে আপন প্রয়োজনে তিনি কী পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন এবং সেই পরিবর্তনে প্রতীচ্য কবিদের ন্যায় প্রাচ্য কবিদের উপকরণ তিনি কতখানি আত্মস্থ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কেও কয়েকটি মন্তব্য করা যাইতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের সূচনায় কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন তাহা ইউরোপীয় মহাকাব্যের মিউজ-বন্দনার অনুকৃতি হইলেও সংস্কৃত সর্গবন্ধ মহাকাব্যের নমস্ক্রিয়ার সহিতও ইহার তুলনা করা যায়। কবি যে এই কাব্যসূচনায় বাল্মীকির রসনায় অধিষ্ঠিত শ্বেতভুজা ভারতীর কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাও বিশেষভাবে রামায়ণ কাব্যের সূচনাংশের স্মৃতির দ্বারা উদ্দীপ্ত। তদ্ব্যতীত প্রথম সর্গের রাজশোভা, রাবণের ঐশ্বর্যসম্পদের বর্ণনা, তাঁহার রাজসভার সম্মানশ্রী ও মণিমুক্তার বিবরণ যে রামায়ণ কাব্য হইতেই একাধিকবার কবি সংকলিত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বীরবাহুর বীরত্বের কথা কৃত্তিবাস দীর্ঘ করিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন, সেই কৃত্তিবাস-স্বীকৃত বীরবাহুর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ঘটনা অবলম্বন করিয়া মধুসূদনের কাব্য আরব্ধ হইয়াছে। ভগ্নদূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে ভগ্নোদ্যম রাবণের ভূলুণ্ঠিত শোক ও বিলাপ কৃত্তিবাস পল্লবিত করিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন, মধুসূদনের উপকরণ তথা হইতেই সংকলিত। চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের উল্লেখও কৃত্তিবাসী কাব্যেই আছে, মধুসূদন এক্ষেত্রেও কৃত্তিবাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গে মহাদেব-পার্বতীর ঘটনা ইলিয়াড কাব্যের চতুর্দশ সর্গ অবলম্বনে গঠিত হইলেও আবার কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের স্মৃতিও কবির সম্মুখে অবশ্যই উন্মুক্ত ছিল। ভারতচন্দ্রের কামমুগ্ধ শিবও তাঁহার কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিলে আশ্চর্যের কারণ নাই। প্রমীলা-চরিত্রের আদর্শ রচনায় পাশ্চাত্য কবিদের বীরাঙ্গনা ব্যতীত কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্বের প্রমীলা-চরিত্রও উল্লেখযোগ্য। অশ্বমেধ পর্বে যজ্ঞাশ্ববাহিত অর্জুন প্রমীলা-রাজ্যে বীররমণী প্রমীলা ও তাহার রণরঙ্গিণী সেনানীর

মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারীর সহিত সম্মুখ-সমরে অস্ত্রধারণ করেন নাই। সেখানেও যুদ্ধাভিলাষিণী সশস্ত্র নারীবাহিনীর সহিত বাস্তসমাবেশের উল্লেখ ছিল, এবং সেখানেও প্রমীলার অপরাজেয়ত্বের হেতুস্বরূপ পার্বতীকৃপার কথা বলা হইয়াছিল। প্রমীলা-চরিত্রের উপর অনেকে রঙ্গলাল-রচিত এবং সদ্যোপ্রকাশিত পদ্মিনী উপাখ্যানের পদ্মিনী-চরিত্রের প্রভাবেরও উল্লেখ করেন, কেউ কেউ সিপাই-বিদ্রোহে খ্যাতনাম্নী ঝান্সীরাজ্ঞী লক্ষ্মীবাই-এর প্রসঙ্গও উত্থাপন করিয়া থাকেন। কোনো তথ্যই হয়ত মিথ্যা নহে, হয়ত প্রতিটি ইঙ্গিতই গভীর তাৎপর্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি চরিত্র-পরিকল্পনায় নিয়োজিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম তিনটি সর্গে বিচ্ছিন্নভাবে কবির প্রাচ্য সাহিত্যপাঠের গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আছে। বাল্মীকি-ব্যাসেব কাব্য যেমন তাঁহার নিকট সুপঠিত ছিল, তেমনি কালিদাস-ভবভূতির মত সাহিত্য-স্রষ্টার সহিত ঐকান্তিক পরিচয়ের প্রমাণও মধুসূদনের কাব্যেব প্রতি সর্গেই প্রকীর্ণ রহিয়াছে। প্রথম সর্গে মৃতপুত্রের জন্য শোকসন্তপ্ত রাবণের উক্তিব একাধিক স্থানে (৮৩-৮৪ ছত্র এবং ৯১-৯৩ ছত্র) অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকেব ও ব্যাস-রচিত মহাভারত হইতে লব্ধ দুইটি প্রসিদ্ধ উক্তিব তর্জমা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরণেব উদাহরণ এই কাব্যে বহুতর পংক্তিতেই পাওয়া যায়। ভারতীয় পুরাণের সহিত কবির যে কত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয় ছিল তাহা কাব্যের অসংখ্য চরণে নিহিত আছে।

প্রথম তিন সর্গের ছন্দ

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বিদ্রোহ তাহা উহার ভাষা ও ছন্দের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ কবিয়াছে। সার্থক মহাকাব্য কেবল আলংকারিক সূত্র অনুসরণ করিয়া, উহার নায়কচরিত্রের প্রত্যাশিত গুণপনা ও রসের যাথাযথ্যের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় না। মহাকাব্যকে কায়মনোবাক্যে মহাকাব্য হইয়া উঠিতে হইলে তাঁহার রূপরীতি ছন্দোধ্বনি বাক্‌স্পন্দ সব কিছুর ক্ষেত্রেই এক প্রকার গাম্ভীর্য ঔদাত্ত্য ও ওজস্বিতার সমাবেশ ঘটাইতে হইবে। ইহার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার মধুসূদনের মহাকাব্যিক পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। প্রথাগত কাব্য-বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কবি যেমন নূতন বিষয়বস্তুকে মহাকাব্যের উপকরণ-

রূপে গ্রহণ করিলেন, তেমনি রূপকরণের দিক হইতেও প্রাচীন পয়ার ত্রিপদীর ক্লান্ত পাণ্ডুর মন্থরতা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন এক জাতীয় বলিষ্ঠ ছন্দোরীতির ব্যবহারের জন্য তাঁহার কবিসত্তা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সেই নবযুগের ছন্দ খুঁজিয়া পাওয়ায় তাঁহার প্রতিভা যেন আপনার পথ পাইয়া গেল। অথচ কবি কোথাও স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া পড়েন নাই, তাঁহার কাব্যপ্রকরণের তথা ছন্দের অভিনবত্ব সনাতন বাঙালা পয়ার ছন্দের উপরই ভিত্তিস্থাপন করিয়া গড়িয়া উঠিল। সমীকরণ ও বিরোধের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কারই মধুসূদনের প্রতিভার মূল সূত্র—ইহা তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু হইতে ভাষা ও ছন্দোরীতি, শব্দচয়ন ও অলংকার-প্রয়োগেও লক্ষ্য করা যায়।

একথা বারবার বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি অভিনবত্ব ও স্পর্ধিত দুঃসাহস আছে। ইহার নায়ক রামায়ণ-প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্র নহেন। অখ্যাতির কলঙ্কে আচ্ছন্ন পরদারাপহারক রাক্ষসবংশরাজ রাবণ এবং তাঁহার পুত্র মায়াযুদ্ধে পারদর্শী ইন্দ্রজিৎ বাল্মীকির অনাদর উপেক্ষা করিয়া মধুসূদনের কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই কাহিনী-প্রবর্তনে মধুসূদন রামায়ণের সাহায্যই লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণের মহাকবি-প্রদত্ত বহুতর ইঙ্গিতকে তিনি আপন প্রতিভায় বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই তুলনায় মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দে বা ভাষায় কবির মৌলিকত্ব অনেক বেশি, কারণ এই মহাকাব্যের ছন্দ ও ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার উপযোগী করিয়া নির্মাণ করিবার ক্লেশ ও আয়াস-সাধনা ও সংগ্রাম তাঁহাকেই বহন করিতে হইয়াছিল। ভারতী বাগ্‌দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষররূপ নিগড় ছিন্ন করিয়া তিনি তাঁহাকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দচরণা শ্রীময়ী দেবীতে পরিণত করিলেন এবং লোকায়ত বাক্‌রীতির সংস্কার করিয়া মাতৃভাষাকে এক অনন্যসম্পদ দান করিলেন। এইভাবে ভাষা ও ছন্দে, অমিত্রাক্ষরে ও ঘনপিনদ্ধ বাক্‌স্পন্দে, মেঘনাদবধ কাব্যে এক প্রকার ক্লাসিক স্থাপত্য ঋজুতা ও সংহতি আসিল—বক্তব্য ও প্রকাশরীতি কেবল আলংকারিক মহাকাব্যরীতির উদাহরণ না হইয়া যথার্থ জীবনময় মহাকাব্যের উদাহরণ হইয়া উঠিল।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তি প্রচলিত পয়ারই অর্থাৎ অষ্টমাত্রিক এবং অপূর্ণ ষণ্মাত্রিক পর্বে বিন্যস্ত চতুর্দশাক্ষর চরণ, যাহার দুই পদ মিত্রাক্ষর বা

মিলযুক্ত। মধুসূদন এই ছন্দের চরণের মাপটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রথমে পদান্ত অনুপ্রাস বা মিলকে তুলিয়া দিলেন এবং তারপর বক্তব্যের স্বাধীন সঞ্চরণ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবানুযায়ী বাক্যের সীমানা একই কাব্যপংক্তিতে শেষ না করিয়া তাহাকে পরবর্তী চরণে বা পংক্তিতে বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ইহাতে ভাবের উচ্চাবচতার সহিত গদ্যবাক্যের মত নূতন একপ্রকার অর্থযতির উদ্ভব ঘটিল। তাহা কখনও চরণের পূর্বতন ৮+৬ যতির সহিত মিলিয়া গেল, কখনও নূতন অর্থ-যতির সৃষ্টি করিল।[১] প্রথম কয়েকটি সর্গ হইতে এইরূপ পর্ব-যতি ও অর্থযতির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

এতেক কহিয়া স্তব্ধ/হইল রাক্ষস
মনস্তাপে।+লঙ্কাপতি/হরষে বিষাদে
কহিলা,+"সাবাসি, দূত!+/তোর কথা শুনি,+
কোন্ বীর-হিয়া নাহি/চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে?+ডমরুধ্বনি/শুনি কালফণী
কভু কি অলসভাবে/নিবাসে বিবরে?+

[প্রথম সর্গ, পংক্তি ১৯৫-২০০]

হাসিয়া কহিলা উমা,+/রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব জিষ্ণু।+তুমি,+/হে মঞ্জুনাশিনী
শচি,+তুমি ব্যগ্র ইন্দ্র/জিতের নিধনে।+
দুই জনে অনুরোধ/করিছ আমারে
নাশিতে কনকলঙ্কা।+/মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য।+বিরূ/পাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃকুল;+তিনি বিনা/তব এ বাসনা,+
বাসব,+কে পারে,+কহ,+/পূর্ণিতে জগতে?

[দ্বিতীয় সর্গ, পংক্তি ২০৩-২১০]

উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে কোথাও মিত্রাক্ষরের ব্যবহার নাই এবং পরস্পর দুইটি পংক্তিতে বাক্য সমাপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাক্য পরবর্তী পংক্তিতে প্রবহমান। প্রথম দৃষ্টান্ত অপেক্ষা দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ভাবযতির বা অর্থযতির [+] বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং ইহাতে মৌখিক বাক্‌রীতি তথা নাটকীয়

১ গ্রন্থের সূচনাংশে বিস্তৃত কাব্যসমালোচনা উপলক্ষে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

রীতির প্রাধান্য ঘটায় পয়ারের প্রচলিত আট-ছয় মাত্রানুযায়ী যতিস্থাপনও [/] যেন তুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে—অথচ তাহাকে লঙ্ঘন করা হয় নাই—অন্তরালে সেই বন্ধন আছেই। এইভাবে বন্ধনকে স্বীকার করিয়াও বন্ধনমোচনের চেষ্টা, শৃঙ্খলার মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলাই অমিত্রাক্ষরের ধর্ম।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও এই কাব্যের প্রথম তিনটি সর্গ হইতে প্রমাণিত করা যায়। প্রথম সর্গে মধুসূদন কেবল বীররসাত্মক কাব্যের অঙ্গীকার করিলেও বীর্য ও লালিত্য, ক্রোধ ও বিষাদ, প্রেম ও বিদ্রূপ, হতাশা ও আত্মবিশ্বাস এই একটি মাত্র ছন্দেই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগীয় কাব্যে পয়ার ছিল কেবল নিস্পৃহ বর্ণনার ছন্দ, তাহা‥ ভাবের আবেগ লাগিলেই ছন্দ ত্রিপদীতে পরিণত হইত। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের মহাকাব্য-নির্দেশেও ছন্দ-পরিবর্তনের সমর্থন আছে। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কোনরূপ রূপগত বিচিত্রতা বা ভঙ্গি-পরিবর্তন-ব্যতিরেকেই বিচিত্র মনোবৃত্তির মসৃণ বাহন হইয়া উঠিয়াছে। এই ছন্দ তাই কখনও রাবণের মুহ্যমান শোকে পাঠককে বিষণ্ণ করিয়া তোলে, কখনও পুত্রহারা জননীর ভূলুণ্ঠিত দৈন্যে নিষ্করুণ নয়নে অশ্রু ঘনাইয়া আনে—কখনও ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসায় ধমনী কবোষ্ণ করিয়া দেয়। প্রমীলার রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ও অশ্বখুরধ্বনিতে, শিঞ্জিনী ও যুদ্ধাস্ত্রের কলরোলে মিশিয়া ইহা প্রণয়াবেগ ও ত্রাসের এক যুগপৎ বিস্ময় সৃষ্টি করে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির যেন কোনো উদ্বেগ নাই—তিনি নিরাসক্তের মত কেবল বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। ছন্দ তাহার স্বাভাবিক প্রাণশক্তিতে, শব্দসম্পদে, ব্যঞ্জনাসৃষ্টির দুর্নিবার ক্ষমতায় কখনও ধরাতলে অতুলনীয় মাণিক্যভূষিত রাজসভার বর্ণনা করিতেছে, কখনও প্রমীলা-ইন্দ্রজিতের মনোহর প্রমোদকাননে নিত্যবসন্তশোভার বিবরণ দিতেছে। যে ছন্দ সমুদ্রতলস্থ বারুণীর নিভৃত সভাকক্ষের প্রতি দর্পন মেলিয়া ধরিতেছে, তাহাই আবার স্বর্গস্থ দুর্গম যোগাসনপর্বতের শিরোভাগে উপবিষ্ট ধ্যাননিরত মহাদেবের তাপসমূর্তিটি অঙ্কিত করিতেছে। এই একই ছন্দে চিত্রাঙ্গদার রিক্ত হৃদয়ের হাহাকার মর্মন্তুদ বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে—

একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে

রক্ষাহেতু তব কাছে রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখি। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?

[প্রথম সর্গ, পংক্তি ৩৪৭—৩৫২]

পরমুহূর্তেই দেখি বীরজায়া প্রমীলার দৃপ্তকণ্ঠের তেজোময়ী বাণী—

দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?

[তৃতীয় সর্গ, পংক্তি ১৪৫-১৪৯]

প্রথম তিন সর্গে ভাষা ও শব্দব্যবহার

মধুসূদন ছিলেন সিদ্ধবাক্ শব্দকুশলী শিল্পী। কবি-সমালোচক মোহিতলাল এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—

"ভাষাই কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপাদান; এবং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ভাবে নয় - ভাবের প্রকাশ-সুষমাতে, অর্থাৎ ভাষার কারুশিল্পেই প্রকৃত কবিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। যে কবির ভাষায় সে লক্ষণ নাই, তাঁহার কাব্যে ভাবের একরূপ বিকাশ থাকিতে পারে—প্রকাশ নাই। কারণ সে ভাব রসরূপ ধারণ করে নাই। অতএব সে কবি সত্যকার কবি নহেন। মধুসূদনের কাব্যে আমরা যে পরিচয় সর্বাধিক পাই, তাহা তাঁহার ভাষার এই কবিত্বলক্ষণ; ছন্দে ও বাক্যে তিনি বাঙলা কাব্যের ধাতুকেই পরিবর্তন করিয়াছিলেন; বাক্যের সংগীতগুণ, শব্দের নূতনতর প্রয়োগ ও মিলন-কৌশলে (phrase-making) সে ভাষার যে অপূর্বত্ব—ভিন্ন ধরণে বিহারীলাল ব্যতীত সে যুগের আর কোনো কবি বাঙলা কাব্যের ভাষাকে তেমন শিল্প-কৌলিন্য দান করিতে পারেন নাই।"

ভাষার উপর এইপ্রকার অধিকার ছিল বলিয়াই মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দকে মহাকাব্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বাঙলা সাহিত্যে গদ্যের অভাবনীয় বিকাশ হইতেছিল,

কিন্তু কবিভাষার তদনুরূপ সংস্কার ঘটে নাই। মধুসূদন তৎকালীন গদ্যরীতির যাহা শ্রেষ্ঠ স্টাইল, মুখ্যত তাহাকেই সংস্কার করিয়া তাঁহার কাব্যে প্রয়োগ করিলেন। ফলে এই ভাষা সর্গবন্ধ মহাকাব্যের আলংকারিকে ভাষা না হইয়া যথার্থ কবিপ্রাণের, ক্লাসিকাল কাব্যের সংহত বলিষ্ঠ ভাষায় পরিণত হইল। সংস্কৃত ভাষার শিল্পগুণ ও মৌখিক ভাষার ভাবপ্রকাশ-ক্ষমতা উভয়ই ইহাতে যুক্ত হইল। সেই সঙ্গে এমন একটি প্রতিভানিয়ন্ত্রিত সৌন্দর্যবোধ ও লালিত্য প্রকাশিত হইল, যাহা শব্দের অভিধাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায়—ইহাই ভাষার ব্যঞ্জনা শক্তি।

মেঘনাদব কাব্যে কবি যে ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বাঙলা ভাষাই। দুরূহ আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও সে ভাষায়, শব্দসম্পদে, জটিল ভাবপ্রকাশে একটি সংগীত-মূর্ছনা আছে। এ ভাষা কখনও নীরস বর্ণনাকে চিত্রে, স্থূল আবেগ-বৃত্তিকে গীতিরসে পূর্ণ করিয়াছে। প্রথম সর্গে কবি যখন রাবণের রাজসভার বর্ণনা করিয়াছেন, কিংবা রাবণের যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগে লঙ্কাপুরীর রণসাজের বিবৃতি দিয়াছেন সেখানে ভাষার এই সমৃদ্ধ চিত্রধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার সমরাভিযানের বিবরণের মধ্যেও চিত্রবিন্যাসের রীতি অনুসৃত হইয়াছে। আবার দ্বিতীয় সর্গে স্বর্গলোকের বর্ণনায় কিংবা রতি কর্তৃক মহাদেবীর বেশবিন্যাসের দৃশ্যে রূপময় বিবরণ মধুর সংগীত-ঝংকারে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মাত্র পৌরাণিক চিত্র অবলম্বনে এই শব্দময় গীতিরস সৃষ্টি করা যায় না—

এতেক কহিয়া রতি সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণিখচিত; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুংকুম, কস্তুরী;
রত্ন-সংকলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী
সাজিল নগেন্দ্রবালা; রসানে মাজিত
হেম-কান্তিসম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।

(দ্বিতীয় সর্গ, পংক্তি ২৮৬-২৯৫)

বর্ণনার সৌন্দর্যে কবি যেন স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া ভুবনমোহিনী দেবীর সম্মুখে দর্পণখানি আনিয়া ধরিয়াছেন—আপনার মনোহর রূপসজ্জার শক্তি ডাকিয়া দেখাইতেছেন। উচ্চাঙ্গ প্রতিভা ব্যতীত ভাষায় এই সৌন্দর্যসৃষ্টি করা সম্ভব নহে। দৈবী তনুর এই ললিত-যৌবন রূপশোভার পার্শ্বে বহ্নিমান-যৌবন আর এক রমণীর বিচিত্র বর্ণনা—

রোষে লাজভয় ত্যজি সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়ন-রঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চকুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণসারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরসান অসি; দীর্ঘ শূল করে
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—

[তৃতীয় সর্গ, পংক্তি ১১৫-১২৮]

মধুসূদন বহুতর দুরূহ আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহার কাব্যকে শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ্য করিয়াছেন, এইরূপ সমালোচনার অভাব নাই। সত্য বটে, মধুসূদনের রচনায় স্থানে স্থানে অপরিচিত তৎসম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু সেইগুলি কবির ইচ্ছাকৃত হইলেও রচনাকে অযথা পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত শ্রুতিকটু ও ভয়াবহ করিয়া তুলিবার জন্য কিনা সন্দেহ। মিলটনের রচনাও ইংরাজি কাব্যপাঠকদের নিকট দুর্বোধ্যতার অপবাদে নিন্দিত হইয়াছিল। মধুসূদন যে অভিনব মহাকাব্য রচনায় উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন, বাঙলা ভাষায়, বিশেষত আধুনিক বাঙলা ভাষায় তাহা সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-রহিত। ইহার ভাষাকে তাঁহার আপন লেখনীতে নির্মাণ করিয়া লইতে হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনার সহিত মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের সভা-বর্ণনার তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। সুতরাং এই কাব্যের শব্দাবলী মধুসূদনের আপন নির্মাণ-কৌশল ও সৃজনী প্রতিভারই পরিচায়ক। মধুসূদনের মত প্রতিভা অভিধান খুলিয়া দুর্বোধ্য শব্দ সংগ্রহ করিয়া কাব্যে প্রয়োগ করিতেছেন, এইরূপ ভাবা যায় না। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল—সংস্কৃত শব্দসিন্ধু তাঁহার নিকট দুস্তর দুরবগাহ ছিল না। এইজন্য কাব্যের প্রসঙ্গানুযায়ী পরিবেশ ও আবহের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া আপনিই শব্দ লেখনী-মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কষ্টকর নহে।[১] সত্য বটে, ইরম্মদ, কলম্বকুল, হর্যক্ষ, চর্ম্ম, অবলেপে, কঞ্চুক, লুলি, ভিন্দিপাল, কাকোদর, পিধান, মুখস, যাদঃপতি-রোধঃ, প্রক্ষেড়ন, কর্বুর প্রভৃতি প্রথম সর্গ-নিহিত শব্দাবলী; অনম্বর, মলম্বা, কপর্দী, কুসুমেষু, সুনাসীর, সারসন প্রভৃতি দ্বিতীয় সর্গের কিছু শব্দ; গরুত্মতী, আস্কন্দিতে, নারাচ, কৌন্তিক, ঠাঠ প্রভৃতির তৃতীয় সর্গস্থ শব্দচয় প্রত্যহিক ব্যবহারে পরিচিত নহে। কিন্তু এই সকল অপরিচিতের ভিতর দিয়া কবি যে রহস্য-ময়তা ফুটাইতে চাহিয়াছেন, সম্ভবত অন্যতর শব্দে তাহা সম্ভব হইত না। প্রথম সর্গে রাবণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে রামচন্দ্রের সৈন্যব্যূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়া দূর হইতে দেখিলেন—

দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ করভসম নব বলে বলী;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্ধ্বফণা—
ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!

শেষ দুইটি শব্দের বিকল্প পাওয়া যাইত না, এমন নহে—কিন্তু বিষধর সতর্ক সর্পের দর্পিত সঞ্চরণের মধ্যে যে শিহরণ আছে তাহা এই অনুপ্রাসিত শব্দদ্বয় ব্যতীত ফুটান যাইত না। প্রথম সর্গে 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' —দিন দিন হীনবীর্য রাবণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য তরঙ্গ-আঘাতমুখর বেলাভূমির ধ্বনি-চিত্রটি এই পদের বিসর্গ-বাহুল্যে যেন অবিস্মরণীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিল শব্দ-ব্যবহার কেবল

১ The thoughts and images bring out words with themselves—words that I never thought I knew.—কবির পত্রাংশ হইতে।

অনুপ্রাস-ব্যবহারের আতিশয্যেই ঘটিয়াছে, যেমন, দ্বিতীয় সর্গে পার্বতীর প্রতি মদনের উক্তি—

মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর! [পংক্তি ৩৫৬-৩৫৮]

কিন্তু রণরঙ্গিণী বেশে প্রমীলা যখন লঙ্কাপুরীতে আসিয়াছেন, আক্রমণকারী শত্রুসৈন্য মনে করিয়া লঙ্কাপুরবাসীরা বীর্যদৃপ্ত হৃদয়ে যখন উজ্জ্বল অস্ত্র শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আস্ফালন করিয়াছে, তখন কবি প্রচলিত নিত্য-দৃষ্ট অস্ত্রের দ্বারা এই অভিনব দৃশ্যটিকে অভ্যর্থিত করিতে পারেন নাই—

রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ন করে ;
তালজঙ্ঘা—তালসম দীর্ঘ গদা-ধারী,
ভীমমূর্তি প্রমত্ত! হ্রেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ ; রথ চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;
দুরন্ত কৌন্তিককুল কুন্তে আস্ফালিল ;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।

[তৃতীয় সর্গ, পংক্তি ৪৯১-৪৯৬]

কিংবা রাবণের রণপ্রস্তুতির সমারোহে কবি যে বীর্যশালিতা, সক্রোধ উদ্দামতা, বন্ধমুক্ত দুরন্ত দুঃসাহসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতি যেন স্বয়ং তাহার উপযোগী শব্দ চয়ন করিয়া আনিয়াছে—যেন কবির কোনো দায়িত্বই ছিল না, তিনি কেবল লিপিকার মাত্র। যাহার রাজসভা ভূতলে অতুলনীয়, যে দেশের রাজধানী সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণ-মণ্ডিত, 'বৈকুণ্ঠ-ধামের জ্যোৎস্না' স্বয়ং কমলাদেবী যে রাজ্যের পুরলক্ষ্মী, তাহার সৈন্যবাহিনী, তাহার সমরসজ্জা, তাহার সংগ্রামায়োজন কি সাধারণ হইতে পারে? সেই অসাধারণত্ব কেবল শব্দের ধ্বনিগুণেই নিপুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে
সাজিল কর্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্বার) বারণযূথ, মন্দুরা ত্যজিয়া

বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পুরিয়া পুরী, পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সা-আবৃত দেব, আইল কাতারে।

[প্রথম সর্গ, পংক্তি ৪১৮-৪৩০]

ইহার সহিত কবির শব্দসৃষ্টি করিবার দুর্লভ শক্তির কথাও মনে রাখিতে হইবে। নূতন শব্দ-উদ্ভাবন-ক্ষমতা ক্লাসিকাল কবির অপরিহার্য স্বভাব, সে স্বভাব মধুসূদনের পূর্ণ মাত্রায় ছিল, যেমন ছিল শেক্‌স্পীয়ার বা স্পেন্সারের মধ্যে। মেঘনাদবধ কাব্যের যে কোনও পৃষ্ঠা খুলিলেই দেখা যাইবে কবি কী অপূর্ব কৌশলে নূতন শব্দ নির্মাণ করিয়াছেন। তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল বাক্যালংকার সৃষ্টি করাই নহে—গভীরতর এক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। শব্দ-ব্যবহারে মধুসূদন কতখানি সূক্ষ্ম চেতনা সম্পন্ন ছিলেন, তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম স্তবকে মধুসূদন তাঁহার কাব্যবিষয়টিকে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন—তাহা এই যে, বীর-চূড়ামণি বীরবাহুর মৃত্যুব পর রাবণ-কর্তৃক মেঘনাদ সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৌশলপূর্বক লক্ষ্মণ মেঘনাদকে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই নিধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সমশক্তি-সম্পন্ন বীরের মধ্যে সংগ্রাম নহে—ইহা অন্যায় যুদ্ধ, তাই লক্ষ্মণ সম্পর্কে কবি 'কৌশল' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। তদপেক্ষা বড় কথা, মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের বিশেষণ-প্রয়োগ। কবি তাঁহার কাব্যনায়কের ক্ষেত্রে 'রাক্ষসভরসা' এবং তাঁহার নিধনকারীকে 'ঊর্মিল-বিলাসী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—অর্থাৎ কাব্যসূচনাতেই বলিয়া দেওয়া হইল, একজন বীরযোদ্ধা আর একজন প্রেমিক মাত্র ; একজন সমগ্র সমগ্র জাতির আশ্রয়স্থল, আর একজন একটি মাত্র ব্যক্তির, একটি নারীর সম্পদ। একজন সমষ্টির প্রতিনিধি আর একজন একক। কিন্তু তথাপি সেই বীরের, সেই সমষ্টির প্রতিনিধি, সেই রাক্ষসভরসার (তুলনীয় হোমার-ব্যবহৃত Hope of Troy বিশেষণ) নিধন ঘটিয়াছে একজন নিঃসঙ্গ একক নারীর প্রেমিকের হাতে। ইহা নিয়তি

ব্যতীত আর কী হইতে পারে। সেই করুণ নিষ্ঠুর নিয়তির কাব্য রচনার এইরূপ সূচনা কেবল দুইটি শব্দের দ্বারাই সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

শব্দের এইরূপ অব্যর্থ প্রয়োগ-শক্তির সহিত এই কাব্যে আর একজাতীয় বিশেষণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, যাহা প্রত্যক্ষত ইংরাজি এবং গ্রীক-মহাকাব্যের প্রয়োগরীতির সহিত কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইতে উদ্ভূত। পাত্রপাত্রীর নামের সহিত কবি বারবার তাঁহাদের পিতৃপরিচয় অথবা পারিবারিক সম্বন্ধের সূত্র টানিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী তাই বারবার কেশব-বাসনা, শৈলেশসুতা, বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না, পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসী পদ্মাক্ষী বলিয়া উল্লিখিত। রাবণ পুনঃপুনঃ রক্ষঃকুলনিধি, রক্ষোরাজ, নৈকষেয় হইয়াছেন। মেঘনাদ দশাননাত্মজ, বাসবত্রাস, ইন্দ্রজিৎ, রাক্ষস-কুলশেখর, রাক্ষসকুল-ভরসারূপে ব্যবহৃত। একই বাক্য একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়া একটি চরিত্রের বীরধর্মকে অনিবার্যভাবে পাঠকের চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—

> সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর-চূড়ামণি
> বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে— [প্রথম সর্গ, পংক্তি ১-৩]
> পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
> চাপি রিপুচয় বলী— [ঐ, পংক্তি ২৬৪-২৬৫]
> মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি। [ঐ, পংক্তি ৫৩৮]

রতন-সম্ভবা বিভা, কাব্যরত্নাকর কবি, মধুকরী কল্পনা, চিত্ত-ফুলবন-মধু, রাক্ষস-কুল-রক্ষণ, পাবক-শিখা-রূপিণী জানকী, কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী-তেজে উজ্জলিত নাট্যশালাসম সুন্দরী পুরী, বিদ্যুৎঝলা সম, মুক্তাময়ী গৃহচূড়া, বারি-সংঘটিত ঘট, দ্বিরদগামিনী, দ্বিরদ-রদ-নির্মিত গৃহদ্বার, কেশরি-কিশোর, সৌর-খরতর-জাল-সংকলিত আভাময় স্বর্ণাসন, লঙ্কার পঙ্কজ-রবি, শীর্ষক-চূড়া, রত্ন-সংকলিত-আভা পতাকা, নিস্তারিণী-মনোহর নীলকণ্ঠ, নৃমুণ্ডমালিনী রণপ্রিয়া প্রমীলা, সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারে এই কাব্যে যে অভিনব বাক্‌সৌন্দর্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আজও যে কোনও পাঠককে বিস্মিত করিবে। সত্য বটে, কবি দুরূহ দুর্গম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই শব্দ সম্পর্কে শেষ কথা নহে, সমগ্র জাতির বাগ্‌ধারার উপর অধিকার স্থাপন না করিলে মহাকবি হওয়া যায়

না, ইহা কবি নিশ্চয় জানিতেন। যাবনী-মিশাল ভাষা ব্যবহারে ভারতচন্দ্র যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, মধুসূদন তদপেক্ষা দুঃসাহস দেখাইলেন। দুঃশ্রাব্য তৎসম শব্দের সহিত গ্রাম্যশব্দও কবি অকাতরে ব্যবহার করিয়াছেন। মজাইছে লঙ্কা মোর, কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি, বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি, মড়মড়ে, বরজ, বারুই, খড়ি পাতি, মোর কিরে প্রাণেশ্বর, টানিল হুড়ুকা ধরি হড়হড় হড়ে, আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে, খেদাইয়া মৃগযূথে, পাখশাট মারি প্রভৃতি লোকায়ত শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গি অতি অনায়াসে গুরুগম্ভীর তৎসম-শব্দের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এই প্রকার উভয় জাতীয় মিশ্রণ সংলাপেও দ্রষ্টব্য। সামান্য যুদ্ধ-প্রত্যাগত ভগ্নদূতের মুখে দুরুচ্চার্য শব্দ শোভন নহে, কিন্তু তাহার আলোচ্য বিষয় যখন সংগ্রামে বীরবাহুর অতুলনীয় বীরত্ব, তখন সেই অমানব-সামান্য মহাসংগ্রামের প্রকাশ প্রত্যক্ষদর্শীর রোমাঞ্চিত অভিজ্ঞতায় আপনি শব্দ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে—

শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টংকারে ! [প্রথম সর্গ, পংক্তি ১৫০-১৫৪]

অথচ নারীর মুখে সংলাপ কত সহজ প্রচলিত শব্দে সার্থক হইয়াছে—

তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশাকালে,
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে ! [তৃতীয় সর্গ, পংক্তি ৫৩-৫৬]

মধুসূদনের নামধাতু প্রয়োগ লইয়াও একদা সমালোচনা হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন, "গম্ভীর বিষয় বর্ণনাকালে মাইকেল মধুসূদন 'খেদাইনু' 'নাদিলা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়।" স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলে, "Then again grammar might have been respected ; and we must strongly protest against the constant introduction in imitation of the English idiom of such verbs as স্তুতিলা স্বনিলা, নির্ঘোষিল।" একালে

মোহিতলাল পর্যন্ত ক্রিয়াপদের এইরূপ প্রয়োগকে হঠকারিতা বলিয়াছেন। মধুসূদনের ব্যাকরণজ্ঞানের অভাব ছিল না, কিন্তু অনভ্যস্ত অপটু একটি ভাষাকে মহাকাব্যের উপযোগী করিবার দুঃসাহসে ভাষার উপর তিনি বিচিত্র পরীক্ষা সাধিত করিয়াছিলেন। নামধাতুর ব্যবহার তাহারই অন্যতম। কয়েকটি ক্ষেত্রে হয়ত ইহা আধুনিক কর্ণেও অনভ্যস্ত লাগে (যেমন বৃষ্টিল, মুক্তিল) কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কালের পরীক্ষায় ইহারা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নামধাতুর ব্যবহার পুরাতন সাহিত্যে অগণ্য—মধুসূদন তাহারই সূত্র ধরিয়া ইংরাজি কাব্যের রীতিকে আরও একটি বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র। প্রহারয়ে, সাবাসি, বাহিরিল, প্রভাতয়ে, বিমুখয়ে, কূজনি, নিস্তেজ, সম্ভবে, আশীষি, আদেশিব, চিকণিয়া মর্মরিছে প্রভৃতি ধাতু প্রয়োগ একালের পাঠকের কাছে মাতৃভাষার স্বাভাবিক প্রাণশক্তির মত মনে হয়। ধাতুর মধ্যে এই সম্ভাবনা-সৃষ্টির আদি কৃতিত্ব মধুসূদনেরই।

শব্দ ও ভাষার ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ অপরিহার্য। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার করিয়া অর্থাৎ মিত্রাক্ষর-যোজনার রীতি অস্বীকার করিয়া পংক্তিগুলিকে মৌখিক রীতি বা শিষ্ট গদ্যরীতির মত অসীম সম্ভাবনা দান করিয়াছিলেন[১] এবং সংস্কৃত ছন্দের মিত্রাক্ষরহীনতার মত ভাষাতে লঘুগুরু মাত্রার স্বর-যোজনার দ্বারা ছন্দে আভ্যন্তর-সৌন্দর্য সঞ্চার করিয়া ছিলেন। অবশ্য শব্দের লঘুগুরু মাত্রা এখানে সংস্কৃত মাত্রাপদ্ধতির ন্যায় নহে, ইহা উচ্চারণের উচ্চাবচতাই বুঝাইতেছে। ধ্বনিত শব্দতরঙ্গের দ্বারা কবি চরণে চরণে যে এক প্রকার অন্তঃসাম্য ও আভ্যন্তর-গাম্ভীর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাহিরের মিত্রাক্ষরহীনতার ত্রুটি

১ এই গদ্যধর্মিতার দৃষ্টান্ত যে কোনও একাধিক পংক্তি গদ্যের মত সাজাইলেই বুঝা যাইবে। যথা, মুকুন্দরামের—বৈশাখ হৈল বিষ গো বৈশাখ হৈল বিষ।

মাংস নাহি খায় সর্বলোক নিরামিষ।

ইহা পদ্যেরই চরণ, গদ্যের নহে। কিন্তু মধুসূদন যখন লেখেন—

নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়—

তখন ইহাকে একান্তভাবে পদ্যাবিষ্ট চরণ বলা যায় না, ইহা স্বাভাবিক বাকভঙ্গি-আশ্রয়ী মাত্র।

ঘুচাইয়া দিয়াছে। মধুসূদনের কাব্যপংক্তিগুলির একটি অনিবার্য স্বভাব এক প্রকার মুহুর্মুহু যমক ও অনুপ্রাসের দোলন জাগানো। এলোমেলো যে-কোনও পংক্তি উদ্ধার করিলেই ইহা লক্ষ্য করা যাইবে। এইরূপ কয়েকটি পংক্তিগত ধ্বনি-সৌন্দর্যের নির্বাচিত উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথম সর্গ হইতে—

'বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি'
'যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা'
'উড়য়ে ধনী মঞ্জু-কুঞ্জ বনে'
'পদ্মাক্ষী চলিলা বক্ষঃ-কুললক্ষ্মী দূরে'

দ্বিতীয় সর্গ হইতে—'বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে'
'কে দণ্ডিবে, দেবি, এ পাষণ্ড রক্ষোরাজে'
'তোমা বিনা কার শক্তি হে মুক্তিদায়িনি'

তৃতীয় সর্গ হইতে— 'গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী'
'প্রচণ্ডা খর্পরখণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী'
'সঙ্গিনীদল সঙ্গে বরাঙ্গনা' ইত্যাদি।

অলংকার প্রয়োগ

অলংকার কাব্যের উপর আরোপিত প্রসাধন মাত্র নহে, ইহা কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ। সাদৃশ্যবোধের অনুপ্রেরণা মানব মনের একটি আদিম বৈশিষ্ট্য, সভ্যতার একটি প্রাচীন লক্ষণ। এইজন্যই সভ্যতার আদিতম প্রতিনিধি স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যে উপমার বহুলতা দৃষ্টি গোচর হয়। রসাবিষ্ট কবির নিকট বর্ণনীয় দৃশ্য বা ভাব এই বিশ্ব-নিসর্গের মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে কতি প্রতিরূপ রচনা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই চরণে চরণে অলংকার লতাইয়া উঠে, একটি চিত্র আর একটি চিত্রকে সঙ্গিনী করিতে আহ্বান জানায়। মধুসূদন ছিলেন সৌন্দর্যমুগ্ধ, স্বাভাবিক কবিপ্রতিভার অধিকারী। ইহার সহিত মহাকাব্য-রচনার নৈষ্ঠিক দায়িত্ব যুক্ত হইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে আলংকারিক করিয়া তুলিয়াছিল। আদিম মহাকাব্যের উপমার রিক্থ মধুসূদন অকৃপণভাবেই আহরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে আরও রমণীয় করিয়া আধুনিক রোমান্টিক ব্যক্তিগ্রাহী কবিমনের স্পর্শে অভিরাম করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুত, যেমন ভাষা ছন্দ রস-প্রকরণ চরিত্র রচনা—কোনোদিক দিয়াই মধুসূদন সাহিত্যিক মহাকাব্যের রীতি ও আদর্শ

লঙ্ঘন করেন নাই, তেমনি ইহার অলংকরণ-কলাতেও তিনি মহাকাব্যিক সৌন্দর্য যথাযথ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় অলংকার-শাস্ত্র এক বিপুল ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্যে অলংকার-বিশ্লেষণ করিয়া তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করা হইয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যে প্রযুক্ত অলংকারগুলি সম্পর্কে সংস্কৃত অলংকারের এই বিশ্লেষণ-রীতি প্রয়োগ করিয়া দীননাথ সান্যাল তাহাদের যথাযথ শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু অলংকারের প্রকৃতি অনুযায়ী মধুকবির কাব্যে ব্যবহৃত অলংকারের সংস্কৃত নাম-নির্দেশই তাঁহার কবি প্রতিভার স্বরূপ-নির্ণয়ে চূড়ান্ত পন্থা হইতে পারে না। মধুসূদনের অলংকার তদপেক্ষা গভীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্যের ক্ষেত্রে যাহাকে epic simile বলে, মধুসূদনের মহাকাব্যে সেই জাতীয় অলংকারই ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার অলংকার প্রায়শঃ সংক্ষিপ্ত—উপমেয়ের সাদৃশ্যবাচক উপমান-প্রয়োগেই তাহার সার্থকতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণ হইতে কয়েকটি উপমা—

রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা (বালকাণ্ড)

—এই [তমসা] নদীর রমণীয় জল সচ্চরিত্র মনুষ্যের মত স্বচ্ছ।

লতামিব বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব (অযোধ্যাকাণ্ড)

—[ভূমিশয্যায় শায়িতা কৈকেয়ী বিচ্ছিন্ন লতা বা ভূপাতিতা দেবাঙ্গনার মত।

কিংবা মহাভারত হইতে—

সংপ্রয়োজ্য বিয়োজ্যায়ং কামকারকরঃ প্রভুঃ
ক্রীড়তে ভগবান্ ভূতৈর্বালঃ ক্রীড়নকৈরিব। (বনপর্ব)

—শিশু যেমন ক্রীড়নকের দ্বারা ক্রীড়া করে সেইরূপ প্রভু ভগবানও ইচ্ছানু-সারে কখনও সংযুক্ত কখনও বিযুক্ত করিয়া প্রাণীদের লইয়া ক্রীড়া করেন।

ব্যাধিভিঃ পরিক্লিশ্যন্তে মৃগো ব্যাধৈরিবার্দিতাঃ। (শান্তিপর্ব)

মৃগ যেরূপ ব্যাধকর্তৃক নিপীড়িত হয় [অভিজ্ঞ বৈদ্যও সেইরূপ] ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হন।

কালিদাসের রচনা হইতে উদাহরণ—

স্থিতঃ সর্বোন্নতেনোর্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনা (রঘুবংশম্)

—[রাজা দিলীপ] আপনার সর্বোন্নত শরীরের দ্বারা মেরুপর্বতের মত যেন বিশাল পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া অর্থাৎ চাপিয়া বিদ্যমান আছেন।

পুত্রং তমোপং লেভে নক্তং জ্যোতিরিবৌষধিঃ (রঘুবংশম্)
—রাত্রিকালে জ্যোতির্ময়ী লতিকা যেরূপ জ্যোতিঃ প্রসব করে সেইরূপ [কৌশল্যাও] সর্বদুঃখহারী পুত্র প্রসব করিলেন।

জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ (মেঘদূত)
—[দীর্ঘদিবস যাপনে উৎকণ্ঠিতা সেই বালা] শিশিরমথিতা পদ্মিনীর ন্যায় অন্যরূপ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

এইরূপ নিদর্শন শতশত দেওয়া যায় এবং ইহার ব্যতিক্রম নাই, তাহাও নহে। কিন্তু ইহা সত্য যে ক্লাসিকাল সংস্কৃত কবিদের দৃষ্টি আয়ত ছিল না। তাঁহারা প্রত্যঙ্গের উপর ছোট ছোট ঔপম্যের আলোক ফেলিয়াছিলেন, সামগ্রিকতার উদ্‌ভাসন তাঁহাদের রচনায় নাই। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে অলংকার তাই প্রথাগত উপমানের কতকগুলি অভ্যস্ত ব্যবহারে পুনরাবৃত্ত। কিন্তু মধুসূদনের অলংকার পুঁথি হইতে গৃহীত হইয়াছে কম, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন হইতে, অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ। তাই সেগুলি আকস্মিক অথচ অপ্রত্যাশিত নহে। রামচন্দ্রের হীন বানর-সৈন্যের আক্রমণে 'দেবেন্দ্রলাঞ্ছিত' স্বর্ণলঙ্কার দুরবস্থা, 'অমরত্রাস' বীরবৃন্দের অভাবনীয় মৃত্যু রাবণকে স্তম্ভিত করিয়াছে। সেই শোকাবহ দুর্ভাগ্যের উপমা দিতে গিয়া রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে বলিতেছেন—

বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর!

পণ্ডিত-সমালোচক রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন—"উপমাটি পাইলে হোমারও সৌভাগ্যজ্ঞান করিতেন।"

মহাকাব্যিক উপমা[১] সুদীর্ঘ হইয়া থাকে, ইহা কেবল একটি উপমেয়ের একটি উপমান নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহা একটি বিষয়কে সাদৃশ্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি দেয়, সামগ্রিক একটি রূপকল্পে একটি বিপুলত্বের ধারণা জন্মাইয়া তোলে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বহু-পরিচিত বহু-উদ্ধৃত শোকদৃশ্যটির আলংকারিক চিত্রটি সর্বপ্রথম দ্রষ্টব্য—

১ simile অর্থে উপমা, কিন্তু পাশ্চাত্য মতে যাহা তুলনীয় সৌন্দর্য তাহাই simile, আমাদের অলংকার-শাস্ত্রে উহা উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত। এখানে উপমা বলিতে আমরা প্রতীচ্য কাব্যের অর্থই গ্রহণ করিতেছি, ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের উপমা সর্বদা অভিপ্রেত নহে।

শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
স্বরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব ! [পংক্তি ৩৩৪-৩৩৮]

শোকের সহিত ঝড়ের অভিন্নত্বের দ্বারা এখানে ভারতীয় মতে রূপক অলংকার হইয়াছে এবং শোকের আনুষঙ্গিক প্রকাশ ও আশ্রয়ের বর্ণনার দ্বারা ঝড়ের সাঙ্গরূপক হইয়াছে। কিন্তু সব মিলিয়া যে মহাবেদনার বিপর্যস্ত মূর্তিটি ফুটিয়াছে, প্রাচীন কোনো ভারতীয় আলংকারিক কবি কি তাহা কল্পনা করিতে পারিতেন ? ঠিক একই ভঙ্গিতে রাবণ তাঁহার ভাগ্যাহত বিষাদের শোকমূর্তিটি রচনা করিয়াছেন—

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষ, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর ! [প্রথম সর্গ, পংক্তি ৯১-৯৫]

এ উপমা অলংকার-শাস্ত্রানুযায়ী হয় নাই, যদিও ইহার উৎস মহাভারতের অন্তর্গত ধৃতরাষ্ট্রের একটি বিলাপোক্তি—'হতে পুত্রশতে দীনং ছিন্নশাখমিবদ্রুমম্'। মধুসূদন যেভাবে ইহা বিস্তারিত করিয়া ও রাবণের মুখে পরিবেশসংগত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্বাভাবিক উক্তির অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আর একটি সাদৃশ্য—

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ? [১ম সর্গ, পংক্তি ১০৭-১১৩]

অলংকারের নাম-সংকলন যেন এখানে অর্থহীন মনে হয়, উপমার নৈপুণ্যই আমাদের মুগ্ধ করে।

হোমারের কাব্যে বীর্যশালিতা, শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ ইত্যাদি প্রকাশ করিবার কতকগুলি প্রিয় উপমান ছিল, যথা পর্বতাগ্নি, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ, সূর্য, অগ্নি, তেজ, প্রলয়ঝঞ্ঝা ইত্যাদি। আদিম প্রকৃতির এই মহদ্‌-ভয়ংকর রূপগুলিই আদিম মহাকবির কল্পনাকে উদ্‌বেজিত করিয়াছিল। প্রাণীজগতের মধ্যে পশুরাজ সিংহ তাঁহার কাব্যে বারবার শক্তিমত্তা ও দ্রুতগামিতার প্রতীকরূপে দেখা দিয়াছে। এই ধরণের আদিম প্রাকৃত উপমান মধুসূদনও বারবার গ্রহণ করিয়াছেন।[১] যথা প্রথম সর্গে—

মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্ধর— [পংক্তি ১৪৬-১৪৮]
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! [পংক্তি ১৭৯—১৮২]
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। [পংক্তি ২২০-২২১]
শত প্রসারণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী— [পংক্তি ২৪০-২৪১]
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টংকারিল ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘমাঝে
ভৈরবে। [পংক্তি ৭১৭-৭১৯]

দ্বিতীয় সর্গে—

যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু। [পংক্তি ৩২০-৩২২]

১ দ্রষ্টব্য উপমা মধুসূদনস্ত—ভবতোষ দত্ত ; ধ্রুপদী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৭ এবং মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যালংকার—ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

নড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
ঘোর মড়মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে। [পংক্তি ৩৮৮-৩৯০]

তৃতীয় সর্গে—

পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? [পংক্তি ৭৫-৭৭]
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নিশিখা? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-দল-বলে। [পংক্তি ১৬৪-১৬৬]
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! [পংক্তি ৩৬৩-৩৬৬]

এ কাব্যের নায়ক ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ কবি-কল্পনায় বারবার তাই লঙ্কার পঙ্কজ-রবি হইয়া দেখা দিয়াছেন আর কবি বহুযত্নে বহু অশ্রুজল ফেলিয়া সেই পঙ্কজ-রবির করুণ অকাল-অস্তগমনের আয়োজন করিয়াছেন।

অনুপ্রাস যমক শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালংকারের কথা বাদ দিলে ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রিক অলংকারও মধুসূদন কম্ ব্যবহার করেন নাই। সবগুলি হয়ত সচেতনভাবে নহে—অনেকগুলিই কাব্যকলার স্বাভাবিক বিকাশসূত্রেই প্রযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কিছু অলংকার ক্লিষ্ট, কয়েকটিতে সৌন্দর্যের স্বভাব-ঝংকার আছে। কয়েকটি সাধারণ অলংকার প্রথম সর্গ হইতে—

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ ; (ক্লিষ্ট উপমা)
শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চে স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুতফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ মরকত হীরা ; যথা ঝোলে

(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। (ক্লিষ্ট উপমা)

রক্ষঃকুলপতি
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝরঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে।
যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে। (কাব্যিক উপমা)

যে রমণী পতিপরায়ণা
সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে ?
একাকী প্রত্যুষে প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার। (ক্লিষ্ট প্রতিবস্তূপমা)

তব হৈমসিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? (কাব্যিক প্রতিবস্তূপমা)

হায় শূর্পণখা
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী
কাল-পঞ্চবটী-বনে কালকুটে ভরা
এ ভুজগে ? (কাব্যগর্ভ অতিশয়োক্তি)

হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে। মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি। (প্রথাগত দৃষ্টান্ত ও উপমা)

দ্বিতীয় সর্গ হইতে—

মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী। (ক্লিষ্ট সমাসোক্তি)

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ধন চুম্বি কি ধন পাইলা। (কাব্যিক সমাসোক্তি)

চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি ;
পরিমলসুধাসহ পবন বহিলে,

দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমলগুণে, (কাব্যিক দৃষ্টান্ত)
শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখি যত;
পুরিল নিকুঞ্জপুঞ্জ প্রভাতীসংগীতে!
বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে! (কাব্যরসপ্রধান ভ্রান্তিমান)
মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ, বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর! (কাব্যিক অপ্রস্তুতপ্রশংসা)
চারিদিকে সখীদল যত
বিরসবদনা, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কেনা জানে ফুলকুল বিরসবদনা
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী? (প্রথাগত প্রতিবস্তূপমা)
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি! (ক্লিষ্ট অতিশয়োক্তি)
পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?...
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে;
দেখিব কেমন মোরে নিবারে নৃমণি? (কাব্যিক দৃষ্টান্ত)
দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে...
জগতের রক্ষাহেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী (সাধারণ অতিশয়োক্তি)

অসংখ্য উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের মধ্য হইতে এই কয়েকটি উদাহরণ মধুসূদনের প্রতিভার সামান্য দিকই উদ্ঘাটিত করিবে, কেবল কর্তব্যের খাতিরে এইগুলি উদ্ধৃত হইল মাত্র। তাঁহার অলংকারের ত্রুটি নির্দেশ করা হয়ত কঠিন নহে, কিন্তু যে অবিশ্রান্ত সৌন্দর্য-শক্তি তাঁহার দীর্ঘ মহাকাব্যের চরণে চরণে অলংকারের শিঞ্জিনী-ধ্বনি তুলিয়াছে সে শক্তির পরিমাপ কে করিবে?